উৎসাহ
২য় বর্ষ
১৩৩৫
ব. সা. প. গ্র.

উৎসাহ

দ্বিতীয় বর্ষ, বৈশাখ

নব বর্ষ।

—oo—

আজি শুভ নব বর্ষ—হর্ষ চরাচরে !
আনন্দে আদরে নরে প্রফুল্ল অন্তরে,
মধুর মঙ্গলমন্ত্রে ধীরোদাত্ত স্বরে,
গাহিছে মঙ্গল গীতি প্রাসাদে কুটীরে !
শোকার্ত্তের অশ্রুধারা ঝ'রে ঝ'রে ঝ'রে
থামিয়াছে অর্দ্ধপথে গতি রোধ ক'রে !
ক্ষুধার্ত্তের হাহাকার দয়ার্দ্রের বরে
থামিয়াছে,—অন্ন জল লভি ঘরে ঘরে !
পুণ্যতিথি বৈশাখের প্রথম বাসরে,
প্রভাতশিশিরসিক্ত পাদ্য অর্ঘ করে,
এসেছি মা জন্মভূমি ! পূজিতে তোমারে,
"উৎসাহের" জন্মদিনে অবনতশিরে !

পুণ্যাহ।

পুণ্যাহের শব্দগত অর্থ—পুণ্যদিন। কিন্তু বিশেষ অর্থজ্ঞাপনের জন্য ব্যবহৃত হয় বলিয়া, বাঙ্গালীরা সচরাচর "শুভ পুণ্যাহ" বলিয়াই উল্লেখ করিয়া থাকেন। যে বিশেষ অর্থ জ্ঞাপনার্থ "শুভ পুণ্যাহের" সৃষ্টি, তাহার সহিত এ দেশের ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব।

"পুণ্যাহ" শব্দ সংস্কৃতমূলক। কেবল সংস্কৃতমূলক কেন,—আপাদমস্তক সংস্কৃতশব্দেই গঠিত। কিন্তু সংস্কৃতসাহিত্যে কোন বিশেষ অর্থে ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। শব্দটি সংস্কৃত, কিন্তু মুসলমান-শাসনসময়েই বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে!

বাণিজ্যব্যবসায়ে বর্ষারম্ভে "হাল খাতা" খুলিবার ব্যবস্থা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। বাণিজ্যের সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল না, কিন্তু রাজভাষার যাবনিক শব্দেই সেকালের ব্যবসায়িগণ বর্ষারম্ভ করিতেন। জমিদারেরাও এইরূপ "হাল খাতা" খুলিয়া বর্ষারম্ভ করেন; তাহার সহিত রাজার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকিলেও, কোন যাবনিক নাম না হইয়া, তাহার নাম হইয়াছে—"শুভ পুণ্যাহ।" ইহা কি ঐতিহাসিক বিস্ময়ের বিষয় নহে?

এই একটিমাত্র কথা ছাড়া জমিদারের সেরেস্তায় প্রায় সকল শব্দই যাবনিক। রাজকরের নাম খাজানা, নিষ্করের নাম লাখেরাজ, করসংগ্রাহকের নাম তহশীলদার, তদূর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নাম নায়েব, তদূর্দ্ধে দেওয়ানজীউ মহাশয় সেরেস্তাদার, মুন্সী, বক্সি, খাজাঞ্চি, সুমারনবিশ, জমাদার, পেয়াদাপরিবৃত হইয়া সেরেস্তা সিজিল করিয়া খান্দানের দস্তুর মোতাবেক নজর নেয়ামৎ বাহাল রাখিয়া সর্ব্বকার্য্য সরবরাহ করিয়া থাকেন!

আজকাল দুই চারি জন লোকে হ্যাট্ কোট্ ধরিয়াছেন; তাহাতে সুবিধা বা অসুবিধা কি,—তাঁহারাই বলিতে পারেন। আমরা দশজনে তদুপলক্ষে তাঁহাদের নিন্দাবাদের জন্য সাহিত্যভাণ্ডারের বাছা বাছা পাশুপতাস্ত্র প্রয়োগ করিতেছি; কখন কখন ভাবিতেছি,—বুঝি তাহাতেও যথেষ্ট হইল না! সে-

কালের তাঁহারা কল্‌কাদার নাগ্‌রা জুতা পরিয়া, চুড়ীদার পায়জামার উপর বুটাদার কাবা চাপকান আঁটিয়া, বাহারদার উষ্ণীষ বাঁধিয়া সুর্‌মারঞ্জিত নয়নকজ্জলে পার্শ্বচরগণকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া শিবিকারোহণে বাহির হইবার সময়ে, কোন রূপ অট্টহাস্য ধ্বনিত হইয়া উঠিত না। বরং লোকে এইরূপ যাবনিক বেশভূষা পরিধান করিবার অধিকার পাইলে কৃতার্থম্মন্য হইত। কোন কোন মুসলমান-নবাবের কঠোর শাসনে এই সকল সম্ভ্রমসূচক অধিকারের কিছুকিঞ্চিৎ সংকোচ ঘটিলে, কত লোকে হায়! হায়! করিত। মুসলমানশাসনে বাহ্যবেশে মুসলমান সাজিবার আগ্রহ কত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, শুভ পুণ্যাহ উপলক্ষে মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবারে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইত। আজ তাঁহাদের বংশধরগণ বা তৎপদাভিষিক্ত ধনকুবেরগণ হ্যাট্ কোট্ ধরিয়াছেন বলিয়া, তাহা এমন কি নিন্দার কথা?

আজকাল ইংরাজদিগের বড়দিনের আনন্দোৎসবের উন্মত্ত কোলাহল কলিকাতাস্থ স্বজাতিসমাজেই বিলীন হইতে পারে না! সাহেবদিগের সঙ্গে আমরাও নাচি, আমরাও ছুটি, আমরাও কলিকাতার স্থানে স্থানে যথেষ্ট অর্থ নষ্ট করিয়া সর্দ্দি কাশী বাতব্যাধি লইয়া পল্লীগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকি! কিন্তু আমরা এই মহোৎসবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নহি;—আমরা কেবল দূরে দাঁড়াইয়া দেখিবার, এবং দেখিতে গিয়া মদিরাসক্ত সার্জ্জন সাহেবের নিকট অর্দ্ধচন্দ্র লাভ করিবার লোভেই মরিয়া রহিয়াছি! গৃহে ফিরিয়া বৎসর ভরিয়া প্রাণ খুলিয়া গল্প করিয়াও সকল কথা ফুরাইয়া ফেলিতে পারি না!

সেকালের পুণ্যাহ উপলক্ষেও মুসলমানের রাজধানীতে এইরূপ আনন্দোৎসব হইত; সে উৎসবে রাজধানী সঙ্গীতমোহে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িত; ধনিসন্তানগণ "সহরের" দিকে উন্মত্তবৎ ছুটিয়া চলিত; উৎসবান্তে আপনাপন পল্লীনিকেতনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ক্ষীণ মাত্রায় তাহারই অনুকরণ করিয়া প্রজাবর্গের মনস্তুষ্টি করিত। আমরা সে উৎসবের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম বলিয়া, তাহা আমাদের পক্ষেও "বড়দিন" বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। তাহার সঙ্গে ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, সকলেরই কিছু না কিছু সংশ্রব থাকায় তাহার স্মৃতি অদ্যাপি বিলুপ্ত হইতে পারে নাই।

বাঙ্গলার পাঠান ভূপতিগণ সমগ্র বঙ্গভূমি করতলগত করিতে পারেন নাই।

মোগলাধিপতি আকবর শাহের শাসনসময়ে টোডরমল্ল ও মানসিংহের অধ্যবসায়ে বঙ্গদেশের অধিকাংশ ভূমি মোগলের পদানত হইয়াছিল। মহারাজ টোডরমল্ল তাহার যেরূপ করধার্য্য করিয়া দিয়াছিলেন, তদনুসারে সুবা বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার বাদশাহের প্রাপ্য রাজকর সুনির্ণীত হইয়া গিয়াছিল। এই রাজকর সকল সময়ে রীতিমত সংগৃহীত হইত না; কখন কখন সংগৃহীত হইলেও বাদশাহের রাজকোষে যথারীতি প্রেরিত হইত না।

আরঙ্গজীব বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজকর নিরুদ্বেগে প্রাপ্ত হইবার আশায় মুর্শিদ কুলি খাঁকে নায়েব-দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। কুলি খাঁ ব্রাহ্মণসন্তান। বাল্যে ক্রীতদাসরূপে মুসলমানের নিকট বিক্রীত হইয়া মুসলমান বালকরূপে পারস্যদেশে লালিত পালিত ও শিক্ষিত হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন। শিক্ষায় স্বাভাবিক প্রতিভা সমধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং কুলি খাঁ অল্প দিনের মধ্যেই সম্রাটের শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি কিছু দিন দাক্ষিণাত্যে বিবিধ রাজকার্য্যে আত্মশক্তির পরিচয় প্রদান করিবার পর আরঙ্গজীবের আদেশে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার নায়েব-দেওয়ান ও কালক্রমে সুবাদার হইয়া উঠিয়াছিলেন।

মুর্শিদ কুলি খাঁর আদেশে মুসলমানের বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার রাজধানী ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে উঠিয়া আসিয়াছিল, এবং বর্ষে বর্ষে বাদশাহের প্রাপ্যাংশ দিল্লীতে প্রেরিত হইবার সুব্যবস্থা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে মুর্শিদ কুলি খাঁর আদেশে "শুভ পুণ্যাহের" সূচনা হয়।

এই সময়ে এ দেশে যে সকল জমিদার বর্ত্তমান ছিলেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ মুসলমানের বঙ্গাগমনের পূর্ব্ব হইতেই বংশানুসারে রাজপদ সম্ভোগ করিতেন। ইঁহাদের সংখ্যা অধিক ছিল না। তদ্ভিন্ন অন্যান্য পরগণাগুলির কর সংগ্রহের ভার কতকগুলি নূতন জমিদারের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। নূতন জমিদারগণ তদুপলক্ষে আভ্যন্তরিক শাসনকার্য্যে অধিকার লাভ করিয়া প্রাচীন রাজন্যবর্গের ন্যায় পদগৌরবান্বিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে করসংগ্রাহক রাজকর্ম্মচারী বলিয়াই পরিচিত হইয়াছিলেন।

মুর্শিদ কুলি খাঁ বঙ্গদেশ একাদশ চাকলায় বিভাগ করিয়া, চাকলাগুলি বহুসংখ্যক পরগণায় বিভক্ত করতঃ জমিদারদিগের প্রতি কর সংগ্রহের ভারার্পণ

করায় বঙ্গদেশে নূতন ভাবে রাজস্বসংগ্রহের নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। তদনুসারে পরগণাগুলি "জায়গীর" ও "খালিশা" নামে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। জায়গীর-লব্ধ রাজকরে বঙ্গশাসনকার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহের ব্যবস্থা হইয়াছিল; খালিশা-লব্ধ রাজকর প্রতিবর্ষের বৈশাখ মাসে বাদশাহের দরবারে পাঠাইয়া দিবার নিয়ম হইয়াছিল।

যাহাতে বাদশাহের প্রাপ্য রাজকর বর্ষে বর্ষে যথারীতি প্রেরিত হইতে পারে তাহার সুব্যবস্থা করিবার জন্য কুলি খাঁ "শুভ পুণ্যাহের" সূচনা করেন। তদনুসারে জমিদারগণকে চৈত্র মাসের মধ্যে বৎসরের রাজকর পরিশোধ করিয়া দিয়া বৈশাখের শুভ পুণ্যাহ দিনে নববর্ষের রাজকরের কিয়দংশ প্রদান করতঃ জমিদারী সনন্দ বাহাল রাখিতে হইত। ইহাতে ত্রুটি ঘটিলে একের জমিদারী অন্যের হস্তে সমর্পিত হইত। এইরূপে নাটোর ও দিনাজপুর রাজবংশের আদিপুরুষগণ অনেক জমিদারীর শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই পুণ্যাহ উপলক্ষে মুর্শিদাবাদের মুসলমান রাজধানীতে নানারূপ আনন্দোৎসব হইত, এবং পাত্র, মিত্র ও জমিদারবর্গ নবাবসরকার হইতে মূল্যবান্ "খেলাত" প্রাপ্ত হইয়া নবাব বাহাদুরকে উপঢৌকন সরূপ "নজর" প্রদান করিতেন।

কালক্রমে দিল্লীর বাদশাহের প্রবল পরাক্রম ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় দিল্লীতে রাজকর প্রেরণ করিবার প্রথা উঠিয়া গিয়াছিল; কিন্তু পুণ্যাহের নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয় নাই। আলিবর্দ্দীর সময়ে বর্গীর হাঙ্গামায় এবং সিরাজদ্দৌলা, মীরজাফর ও মীরকাসিমের সময়ে রাষ্ট্রবিপ্লবেও এই প্রথা বর্ত্তমান থাকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বহু বৎসরের অভ্যাসবশতঃ পুণ্যাহের সময়ে সকলেই আমোদ আহ্লাদ ও ব্যয়বাহুল্য করিতেন।

বাদশাহ বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার রাজকর না পাইয়া বাহুবলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হন। কিন্তু তখন দিল্লীর নামসর্ব্বস্ব মোগল বাদশাহ একরূপ পথের ফকির! স্বকীয় বাহুবলে কিছুমাত্র ফললাভ করিবার আশা ছিল না; বাদশাহ সেই জন্য অযোধ্যার উজীরের কণ্ঠলগ্ন হইয়াছিলেন। বাদশাহ ও উজীর উভয়ে চেষ্টা করিয়াও বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় অধিকার বিস্তার করিতে পারিলেন না। অবশেষে বাদশাহ ইংরাজবণিক্‌সমিতির শরণাপন্ন হইলেন।

দেশ যেরূপ অরাজক হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে দেশের মুখের দিকে না চাহিয়া সকলেই আপন স্বার্থের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভারত-বাণিজ্যে অক্ষুণ্ণপ্রতাপে একাধিপত্য বিস্তার করাই ইংরাজবণিক্‌সমিতির স্বার্থ,—তাঁহারা তজ্জন্য রাষ্ট্রবিপ্লবে যোগদান করিয়া বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় শক্তি-শালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা ভিন্ন আর কেহ যে সহজে বঙ্গ, বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী পদের গৌরবরক্ষা করিতে পারিবেন না তাহা বুঝিতে পারিয়া বাদশাহ ইংরাজবণিক্‌সমিতিকেই দেওয়ানী সনন্দ প্রদান করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করেন।

ইংরাজ বণিক্। রাজকার্য্যে লিপ্ত হইলে বাণিজ্যের ক্ষতি। কিছু দিন এই কথাই তাঁহাদের মূলমন্ত্র হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং বাদশাহ স্বয়ং স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া ইংরাজবণিক্‌সমিতিকে দেওয়ানী সনন্দ প্রদান করিতে চাহিলেও ইংরাজেরা তাহাতে সম্মত হইলেন না। এই সময়ে লর্ড ক্লাইব বিলাতে; তাঁহার পদে যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহাদের সাহসে কুলাইল না!

ক্লাইবের অসমসাহসের কথা চিরবিখ্যাত। তিনি অগ্রপশ্চাৎ বিচার না করিয়া অসমসাহসে অগ্রসর না হইলে বৃটিশ রাজশক্তি প্রতিষ্ঠালাভ করিত কিনা তাহাতে সমূহ সন্দেহ। তিনি যখন পুনরায় এ দেশে আসিয়া শুনিলেন যে, বাদশাহ দেওয়ানী সনন্দ প্রদান করিতে সমুৎসুক, কেবল ইংরাজেরাই হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া ফেলিতেছেন, তখন তিনি কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া বৎসরে ২৬ লক্ষ টাকা রাজকর দিবার অঙ্গীকারে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখে বাদশাহ শাহ আলমের নিকট হইতে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ গ্রহণ করিলেন।

এই উপলক্ষে বাঙ্গালীর সহিত ইংরাজের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিল। নবাব নাজিম নামমাত্র দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা বলিয়া পরিচিত ছিলেন, আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্যে জমিদারেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং নবাব নাজিমের সঙ্গে তাঁহাদের তেমন ঘনিষ্ঠ সংশ্রব ছিল না। কিন্তু নবাব-দেওয়ানের সঙ্গে জমিদারদলের বড়ই ঘনিষ্ঠ সংশ্রব সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই উভয় পদে একজন মাত্র নবাব প্রতিষ্ঠিত থাকায় জমিদারগণকে মুসলমান নবাব-দরবারের কণ্ঠলগ্ন হইয়া থাকিতে হইত। ইংরাজেরা নবাব দেওয়ান হইলে,

মুসলমান নবাব নাজিমের সহিত বাঙ্গালীর সংশ্রব দূরবর্ত্তী হইয়া ইংরাজ নবাব দেওয়ানীর সহিত সম্বন্ধ নিকটবর্ত্তী হইল। মুসলমান নেপথ্যে সরিয়া পড়িলেন, ইংরাজ রঙ্গমঞ্চে আরোহণ করিলেন।

আরব্ধ কোন কার্য্যই অসম্পন্ন রাখা ক্লাইবের অভ্যাস ছিল না। তিনি বাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গালীর মত বেমালুম মিশিয়া পড়িতে পারিতেন, এবং স্বকার্য্য সাধনের জন্য নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে জানিতেন। গণ্যমান্য বাঙ্গালিগণকে নানারূপে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহাতে ক্লাইবের নামের মোহিনী শক্তি সর্ব্বত্রই খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। তিনি দেওয়ানী সনন্দ গ্রহণ করিয়া সহসা ইউরোপীয় শাসনপ্রণালী প্রচলিত না করিয়া মুসলমানের রাজ্যে মুসলমান নবাব দেওয়ানের ন্যায় শুভ পুণ্যাহের অনুষ্ঠান করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। লোকে দলে দলে মুর্শিদাবাদাভিমুখে ছুটিয়া চলিল।

ইহাই মুর্শিদাবাদের শেষ পুণ্যাহ। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মুর্শিদাবাদের মতিঝিলের নবাবী প্রাসাদে এই পুণ্যাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্লাইব কোম্পানী বাহাদুরের প্রতিনিধি সাজিয়া নবাব দেওয়ানের আসনে সগৌরবে উপবেশন করিয়া মুসলমানী প্রথায় দরবার করিয়া পুণ্যাহ করতঃ যথাযোগ্য নজর গ্রহণ ও খেলাত বিতরণ করিতেও ত্রুটি করেন নাই। ইহাতে সকলেই সাহ্লাদে ইংরাজ দেওয়ানকে কর প্রদান করিয়া কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী পদ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। পর বৎসর হইতে ডিরেক্টারগণের আদেশে এই মুসলমানী প্রথা চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইয়া গেল!

ক্লাইব কি উদ্দেশ্যে এরূপ প্রাচ্যরীতিনীতির সমাদর রক্ষা করিতেন, তাহা সমসাময়িক লোকেও ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ অলীক কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ক্লাইবের একখানি পত্রে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে তিনি শনৈঃ শনৈঃ ইংরাজরাজত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া লোকের অজ্ঞাতসারে পুরাতন প্রথা তিরোহিত করিবেন বলিয়াই প্রথম প্রথম পুরাতন পদ্ধতিকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহাতে লোকে রাষ্ট্রবিপ্লব অনুভব করিতে না পারিয়া অভ্যাসবশতঃ পূর্ব্ববৎ রাজকর প্রদান করিয়া ইংরাজ দেওয়ানের ক্ষমতাবিস্তারের সহায়তা করিয়াছিল।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

সন্ন্যাসী।

সে অনেক দিনের কথা। আমি এলাহাবাদ হইতে গাজিয়াবাদ যাইতে ছিলাম। গাজিয়াবাদ ষ্টেসনে North Western রেলওয়ে ধরিয়া আমি সাহারণপুর যাইব। আমি Mixed গাড়ীর আরোহী; বেলা তখন ১২টা কি ১টা সেই সময়ে ঐ গাড়ী এলাহাবাদ ষ্টেসন ছাড়ে। আমার একখানি মধ্যশ্রেণীর রিটার্ণ টিকিট ছিল; এলাহাবাদে আর আমাকে টিকিট কিনিতে হয় নাই। সঙ্গে কিছু বোঝা ছিল; বোঝা আমার নহে। আমার নিকট আমি নিজেই এক প্রকাণ্ড লগেজ; দেশে বিদেশে এই ভূতের বোঝা বহিয়া বহিয়াই আমি একেবারে হয়রাণ হইয়া গেলাম; বোঝা কিছুতেই হাল্‌কা হইতে চায় না; দিনের পর দিন যাইতেছে আর নানা প্রকার খুটিনাটি, ঊনকোটি চৌষট্টি আসিয়া আমার বোঝা ভারী করিতেছে। নিজের প্রকাণ্ড বোঝার উপর অন্য লগেজ লইবার আমার যো ছিল না, আমি সে সময়ে বড়ই বিব্রত; কিন্তু কি করি। স্নেহের অনুরোধ উপেক্ষা করিবার শক্তি নাই। এলাহাবাদে যাঁর গৃহে আমি দুই দিন অতিথি হইয়া ষোড়শোপচারে পূজিত হইয়াছি, যাঁর গৃহে দুই দিন বাস করিয়া আমি মায়ের স্নেহ, ভগিনীর আদর, ভ্রাতার ভালবাসা, পুত্র কন্যার স্নেহের আবদারে প্রাণ শীতল করিয়াছি, যাঁর সেই ক্ষুদ্র প্রবাস 'বাঙ্গালা' খানিতে আমি জীবনের দু'দশ দিন বেশ সুখে সচ্ছন্দে কাটাইতে পারিতাম, যাঁদের স্নেহের ছায়ায় বসিয়া আমি দু'দিন অন্ততঃ হাঁফ ছাড়িতে পারিতাম; তাঁদের স্নেহের অনুরোধে সঙ্গে কিঞ্চিৎ লগেজ লইতে হইয়াছিল। বন্ধুর একজন আত্মীয় সাহারণপুর চাকুরী করেন; তাঁহার জন্য এক বস্তায় বোধহয় গুটি পনের নারিকেল, এবং এক কলসী খেজুরে গুড় আমার সঙ্গে দেওয়া হইয়া ছিল। পশ্চিম প্রদেশে এ দুইটি জিনিষ বড়ই মহার্ঘ। আমার মনে পড়ে একবার মিরাটে আমার একটি বাঙ্গালী বন্ধুর শ্বশুরালয়ে হঠাৎ অতিথি হইয়া ছিলাম; বলা বাহুল্য গৃহস্বামীর জামাতা মহাশয়ও আমার সঙ্গে ছিলেন। আমাদিগকে দেখিয়া গৃহস্বামীর আনন্দের আর সীমা নাই; বাড়ীতে জামাতার

পদার্পণই এ আনন্দের কারণ নহে; তিনি সে দিন আমাদিগকে এমন সুন্দর এক জিনিষ খাওয়াইতে পারিবেন, তাহাই বলিয়া তাঁহার মনে অধিক আনন্দ হইয়াছিল। তাঁহার এত হর্ষ দেখিয়া খাদ্যদ্রব্যটি কি জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ হইল, কিন্তু ভদ্রলোক কিছুতেই আমাদিগকে বলিবেন না; তিনি হঠাৎ সেই জিনিষটা খাদ্যরূপে আমাদের পাতের সম্মুখে দিয়া একেবারে আমাদিগকে Surprise করিয়া ফেলিবেন এই তাঁহার উদ্দেশ্য। আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলাম, নিশ্চয়ই "ইলিশ মাছ।" কিন্তু কৈ? আহারে বসিয়া দাইল, চচ্চড়ি, ভাজা, মাছের ঝোল, অম্বল, সব জিনিষ একে একে পরিবেশন করা হইল, কিন্তু তাহার মধ্যে ত সে আশ্চর্য্য বস্তু পাওয়া গেল না। অবশেষে গৃহস্বামী স্বয়ং পরিবেষ্টা হইয়া উপস্থিত; তাঁহার হস্তে একখানি থালায় কয়েকটি "খেজুরে গুড়ের সন্দেশ।" অনেক দিন এমন জিনিষ দর্শন হয় নাই, সুতরাং Surprised না হই,—পরিতৃপ্ত হওয়া গেল। গৃহস্বামী বলিলেন অত্যুৎকৃষ্ট মেওয়া খাওয়াইয়াও তিনি এত দূর তৃপ্তি লাভ করিতেন না। আমি এ হেন অমূল্য ধন গুড়ের কলসীর বাহক; সাহারণপুরের বন্ধুর সহধর্ম্মিণী আমাকে এবার যে কি করিবেন ভাবিয়া পাইতেছি না।

এই নারিকেলের বস্তা ও গুড়ের কলসী লইয়া আমি এলাহাবাদ ষ্টেসনে একটি মধ্যশ্রেণীর কামরায় প্রবেশ করিলাম। সে কামরায় অধিক লোক ছিল না; একজন সন্ন্যাসী সর্ব্বাঙ্গ গৈরিক বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া বসিয়া আছেন। মনে করিলাম ভালই হইল; সাধুসঙ্গে, সৎপ্রসঙ্গে দিনটা কাটিয়া যাইবে। গাড়ীতে উঠিয়া আমার মহামূল্য দ্রব্য দুইটি বেঞ্চের নীচে এক পার্শ্বে বিশেষ যত্ন করিয়া রাখিলাম। তাহার পর কামরার দ্বারের পার্শ্বে বেশ একটু ভাল করিয়া উপবেশন করিলাম। সাধুর দিকে এখন দেখিবার সময় হইল। দেখিলাম লোকটি এখনও ভাল করিয়া সন্ন্যাসী হইতে পারে নাই; মাথার চুলগুলি অতি দীর্ঘ হইলেও এখনও জটা বাঁধে নাই; মুখশ্রী এখনও রৌদ্রদগ্ধ হয় নাই, এখনও সেই গৌর মুখমণ্ডল হইতে সুসম্পন্ন গৃহস্থের সযত্নপুষ্ট দেহের আভা বাহির হইতেছে। দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় সন্ন্যাসী কোন বড় মানুষের ছেলে, অতি অল্প দিন এ পথে আসিয়াছেন এবং তাঁহার দেহের কমনীয়তা দর্শনে তাঁহাকে শক্তু ভোজী বলিয়া কিছুতেই মনে হয় না। বয়স বোধ হয় ২৭।২৮

বৎসর, মুখে দাড়ী আছে। তিনি যে ভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন তাহাতে বোধ হইল তাঁহার ক্রোড়ে কিছু আছে। কিন্তু এক জন সাধুর সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এমন করিয়া অনুসন্ধিৎসুর চক্ষে দর্শন করা ভদ্রনীতিবিগর্হিত মনে করিয়া আমি অপর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। মনে প্রবল আগ্রহ সাধুর সহিত আলাপ করি, কিন্তু তাঁহার শূন্য দৃষ্টি এবং উদাস ভাব দেখিয়া আমি কোন কথাই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য মনে করিলাম না। বিশেষতঃ গৃহস্থ মাত্রেরই কর্ত্তব্য এই যে সাধুগণের সহিত আপনা হইতে কোন কথা আরম্ভ না করা। কোন সন্ন্যাসী কি ভাবের তাহা জানা যায় না, অকস্মাৎ একটা প্রশ্ন করিয়া তাঁহাদিগকে বিরক্ত করা অনুচিত! আমি এ অনুচিত কাজও তখন করিতাম, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি সন্ন্যাসীর উদাস দৃষ্টি আমাকে মোটেই অগ্রসর হইতে দিল না।

এলাহাবাদ ষ্টেসনে গাড়ী একটু বেশী ক্ষণ অপেক্ষা করে। গাড়ী ষ্টেসনে পৌঁছিবা মাত্রই আমি উঠিয়া বসিয়াছি এবং এতক্ষণে বড় জোর পাঁচ মিনিট সময় গিয়াছে। সন্ন্যাসী এমন সময়ে আমাকে অতি মধুর পরিষ্কার আওয়াজে (বাঙ্গলায়) জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় বলিতে পারেন এখানে আর কতক্ষণ গাড়ী থাকিবে?" আমি জানিতাম এলাহাবাদে এ গাড়ী আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করে, আমি সেই আধ ঘণ্টা হইতে পাঁচ সাত মিনিট বাদ দিয়া সময় বলিলাম। "অমর, বাবা, একটু উঠে বসতো" এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসী তাঁহার গৈরিক গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিলেন,—তাঁহার ক্রোড়ে শয়নাবস্থায় একটি ৪।৫ বৎসরের বালক অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় রহিয়াছে। গাত্রবস্ত্র অপসারিত হইল দেখিয়া বালকটি সন্ন্যাসীর কোলের উপর বসিল। চেহারা দেখিয়াই বলিতে পারা যায়, বালকটি সন্ন্যাসীর পুত্র, মুখশ্রী ঠিক এক, বর্ণ সুন্দর গৌর; পিতাকে দেখিয়া মনে সন্দেহ হইয়াছিল, বড় মানুষের ছেলে; এখন ছেলেটিকে দেখিয়া দৃঢ় বিশ্বাস হইল, অতি সম্ভ্রান্ত গৃহের অধিবাসী এই দুইটি পিতা পুত্র কোথায় চলিয়া যাইতেছেন। "মহাশয়, ছেলেটিকে একটু দেখবেন্ তো, আমি জল নিয়ে আসি" এই বলিয়া ছেলেটিকে বেঞ্চের উপর বসাইয়া সন্ন্যাসী গাড়ীর মধ্যে দণ্ডায়মান হইলেন। আমি অনেক সুপুরুষ দেখিয়াছি, কিন্তু এই গৈরিক পরিহিত যুবকের মত অনিন্দ্যসুন্দর রূপ আমি আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে

হয় না। আমি একদৃষ্টে তাঁহার দিকেই চাহিয়া রহিলাম, তিনি ধীরে ধীরে আমার সম্মুখে আসিয়া গাড়ীর দ্বার খুলিয়া প্ল্যাটফরমে নামিলেন। আমি তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া ছেলেটিকে কোলে করিতে গেলাম। আমাকে উঠিয়া যাইতে দেখিয়াই সন্ন্যাসী বলিলেন "আপনাকে কষ্ট কোরে' যেতে হবে না, ও বেশ চুপ কোরে' বোসে থাক্‌বে।" আমি যতটুকু অগ্রসর হইয়াছিলাম সেই খানেই বেঞ্চে বসিয়া পড়িলাম। ছেলেটির মুখখানি এমনই সুন্দর, আর এমনই হাসিমাখা যে দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। আমি কথা বলিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না, অতি ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার নাম কি বাবা?" ছেলেটি অমনই উত্তর করিল "অমরনাথ।" "উনি কি তোমার বাবা?" "আমার বাবা।" ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করি তোমাদের বাড়ী কোথায়, কিন্তু সে ইচ্ছা নিবারণ করিলাম; সন্ন্যাসীর যদি আত্মগোপন অভিপ্রায় হয় তাহা হইলে এই বালকটির নিকট হইতে সে সংবাদ গ্রহণ করা আমার পক্ষে বিশেষ অন্যায় কাজ। আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কি খেয়েছ?" "দুধ খেয়েছি।" "এখন খিদে পায় নি?" "না, রাত্রে খিদে পাবে।" আমি আরও কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম, এমন সময়ে সন্ন্যাসী আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন, তাঁহার হস্তে একটা নূতন পিতলের কমণ্ডলুপূর্ণ জল। গাড়ীতে উঠিয়াই ছেলেটির কাছে গিয়া বলিলেন "অমর, জল খাবে?" "খাবো" বলিয়া বালকটি সেই কমণ্ডলু দুই হাতে ধরিয়া জল পান করিল। তাহার পান শেষ হইলে সন্ন্যাসী কমণ্ডলুটা পাশেই রাখিয়া দিলেন এবং বালকটিকে কোলে লইয়া বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিলেন। আমার মনে হইল এই অল্প ক্ষণের জন্য শিশুটিকে বক্ষচ্যুত করিয়াই সন্ন্যাসীর বুঝি বুক-বড়ই খালি বোধ হইয়াছিল, তাই শিশুটিকে এমন করিয়া বুকের মধ্যে ধরিলেন। আমি তাঁহার সেই একটি কার্য্যেই তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত আবেগ বুঝিতে পারিলাম; বুঝিলাম এই পাঁচ বৎসরের বালকটিই সন্ন্যাসীর জপ তপ, জীবনের ধ্রুবতারা।

আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না; সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কোথায় যাবেন?" তিনি বলিলেন 'সাহারণপুর।' "সাহারণপুরেই থাক্‌বেন, কি আর কোথায় যাবেন?" "সাহারণপুর থেকে হরিদ্বার যাবো।" আমি তাঁহাকে বলিলাম যে হরিদ্বার যাবার সোজা পথ থাকিতে তিনি

এ বাঁকা পথ ধরিলেন কেন। তাহার জবাবে বুঝিলাম যে তাঁহাকে সাহারণপুর হইয়াই হরিদ্বার যাওয়ার পথ এক জন বলিয়া দিয়াছিল, তাই তিনি সেই পথেই যাইতেছেন। আমিও সাহারণপুর অবধি যাইব এ কথা তাঁহাকে জানাইয়া দিলাম। তিনিও সহর্ষে "বেশ তো এক সঙ্গে অনেক পথ যাওয়া যাবে" বলিলেন। তার পরে আর কথা নাই।

আমি এদিকে কিন্তু সন্ন্যাসীর কথা জানিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইয়া পড়িয়াছি এবং কেমন করিয়া আবার কথা পাড়িব তাহাই ভাবিতেছি। কিন্তু আমাকে সে ভাবনা করিতে হইল না, সন্ন্যাসী কথা পাড়িলেন এবং আমার গন্তব্য স্থানের সংবাদ লইলেন। অন্যান্য সংবাদও লইলেন; তার পর যখন শুনিলেন যে আমার কোন কিছুরই ঠিক নাই, আমি বুকভরা একটা শ্মশানবহ্নি লইয়া দেশময় ছুটিয়া বেড়াইতেছি, তখন সেই সন্ন্যাসীর মর্ম্মের অন্তস্তল হইতে এমন একটি কাতর "ওঃ!" বাহির হইল যে তাহার শোককম্পনে আমার হৃদয় পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া উঠিল; সেই একটি দীর্ঘ নিশ্বাস এবং একটি অস্ফুট অব্যক্ত কাতরোক্তির ভিতর দিয়া সন্ন্যাসীর হৃদয়ের জ্বলন্ত অগ্নিশিখা শত মুখে বাহির হইয়া পড়িল। আমার আর কথা বলিবার শক্তি রহিল না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

'উৎসাহের' ক্ষুদ্র কলেবরে সন্ন্যাসীর মর্ম্মবেদনার স্থান এবারে হইবে না। বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীজলধর সেন।

সে আমার জননী রে!

ভৈরবী রূপক।

কে এসে যায় ফিরে ফিরে
আকুল নয়নের নীরে?
কে বৃথা আশাভরে
চাহিছে মুখপরে?
সে যে আমার জননী রে!

কাহার সুধাময়ী বাণী
মিলায় অনাদর মানি?
কাহার ভাষা হায়
ভুলিতে সবে চায়?
সে যে আমার জননী রে!

ক্ষণেক স্নেহকোল ছাড়ি'
চিনিতে আর নাহি পারি।
আপন সন্তান
করিছে অপমান,—
সে যে আমার জননী রে!

বিরল কুটীরে বিষণ্ণ
কে বসে' সাজাইয়া অন্ন?
সে স্নেহ-উপহার
রুচে না মুখে আর!
সে যে আমার জননী রে!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জগৎ শেঠ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মাণিকচাঁদ।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঢাকা বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজধানী-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাঙ্গলার প্রাচীন রাজধানী গৌড় মহামারীতে ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, বঙ্গসিংহাসন তাণ্ডা, রাজমহল প্রভৃতি স্থানে কিছু দিন অবস্থান করিয়া অবশেষে পূর্ব্ববঙ্গের গৌরবস্থল ঢাকায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ষোড়শ শতাব্দী হইতে নিম্নবঙ্গ নানারূপ অত্যাচার সহ্য করিতেছিল। পর্ত্তুগীজ, মগ প্রভৃতি দস্যুগণের উপদ্রবে বঙ্গভূমি জলে স্থলে সর্ব্বত্রই সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, ইহার সঙ্গে উড়িষ্যার পাঠানদিগের অত্যাচারও মিশ্রিত হয়। এতদ্ভিন্ন ইয়োরোপীয়গণ সেই সময়ে বাণিজ্যের জন্য বঙ্গদেশকে একরূপ আপনাদের আবাসভূমি করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাঙ্গলার শেষপ্রান্তে রাজধানী স্থাপিত হওয়ায় তাঁহারা অনেক পরিমাণে অবাধ বাণিজ্যের সুখভোগ করিতেছিলেন। এই সমস্ত বিষয় দমন করিবার জন্য ঢাকা রাজধানীর উপযুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচিত হয়। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইস্মাইল খাঁ * বাঙ্গলার সুবাদারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, তিনি পূর্ব্বোক্ত উপদ্রব সকল নিবারণের জন্য, বিশেষতঃ ফিরিঙ্গি জলদস্যুদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার ইচ্ছায়, ঢাকায় মসনদ স্থাপন করিতে বাধ্য হন। কিন্তু ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সা সুজা পুনর্ব্বার রাজমহলে মসনদ লইয়া আসেন। সম্রাট সাজাহাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে অন্তর্বিবাদ উপস্থিত হইলে, আরঙ্গজেব সা সুজাকে দমন করিবার জন্য তাঁহার প্রধান সেনাপতি মীর জুম্লাকে প্রেরণ করেন, মীর জুম্লা সা সুজাকে রাজমহল হইতে বিতাড়িত করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে, পরে আরাকাণ প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। তথায় সা সুজার মৃত্যু হইলে, মীর জুম্লা বাঙ্গলার সুবাদার হইয়া পূর্ব্ববঙ্গেই অবস্থান করিতে থাকেন, এবং আসাম, কুচবিহার প্রভৃতি আক্রমণের পর অবশেষে ঢাকায় আসিয়া তাঁহার জীবনবায়ুর অবসান হয়। তাঁহার পরেই সুপ্রসিদ্ধ সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গলার সুবাদারীর ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

* ওয়াল্টার হ্যামিল্টন বলেন—এই নবাবের নাম ইস্লাম খাঁ; যথা—In A. D. 1608 the seat of Government was removed from Rajmahal to this place by the then Governor of Bengal Islam Khan.——Walter Hamilton's East India Gazetteer, Vol. I. 477. 'উৎসাহ'-সম্পাদক।

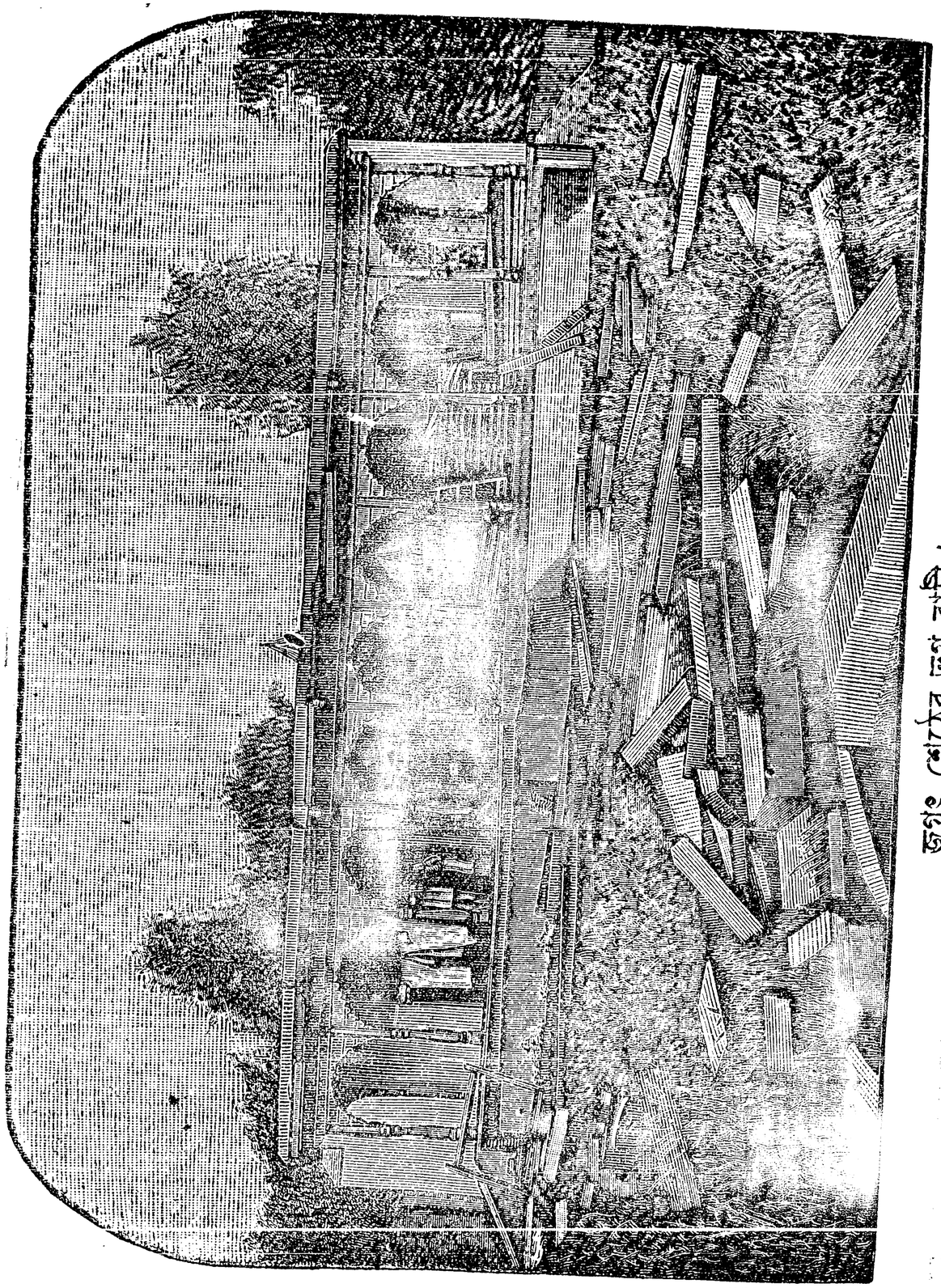

জগৎ শেঠের ভগ্ন বাটী।

সেই সময়ে আবার আরাকাণী ও পর্ত্তুগীজ দস্যুদিগের উপদ্রব আরম্ভ হওয়ায় তিনি ঢাকাতেই রাজধানী পুনঃস্থাপিত করিতে বাধ্য হন। খ্রীষ্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুর্শিদ কুলি খাঁ মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপন করেন, এবং মুর্শিদাবাদই বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার শেষ মুসলমান রাজধানী।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে যৎকালে ঢাকা বাঙ্গলার রাজধানী-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই সময়ে বাণিজ্যাদি ব্যাপারে ইহার অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। নবাব সায়েস্তা খাঁর শাসনসময়ে ঢাকা বিশেষ রূপ উন্নতি লাভ করে। রাজস্ব, বাণিজ্য ও অন্যান্য ব্যবসায়ের জন্য ঢাকা নগরীতে প্রতিনিয়ত অর্থের প্রয়োজন হইত, সেই জন্য হীরানন্দ ইহাতে একটি গদী স্থাপিত করিয়াছিলেন। মাণিকচাঁদ সেই গদীর ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। মাণিকচাঁদ অত্যন্ত কার্য্যদক্ষ ছিলেন, তিনি দিন দিন ঢাকার গদীর উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন। তৎকালে স্বর্ণপ্রসবিনী বঙ্গভূমি বাণিজ্যস্রোতে প্রতিনিয়ত ভাসমান থাকায় ঢাকার গদী শেঠদিগের মধ্যে বিশেষ রূপে উন্নতি লাভ করে। এমন কি দিল্লী আগরার গদী অপেক্ষা ইহারই প্রসিদ্ধি রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। যৎকালে মাণিকচাঁদ ঢাকায় গদীয়ানের কার্য্য করিতেছিলেন, সেই সময়ে সম্রাট আরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম ওশ্মান বাঙ্গলার সুবাদারী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সহিত মাণিকচাঁদের যথেষ্ট পরিচয় হয়। অনেক সময়ে নবাবকে শেঠদিগের গদী হইতে অর্থাদি লইতে হইত বলিয়া এই পরিচয় ঘটিয়াছিল। এই সময়ে মুর্শিদ কুলি খাঁ বাঙ্গলার দেওয়ান হইয়া ঢাকায় উপস্থিত হইলেন। রাজস্ব বিষয়ে সমস্ত ভার দেওয়ানের প্রতি ন্যস্ত থাকায় মাণিকচাঁদের সহিত অল্প দিনের মধ্যেই পরিচয় হইল, কেবল পরিচয় বলিয়া নহে, ক্রমে ক্রমে উভয়ের মধ্যে বেশ একটু সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইল। তৎকালে দেওয়ানের ক্ষমতাও অসীম ছিল, সুতরাং দেওয়ান মুর্শিদের উৎসাহে ও সাহায্যে মাণিকচাঁদের যে দিন দিন উন্নতি লাভ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? বাস্তবিকই দেওয়ানের জন্য তাঁহার উন্নতি ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

মোগল বাদশাহদিগের সময় হইতে বাঙ্গলার রাজস্বসম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত হয়, সম্রাট আরঙ্গজেব উক্ত রাজস্বের বন্দোবস্তের জন্য দেওয়ানের পদ সৃষ্টি করেন। তাঁহার আর এক উদ্দেশ্য এই ছিল যে, নবাবের হস্ত হইতে কতক ক্ষমতা লইয়া

আর এক জন প্রধান কর্ম্মচারীর প্রতি অর্পণ করিলে, উভয়েরই ক্ষমতা কতকটা সুসংযত হইবে। এক জনের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা থাকিলে ভবিষ্যতে নানারূপ গোলযোগ ঘটিতে পারিত। সেই সময় হইতে নাজিম ও দেওয়ান এই দুই পৃথক্ পদের সৃষ্টি হয়। যুদ্ধ ও শাসনসংক্রান্ত সমস্ত ভার নাজিমের উপর অর্পিত হইত। তিনিই সাধারণতঃ নবাব বা সুবাদার নামে অভিহিত হইতেন। দেওয়ান রাজস্বসংগ্রহ, তাহার বন্দোবস্ত ও সেই রূপ অন্যান্য কার্য্য এবং কোষাধ্যক্ষেরও কার্য্য করিতেন। তাঁহার হস্ত হইতে রাজ্যসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে অর্থাদির ব্যয় হইত, এমন কি, নাজিম পর্য্যন্তও দেওয়ানের নিকট হইতেই বেতন গ্রহণ করিতে হইত। ইহাতে বুঝা যায় যে দেওয়ানেরও ক্ষমতা নিতান্ত অল্প ছিল না, অথচ এক জনে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতেন না। মুর্শিদ কুলি খাঁর পূর্ব্বে বাঙ্গলা হইতে অতি অল্প পরিমাণেই রাজস্ব সংগৃহীত হইত, অথচ বাঙ্গলা চিরদিনই স্বর্ণপ্রসবিনী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। বাঙ্গলার রাজস্ব অনেক অসদুপায়ে ব্যয়িত হইত, এবং ইহার অনেক ভূমি জায়গীররূপে নির্দ্দিষ্ট থাকায় অধিক পরিমাণে রাজস্ব আদায় হইতে পারিত না। বাঙ্গলার রাজস্বের ক্রমেই লাঘব দেখিয়া বাদশাহ আরঙ্গজেব ইহার সুবন্দোবস্তের জন্য কার্য্যদক্ষ মুর্শিদ কুলিকে বাঙ্গলায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

মুর্শিদ কুলি খাঁ ব্রাহ্মণের সন্তান বলিয়া বিখ্যাত, একজন পারসীক সওদাগর তাঁহাকে দাসরূপে ক্রয় করিয়া পারস্যে লইয়া যান, ও তথায় মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তিনি তথা হইতে দাক্ষিণাত্যে আগমন করিয়া বেরারের দেওয়ানের অধীন কিছু দিন কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার আয়, ব্যয়, হিসাব, নিকাশ প্রভৃতি বিষয়ের বিশিষ্ট জ্ঞানের কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। বাদশাহ আরঙ্গজেব সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন; তিনি মুর্শিদ কুলির কার্য্যদক্ষতার কথা অবগত হইয়া তাঁহাকে হায়দরাবাদের দেওয়ানী পদ প্রদান করেন, পরে তথা হইতে ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলায় পাঠাইয়া দেন। সেই সময়ে বাদশাহ আরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম ওশ্মান বাঙ্গলার সুবাদারী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মুর্শিদ কুলি ঢাকায় আসিয়া রাজস্ব বিষয়ের বন্দোবস্ত আরম্ভ করিলেন, তিনি রাজস্ব আদায়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সরকারে নিজের পরিচিত লোক সকল পাঠাইয়া দিলেন। জায়গীর ভূমি সকল বাঙ্গলা

হইতে উঠাইয়া তৎপরিবর্ত্তে উড়িষ্যা প্রদেশের ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিলেন। তাঁহার বন্দোবস্তে বাঙ্গলা হইতে কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হইতে লাগিল। রাজ্যসংক্রান্ত যাবতীয় আয়ব্যয়াদির ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হওয়ায় দেওয়ান মুর্শিদ কুলিকে অনেক সময়ে প্রয়োজনানুসারে শেঠ মাণিকচাঁদের সহিত আদান প্রদানব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। ক্রমে উভয়ের মধ্যে বিশেষ একটু ঘনিষ্ঠতাও হয়। দেওয়ান রাজস্ববন্দোবস্ত প্রভৃতি বিষয়ে মাণিকচাঁদের নিকট হইতে অনেক পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, এবং যাহাতে মাণিকচাঁদের গদীর উন্নতিসাধন হয় সে বিষয়েও দেওয়ানের মনোযোগের অভাব ছিল না। এইরূপে দেওয়ানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হওয়ায় লোকে শেঠ মাণিকচাঁদের সহিতই আদান প্রদান করিতে যত্নবান হইল। কি জমিদার, কি ব্যবসায়ী সকলেই মাণিকচাঁদের গদীতে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন, কাজেই দিন দিন তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

মুর্শিদ কুলি খাঁ সম্রাট আরঙ্গজেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন; তাহার কার্য্যদক্ষতাই ইহার একমাত্র কারণ। বিশেষতঃ বাঙ্গলার এইরূপ সুবন্দোবস্তে তিনি মুর্শিদের প্রতি অত্যধিক প্রীত হইয়াছিলেন। মুর্শিদের প্রতি সম্রাট আরঙ্গজেবের এরূপ প্রীতি নবাব আজিম ওশ্মানের ভাল লাগিত না। তিনি সম্রাটবংশধর, কাজেই দেওয়ানের এরূপ ক্ষমতাবিস্তার তাঁহার পক্ষে অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। বিশেষতঃ রাজ্যের সমস্ত আয়ব্যয় মুর্শিদের ন্যায় দেওয়ানের হস্তে অর্পিত হওয়ায়, তাঁহার বিলাস, বিশ্রামেরও অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইল। এই সমস্ত কারণে তিনি মুর্শিদকে অপদস্থ করিতে যত্নবান হইলেন, কেবল তাহাই নহে, তাঁহার প্রাণসংহারের ষড়যন্ত্র পর্য্যন্ত হইল। নবাবের অধীন একজন সেনাপতি আপনাদিগের বেতন আদায় করিবার ছলে দেওয়ানকে আক্রমণ করিবার জন্য নবাবের নিকট অনুমতি চাহে। নবাব গোপনে তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন। প্রকাশ্যে দেওয়ানের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিলে পাছে সম্রাট বিরক্ত হন, এইজন্য তিনি কৌশল অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। উক্ত সেনাপতি আপনার দলবল লইয়া পথিমধ্যে দেওয়ানকে আক্রমণ করে, কিন্তু সে সময়ে দেওয়ান এরূপ সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, অবশেষে তাহারা পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। সমস্তই আজিম ওশ্মানের সম্ম-

তিতে হইয়াছে ইহা বুঝিতে দেওয়ানের বিলম্ব হইল না। তিনি প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া নবাবকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। নবাব আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণের জন্য উক্ত সেনাপতিকে আহ্বান করাইয়া দেওয়ানের সম্মুখেই তাহার প্রতি অনেক তীব্র শাসনবাক্য প্রয়োগ করেন। দেওয়ান তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া অবিলম্বে তাহাদের সমস্ত প্রাপ্য পাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, এবং নবাবের প্রতি যারপর নাই বিরক্ত হইলেন।

নবাব আজিম ওশ্মানের সহিত এইরূপ মনোবিবাদ ঘটায় দেওয়ান মুর্শিদ কুলি ঢাকায় অবস্থান করা নিরাপদ মনে করিলেন না। তিনি সমস্ত ঘটনাই সম্রাটের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। পরে আপনার আত্মীয় বন্ধুবান্ধব, অধীন কর্ম্মচারী বিশেষতঃ শেঠ মাণিকচাঁদের সহিত পরামর্শ করিয়া ঢাকা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। দেওয়ানের সহিত তাঁহার অধীন দেওয়ানী বিভাগের সমস্ত কর্ম্মচারীই আসিতে প্রস্তুত হইল। মুর্শিদ কুলি খাঁ শেঠ মাণিকচাঁদকেও সেই সঙ্গে আসিতে অনুরোধ করিলেন, এবং তাঁহাকে এইরূপ সাহস প্রদান করিলেন যে যতদিন বঙ্গরাজ্যের কোন না কোন ভার তাঁহার উপর অর্পিত থাকিবে, ততদিন যাহাতে শেঠ মাণিকচাঁদ বাঙ্গলার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গদীয়ান বলিয়া প্রতিপন্ন হন, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষরূপ দৃষ্টি থাকিবে। মাণিকচাঁদ মুর্শিদ কুলির দ্বারা যৎপরোনাস্তি উপকৃত হইয়াছিলেন। তিনি আরও দেখিলেন যে, ঢাকা হইতে দেওয়ানী বিভাগ স্থানান্তরিত হইলে তথায় আর গদীর কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া কষ্টকর হইবে, এবং তাঁহার প্রতি যদি দেওয়ানের অনুগ্রহদৃষ্টি থাকে তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাঁহার যে অধিকতর উন্নতি সাধিত হইবে সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ দেওয়ান মুর্শিদ কুলি মুক্সুদাবাদে দেওয়ানী বিভাগ লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে মুক্সুদাবাদের নিকটস্থ বঙ্গের প্রধান বন্দর কাশীমবাজার দিন দিন বাণিজ্যে শ্রীশালী হইয়া উঠিতেছিল। মুক্সুদাবাদে গমন করিলে প্রধান প্রধান বণিক্‌সম্প্রদায়ের সহিতও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইতে পারিবে। ইত্যাদি মনে করিয়া তিনি দেওয়ানের সহিত ঢাকা পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। যদিও এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ব্যবসায় উঠাইয়া লইয়া গেলে প্রথমতঃ কিছু ক্ষতিস্বীকার করিতে হয়, তথাপি ভবিষ্যতে যদি সে বিষয়ের অপরিসীম

উন্নতিসম্ভাবনা থাকে, তাহাতে সেরূপ আপাতক্ষতি সহ্য করিতে বিচক্ষণমাত্রেই কুণ্ঠিত হন না। বাস্তবিক পরিশেষে শেঠ মাণিকচাঁদের পক্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল। মুক্সুদাবাদে আসার পর হইতে শেঠদিগের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর চরম সীমায় উপনীত হইতে আরম্ভ করে।

মুর্শিদ কুলি মুক্সুদাবাদকে বাঙ্গলার মধ্যস্থলে ও ভাগীরথীতীরে অবস্থিত বলিয়া দেওয়ানীর উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ভাগীরথী বাঙ্গলার বাণিজ্যকার্য্যপরিচালনের একমাত্র প্রধান উপায় ছিল। কাশীমবাজার, হুগলী প্রভৃতি প্রধান প্রধান বন্দর ইহারই তীরে অবস্থিত ছিল। ইউরোপীয়গণ নানা প্রকার বাণিজ্য অতি চতুরতার সহিত নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইলে মুক্সুদাবাদের ন্যায় স্থানই উপযুক্ত। পূর্ব্ববঙ্গ অপেক্ষা তৎকালে ইহার স্বাস্থ্যও ভাল ছিল, এবং আরাকাণী, পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি দস্যুগণের উপদ্রব সে সময়ে শান্ত হইয়াছিল; সুতরাং সে সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে থাকার বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না, বিশেষতঃ সে সমস্ত বিষয়ের সহিত নাজিমেরই সম্বন্ধ ছিল, দেওয়ানের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল না। বিহার ও উড়িষ্যার সহিত সম্বন্ধ রাখিতে হইলে মুক্সুদাবাদের ন্যায় স্থানেই অবস্থান করা কর্ত্তব্য, কারণ মুক্সুদাবাদ হইতে উভয় প্রদেশে যাতায়াতের সুগম পথ বিদ্যমান ছিল। এই সকল কারণে মুর্শিদ কুলি খাঁ মুর্শিদাবাদে দেওয়ানী বিভাগ স্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হন। তিনি ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ানী বিভাগের সমস্ত কর্ম্মচারী, শেঠ মাণিকচাঁদ ও অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সহিত ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া মুক্সুদাবাদে উপস্থিত হইলেন। মুর্শিদাবাদের বর্ত্তমান কেল্লার মধ্যেই তিনি নিজ বাসভবন নির্ম্মাণ করেন। শেঠ মাণিকচাঁদ তাহার নিকট মহিমাপুর নামক স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। মহিমাপুর মুর্শিদাবাদ হইতে এক ক্রোশের কিছু অধিক উত্তরে অবস্থিত। আজিও তথায় শেঠভবনের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। মহিমাপুরে গদী স্থাপন করিয়া শেঠ মাণিকচাঁদ স্বীয় ব্যবসায়ে বিশেষরূপ মনোযোগ প্রদান করিলেন। দেওয়ানের সাহায্যে ও উৎসাহে তাঁহার গদী অল্প দিনের মধ্যেই বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গদী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িল।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

সে দেশে।

১

সে দেশে বসন্ত নাই, নাহি এ মলয়,
সে দেশে সরলা আছে, তাই ফুল ফোটে গাছে,
তাহারি গায়ের গন্ধ পরিমলময়!
সে দেশে বসন্ত নাই, নাহি এ মলয়!

২

সে দেশে বসন্ত নাই, নাহি এ মলয়,
সে দেশে সরলা আছে, তাই শ্যামা ডাকে গাছে,
কোকিল কুহরি উঠে কথা যদি কয়!
সে দেশে বসন্ত নাই, নাহি এ মলয়!

৩

সে দেশে বরষা নাই, নাহি মেঘচয়,
সরলা আছে সে দেশে, তারি নীল কাল কেশে,
খেলে প্রেম-ইন্দ্রধনুঃ চারু শোভাময়!
সে দেশে বরষা নাই, নাহি মেঘচয়!

৪

সে দেশে বরষা নাই, নাহি মেঘচয়,
সে দেশে সরলা চেলে' তরল বিদ্যুৎ খেলে,
অমৃত আলোকে হাসে দিক্ সমুদয়!
সে দেশে বরষা নাই, নাহি মেঘচয়!

৫

সে দেশে শরৎ নাই, নাহি শীতভয়,
সে দেশে সরলা হাসে, জ্যোছনা তা' নীলাকাশে,
স্থলে তাহা স্থলপদ্ম, জলে কুবলয়!
সে দেশে শরৎ নাই, নাহি শীতভয়!

৬

সে দেশে শরৎ নাই, নাহি শীতভয়,
সে দেশে প্রভাত রেতে, সরলা বিদায় চেতে,
শিশিরে শিহরি পড়ে শেফালিকাচয়!
সে দেশে শরৎ নাই, নাহি শীতভয়!

৭

সে দেশে দিবস নাই, নিশা নাহি হয়,
সে দেশে সরলা আছে, রবিশশী তারি কাছে,
ঘোমটার তলে হাসে, একত্র উভয়!
সে দেশে দিবস নাই, নিশা নাহি হয়!

৮

সে দেশে দিবস নাই, নিশা নাহি হয়,
সে দেশে সরলা আছে, ঊষা সন্ধ্যা তারি কাছে,
কেহ আগে কেহ পাছে এক সাথে রয়!
সে দেশে দিবস নাই, নিশা নাহি হয়!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

—oo—

রমণীর অধিকার।

মনুসংহিতা পাঠ করিলে দেখা যায় যে, হিন্দুশাস্ত্রে মহিলাদিগের প্রতি ভক্তি না হউক অন্ততঃ সম্মানের ব্যবস্থা থাকিলেও, স্ত্রীজাতির উপর সংহিতাকারের বিশেষ বিশ্বাস ছিল না। তিনি পুনঃ পুনঃই বলিয়াছেন "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি"—

"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥"

(মনু ৯।৩)

যে গৃহ সর্ব্বদেশেই রমণীর প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া স্বীকৃত, সে গৃহেও রমণীর স্বাতন্ত্র্য নাই—

"বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎকার্য্যং গৃহেষ্বপি॥"

(মনু ৫।১৪৭)

হিন্দুশাস্ত্রকারের মতে পতিই স্ত্রীর দেবতা—পতিসেবাই রমণীর ইহকাল ও পরকালের সুখের কারণ—

"নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥"

(মনু ৫।১৫৫)

মহিলাদিগের সম্বন্ধে প্রাচ্যমত এইরূপ, প্রতীচ্য দেশে এই বিষয়ে প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু এই প্রভেদ আবার কিরূপ তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা অসম্ভব। কারণ মহিলাদিগকে "ভোট" দিবার অধিকার প্রদান করিতে ইংলণ্ডের উদারনৈতিক দলও প্রস্তুত নহেন। অধিকন্তু কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলাদিগকে উপাধিপ্রদানের প্রস্তাবে যেরূপ গোলযোগ হইয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ হয় ইংরাজের রমণীদিগের প্রতি সম্মানের কথা অনেকটা মৌখিকমাত্র—এখনও ইংলণ্ডে অনেকে মনে করেন "Woman is the lesser man."

প্রতীচ্য প্রদেশসমূহে "রমণীর অধিকার" প্রশ্ন এখন বিশেষভাবে আলোচিত হইতেছে। এখন পুরুষ আপনার প্রাচীন অধিকার যতই প্রবল আবেগে আঁকড়াইয়া ধরিতেছেন, মহিলাসমাজে সেই সকল অধিকারের প্রতি আক্রমণ ততই বলবৎ হইয়া উঠিতেছে।

এই আন্দোলনের উন্মত্ততায় এখন অনেক মহিলা এমন কথাও বলিতেছেন যে, পুরুষজাতির সহিত স্ত্রীজাতির কোনই সম্বন্ধ নাই—দুই জাতি সম্পূর্ণ ভাবে স্বতন্ত্র! স্বতন্ত্র ভাবে, স্বতন্ত্র পথে স্ত্রীজাতির উন্নতি আবশ্যক; তাহাতে পুরুষের সাহায্য বা সংস্রব থাকিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। কবিবর টেনিসনের Princess কাব্যের নায়িকার কল্পনা এখন অনেকের মনে স্থান পাইতেছে। তবে আমাদিগের এ আশা আছে যে, এই আন্দোলনের উন্মত্ততার সঙ্গে সঙ্গে এ সকল বাতুলের কল্পনাও তিরোহিত হইয়া যাইবে।

রমণীগণ তাঁহাদিগের ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য অধিকার সকল পাইলে, রমণী-সমাজের কুসংস্কারের ঘনান্ধকারে শিক্ষার আলোকরশ্মি প্রবেশলাভ করিলে, যে সমাজের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। রমণী-সমাজে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে শিক্ষা হইতে উদ্ভূত বৈষম্য যতই দূর হইয়া যাইবে, ততই যে আমাদিগের সংসারে সুখের শত উৎস উৎসারিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। স্ত্রীকে স্বামীর "খেলাসাথী" না করিয়া "হৃদিসাথী" করিতে হইলে, এই বৈষম্য দূর করাই নিতান্ত প্রয়োজন। যে জাতির অর্দ্ধাঙ্গ পঙ্কে নিমজ্জিত, সে জাতির অপরার্দ্ধকেও সেই পঙ্কের অতি নিকটে বাস করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়—তাহার পক্ষে অধিক উচ্চে উঠিবার আশা বাতুলের কল্পনা। যে জাতির জননী ও পত্নী অজ্ঞানতিমিরাবৃত সে জাতির পক্ষে জ্ঞানালোক বিভাসিত হইয়া জাতি-হিসাবে উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ সহজসাধ্য নহে।

কাজেই এ কথা বলা বাহুল্য যে রমণীদিগকে তাঁহাদিগের ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য অধিকার সকল প্রদান করা কেবল স্ত্রীজাতির পক্ষে নহে, পরন্তু সমগ্র সমাজের পক্ষেই মঙ্গলকর। কিন্তু প্রতীচ্যে "রমণীর অধিকার" প্রশ্নের আন্দোলনের মত্ততায় ইহার বিপরীত ব্যাপার লক্ষিত হইতেছে।

প্রাকৃতিক নিয়মে স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতির মধ্যে কোন চিরস্থায়ী বা দীর্ঘ-কালস্থায়ী বিবাদ সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু কিছুকালস্থায়ী বিবাদের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। পূর্ব্বকালে রোমসাম্রাজ্যে একবার এইরূপ বিবাদ দৃষ্ট হইয়াছিল—তখন উচ্চদলস্থগণ সমানে সমানে বিবাহের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আবার মধ্যযুগে এই বিবাদের ফলে ধর্ম্মপ্রবণ বহু মহাত্মা মনে করিতেন যে, জগতে যদি রমণী না থাকিত তবে লোকে অধিক সৎ হইত। কোন কোন ধর্ম্মযাজকসম্প্রদায়ে আজিও বিবাহ নিষিদ্ধ।

এখন শিক্ষাস্রোত অন্তঃপুরের প্রাচীর অতিক্রম করিয়াছে; তাই বহু শতাব্দীর অজ্ঞতা ও অধীনতার বন্ধন ছিন্ন করণপ্রয়াসে মহিলারা যতই নূতন নূতন অধিকার প্রার্থনা করিতেছেন, পুরুষের কঠোর শাসন ততই কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। এখন অনেক পুরুষ একেবারে এ কথাও বলিতেছেন যে, রমণীর শিক্ষা কেবল অনাবশ্যক বিলাসিতা! সংসারের খরচের

হিসাব রাখিতে ও আবশ্যক মত পতি বা পুত্রকে একখানা পত্র লিখিতে পারিলেই রমণীর পক্ষে যথেষ্ট। রমণীদিগের মধ্যে তাহার অধিক বিস্তার হইলে, কেবল "মেয়ে জেঠার" দল পরিপুষ্ট হইবে। ইহা যে নিতান্ত ভ্রান্তমত, এ কথা যে কেবল আপনার প্রবল প্রতাপহানির ভীতি হইতে উৎপন্ন, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এই কথা হইতেই প্রমাণ হইতেছে যে রমণীর অধিকার-প্রশ্নের আন্দোলনে, পুরুষ আপনার প্রাচীন অধিকারগুলিকে প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়াইয়া ধরিতেছে—তাহারা ন্যায়ান্যায় বিচার করিতেছেনা। ইহা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত বলিতে পারি না।

দুঃখের কথা হইলেও এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, রমণীসমাজে পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দাপ্রিয়তা ও হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা যে পরিমাণে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে তাহাতে আশঙ্কিত হইবার কারণ আছে। কিন্তু আমাদিগের বোধ হয় যে, ইহার জন্যও পুরুষ অনেকাংশে দায়ী। রমণীদিগের শিক্ষা সঙ্কীর্ণ, কর্ম্মক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ—কাজেই কোন উদারচিন্তা, কোন মহদ্ভাব তাঁহাদিগের মনে স্থান প্রাপ্ত হয় না।

রমণীদিগের নানা সদ্গুণের কথা অস্বীকার করা সম্ভব নহে। কবিদিগের মানসকল্পিত সর্ব্বসৌন্দর্য্য ও সদ্গুণের আধার রমণীর কথা বলিতেছি না; এই সংসারসংঘাতপীড়িতা রমণীর কথাই বলিতেছি। রমণীর পরদুঃখকাতরতা ও রমণীর সহ্যগুণ, রমণীর অসহায়ের প্রতি দয়া ও রমণীর সহিষ্ণুতা পুরুষে সচরাচর দৃষ্ট হয় না। যে মাতৃত্বে রমণীর বিশেষ অধিকার, যে মাতৃত্বে রমণীজীবনের পূর্ণ বিকাশ সে মাতৃত্বের স্নেহাদিও প্রধানতঃ এই অসহায়ের প্রতি দয়া হইতে উৎপন্ন।

রমণী ও পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র স্বতন্ত্র, উভয়ের মনোবৃত্তিও উভয়ের কার্য্যানুরূপ। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে পুরুষ ও রমণীর মধ্যে পরস্পরের কার্য্যে পরস্পরের সাহায্যপ্রাপ্তির আশা ও ইচ্ছা উভয়েরই হৃদয়ে নিহিত থাকে। সে সাহায্যপ্রাপ্তির জন্য তদনুরূপ শিক্ষার আবশ্যক; হয় রমণীকে কিছু উঠিতে হইবে, নহে ত পুরুষকে কিছু নামিতে হইবে। আবার বহুকষ্টে আরোহিত কোন অবস্থা হইতে নামিয়া আসা, ব্যক্তি বা জাতি কাহারও পক্ষে মঙ্গলকর নহে। কাজেই পুরুষের বর্ত্তমান অবস্থা হইতে অবনত হওয়া সুবিধা-

জনক না হইলে রমণীকেই বর্ত্তমান অবস্থা হইতে কিছু উচ্চে উন্নীত হইতে হইবে।

এই উন্নতির জন্য অবশ্যই কিছু নূতন অধিকার আবশ্যক হইয়া পড়িবে। সে অধিকার আজকালকার শালীনত্ববিবর্জ্জিতা "নবনারীর" অর্থাৎ "নিউ ওম্যানের" আকাঙ্ক্ষিত অধিকারের মত বিস্তৃত ও অসঙ্গত না হইলেও নূতন অধিকার বটে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক। সমাজের মঙ্গলকামনায় রমণীদিগকে এই সকল অধিকার প্রদান করা কর্ত্তব্য।

আমাদিগের সমাজে এখন নানারূপ পরিবর্ত্তন প্রচলিত হইতেছে। প্রাচীন সভ্যতা হইতে আমরা এখন নূতন সভ্যতার ঘূর্ণাবর্ত্তে আসিয়া পড়িতেছি। আমাদিগের মধ্যে জীবনসংগ্রামের কঠোরতা দিন দিন প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। এ অবস্থায় স্ত্রীপুরুষের মধ্যে পরস্পরের সাহায্যদান ও গ্রহণ আরও অধিক পরিমাণে আবশ্যক হইয়া উঠিবে। যাহাতে আমাদিগের সমাজে ইউরোপীয় "নবনারী" সম্প্রদায়ের মত কোন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রমণীদিগের নূতন প্রকারের শিক্ষালাভের ও প্রয়োজনীয় নূতন অধিকারলাভের পথ সুগম করিয়া দেওয়াই এখন আমাদিগের কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

হেমের অনধিকার।

আগ্রা কলেজের প্রফেসর সত্যেন্দ্রের দিন বড় সুখে কাটিতে লাগিল। মানবদুর্ল্লভ স্বাস্থ্য, দেবদুর্ল্লভ সৌন্দর্য্য, লোকবাঞ্ছিত যশঃ, প্রয়োজনাধিক অর্থ, মনোমোহিনী প্রণয়শালিনী প্রিয়বাদিনী পত্নী, সাক্ষাৎ কুমারসদৃশ আনন্দপ্রতিম সুকুমার শিশুপুত্র, সর্ব্বোপরি অন্তরে অনাবিল আনন্দ,—সত্যেন্দ্রের দিন বড় সুখে কাটিতেছিল। সহসা কোথা হইতে করাল কালের কুলিশকঠিন কর সে-সুখের ঘর ভাঙ্গিয়া দিল! মত্ত মাতঙ্গ যেমন প্রফুল্ল পদ্মিনীপরিশোভিত সরোবরের কমলদলে 'পশিয়া' সে নয়নাভিরাম কান্তি বিদলিত, বিচ্ছিন্ন, বিকৃত করিয়া তুলে, তেমনই সেই নির্ব্বোধ, নির্দ্দয়, নিষাদহৃদয় কঠোর কৃতান্ত সত্যে-

ন্দ্রের সাধের নিধুবন বিধ্বস্ত করিয়া দিল! তাঁহার গৃহের কর্ত্রী, হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী, সংসারতীর্থের একমাত্র সহযাত্রী সহধর্ম্মিণী সরোজিনীকে সহসা জীবনপথের প্রথম প্রান্তর হইতে হরিয়া লইল! শরতের জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথে পূর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইল! সত্যেন্দ্রের জীবনাকাশ অন্ধকার হইয়া গেল!

কিছু ভাল লাগে না, সত্যেন্দ্রের আর আহারে রুচি নাই, বিলাসে বাসনা নাই, জীবনে স্পৃহা নাই, হৃদয়ে সে স্ফূর্ত্তি, অন্তরে শান্তি, দেহে বল, কার্য্যে সে উদ্যম আর নাই। জীবনবসন্তে আর সে কুসুম হাসে না, মলয়ানিল বহে না, পাপিয়া ডাকে না, জ্যোৎস্না আর ফুটে না!

কিছু ভাল লাগে না। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, গল্প আলাপনা, সমাজ কি রাজ্যালোচনা, কিছু ভাল লাগে না! শুধু সরোজিনীর স্মৃতিমন্দিরের উদ্ঘাটিত দ্বারে, একাহারী গৈরিকবসনধারী, ব্রহ্মচারী সত্যেন্দ্র তদ্গতচিত্তে সেই প্রেম-প্রতিমার ধ্যানধারণায় দিন অতিবাহিত করিতেন। আর কিছুতে সত্যেন্দ্রের মন লাগে না, শুধু তাঁহারই প্রেম, তাঁহারই প্রসঙ্গ, তাঁহারই কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, কবে কোন এক দিন কি এক সামান্য কারণে সরোজিনীর মনে ব্যথা দিয়াছিলেন, কবে কোন এক দিন কি অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই বলিয়া সরোজিনী ছল ছল নয়নে 'আর কিছু চাহিব না' বলিয়া অভিমান করিয়াছিলেন, সে কথা মনে পড়ে। কবে কোন পূর্ণিমা রজনীতে, কলনাদিনী কালিন্দীর কূলে কৃষ্ণরাধিকার প্রেমপ্রসঙ্গ লইয়া কলহ বাধিয়াছিল। পুরুষ কি রমণী, কে বেশী ভালবাসিতে পারে, এই তুমূল তর্কে, পুরুষই কঠিন, আর রমণী চির-প্রেমশালিনী প্রতিপন্ন করিয়া সরোজিনী গর্ব্ববিস্ফারিত লোচনে হাসিমুখে, স্বামীর মুখপানে চাহিয়াছিলেন, সে কথা মনে পড়ে। সেই আঁখি, সেই মুখ, সেই প্রেম সকলই মনে পড়ে। আর সেই দিন "আমি মরিলে তুমি কি কর" বলিয়া সরোজিনী যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সে কথাও মনে পড়ে।

নিষ্ঠুর! তাহাই দেখিবার জন্য কি সত্যেন্দ্রকে ছাড়িয়া অনন্তে লুকাইয়া আছ? কি দেখিবে তুমি সরোজিনি, সপ্ত সমুদ্র শুকাইবে, তপ্ত রবিকর সুশীতল হইবে, স্নিগ্ধ সুধাকর অগ্নি বর্ষিবে, তবু সত্যেন্দ্রের প্রতিজ্ঞা টলিবে না! সরোজিনি, সরোজিনি, সত্যেন্দ্রের সরোজিনি, তোমার সত্যেন্দ্র বিশ্বাসহন্তা নহে। এ জীবনে, এ হৃদয়ে সরোজিনী ভিন্ন আর কেহ স্থান পাইবে না। তবে

রমণী কি পুরুষ কে নিদয় সরোজ? সরোজ কথা কহে না, সে বড় নিষ্ঠুর! দুই দিনে সে সকলি ভুলিয়াছে, সে ভালবাসা, সে প্রেম, সরোজিনী সকলই ভুলিয়াছে! রমণী নিদয়!

সত্যেন্দ্রের শোকসন্তপ্ত জীবনে এখন একমাত্র সান্ত্বনা প্রাণাধিক পুত্র হেমেন্দ্রনাথ। হেমেন্দ্রের কচি মুখে তিনি সরোজিনীরই ছায়া দেখিতে পান, তেমনই সেই কুঞ্চিতকেশ, করুণকমল আঁখি, তেমনই মধুর কোকিলকণ্ঠ! হেমেন্দ্রনাথই এখন সত্যেন্দ্রের একমাত্র অবলম্বন। একত্রে আহার, একত্রে ভ্রমণ, একত্রে শয়ন, সত্যেন্দ্র এখন সহজে মুহূর্ত্তের জন্য হেমেন্দ্রকে কাছছাড়া করিতে চান না। সেই মাতৃহারা শিশু সারারাত্রি তাঁহারই তপ্ত বুকে মাথা রাখিয়া ঘুমায়, ঘুমাইতে ঘুমাইতে "মা, মা", বলিয়া কাঁদিয়া উঠে। আবার ঘুমাইয়া পড়ে। শিশু যতক্ষণ জাগিয়া থাকে ততক্ষণ "বাবা, পাখী কেন ডাকে," "জল কেন পড়ে," "হাতীর কেন অত বড় শুঁড়," "ঘোড়া হাতীর চেয়ে ছোট কেন," "দাইয়ের ছেলেটা বড় দুষ্ট," "পাঁড়ে খালি বকে," "সাহেবের রং শাদা," এইরূপ অসম্বন্ধ অর্থহীন অজস্র প্রশ্ন করে, আর হাঁফাইয়া হাঁফাইয়া আধ আধ সুরে কত কথা কয়। তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্র গল্পভাণ্ড হইতে প্রত্যহই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পগুলি পিতাকে উপহার দেয়। সত্যেন্দ্র আবিষ্ট মনে, বিরক্তিশূন্যচিত্তে তাহার সকল কথার উত্তর দেন, সকল গল্প শুনেন। আর নিজেও তাহাকে ছোট ছোট মিষ্ট মিষ্ট গল্প বলেন। শিশু বেশ নিবিষ্টচিত্তে গল্প শুনিতে শুনিতে সহসা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া প্রশ্ন করিয়া উঠে "বাবা, মা কোথায়?" তখন তাহাকে শান্ত করা সত্যেন্দ্রের কঠিন হইয়া উঠে।

ক্রমে বালক হেমেন্দ্রের এমনই অভ্যাস হইয়া পড়িল যে, বাপের সহিত একাসনে বসিয়া না খাইলে তাহার আর খাওয়া হয়না, বাপের কোলে না শুইলে ঘুম হয়না, এমন কি অধিকক্ষণ তাঁহার কাছছাড়া হইয়া থাকিতেও হেমের কষ্ট হয়। সত্যেন্দ্র যতক্ষণ কলেজে থাকেন, ততক্ষণ সে "একবার ঘর একবার বাহির" করিয়া বেড়ায়। যে দাই তাহাকে অতি শৈশব হইতে মানুষ করিয়া আসিতেছে, সেও ধরিয়া রাখিতে পারেনা। সত্যেন্দ্রের যেই আসিবার সময় হয় অমনি হেমেন্দ্র পথ 'আগুলিয়া' দাঁড়াইয়া থাকে। পিতাকে দূরে আসিতে দেখিয়া, এক মুখ হাসিয়া, "বাবা এসেছে রে" বলিয়া ছুটিয়া গিয়া পিতার হাত

দুই খানি ধরে। তার পর হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে পিতার অনুপস্থিতির সময়টুকুর মধ্যে স্বীয় জীবনইতিহাসে যে কয়েকটা ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতে বলিতে এবং আরও কত "আবল তাবল" বকিতে বকিতে গৃহে ফেরে। দৈবে, যদি কোন দিন সত্যেন্দ্রের প্রত্যাগমনে কিছু বিলম্ব ঘটে, তবেই সর্ব্বনাশ! হেম তখন নানা বাহানা ধরে, নিতান্ত অশান্ত হইয়া উঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে মায়ের কথাটাও বুঝি মনে পড়ে, তখন বালক ধূলায় পড়িয়া, পা আছড়াইয়া, মা, মা, বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষের জলে কঠিন ধরাকে আর্দ্র করিয়া দেয়। তাহাকে কিছুতেই শান্ত করিতে না পারিয়া, শেষ বাবুকে ডাকিতে লোক ছুটে। সত্যেন্দ্র গৃহে ফিরিয়া যখন ধূলিলুণ্ঠিত রোরুদ্যমান শিশুকে বুকে তুলিয়া লন, তখনও সে তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়া দু'টি হাতে গলাটি জড়াইয়া ফুফাইয়া ফুফাইয়া কাঁদে। সত্যেন্দ্র কত মিষ্ট কথায় শিশুকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করেন। শিশু যখন শান্ত হয়, তখন "বাবা তুমি দেরী কল্লে কেন?" "আমার বড় মন কেমন কচ্ছিল।" ইত্যাদি কত রকমের অনুযোগ ও আবদার করে। সত্যেন্দ্রও তাহার পর আর সাধ্যপক্ষে গৃহে ফিরিতে বিলম্ব করেন না।

এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল, এক মাস, দুই মাস, তিন মাস অতীত হইয়া গেল, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন সকলে সত্যেন্দ্রকে পুনরায় দারপরিগ্রহের জন্য কত অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সত্যেন্দ্রের শোকসাগরের প্রবল তরঙ্গে সে সকল তৃণের মত ভাসিয়া গেল! প্রথম প্রথম আত্মীয় বন্ধু বিবাহের জন্য আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিলে সত্যেন্দ্রের অধরপ্রান্তে, কাল মেঘের কোলে ক্ষীণ বিদ্যুতের মত বিষাদমাখা একটু হাসির রেখা দিত, সে হাসি যে দেখিত সে আর সহজে এরূপ অনুরোধ করিতে সাহসী হইত না। ক্রমে সে দিন গেল, তখন কেহ বিবাহের কথা পাড়িলে সত্যেন্দ্র ঘোর তর্কযুদ্ধ বাধাইয়া দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ যে কোন প্রকারেই উচিত নহে, তাহার যুক্তির ও প্রমাণের অব্যর্থ শাণিত অস্ত্রপ্রয়োগে প্রতিপক্ষকে জর জর করিয়া দিতেন; এবং মনে মনে ভারি একটা আত্মশ্লাঘা অনুভব করিতেন।

আরও কিছু দিন অতিবাহিত হইল, এখন কেহ বিবাহের কথা তুলিলে সত্যেন্দ্র আর তেমন তর্ক করেন না, কেবল হিন্দুবিধবার কথা তুলিয়া—

পুরুষ দু'দিন পরে
আবার বিবাহ করে,
অবলা রমণী ব'লে এতই কি সয় রে",—

আক্ষেপ করেন। আর বলেন—

"হায় রে আমার যদি থাকিত সম্পদ্"

এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল। বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন case hopeless বুঝিয়া বিবাহের জন্য সত্যেন্দ্রকে আর অনুরোধ করেন না। এখন কেবল কন্যাদায়গ্রস্ত পিতৃকুল মাঝে মাঝে সত্যেন্দ্রের শান্তি ভঙ্গ করেন।

তবু সত্যেন্দ্র শূন্যমনে শূন্য গৃহে দিন কাটিতে লাগিলেন। সংসারধর্ম্মে তাঁহার আর স্পৃহা নাই, তবে এখন কি একটা অভাবে মনটা কেমন খাঁ খাঁ করে। আধখানা প্রাণ আর আধখানার জন্য মাঝে মাঝে বড় ব্যাকুল হইয়া পড়ে।

ছেলেটীর জন্যই সত্যেন্দ্রের যত চিন্তা। তাঁহার হৃদয় বুঝিয়া প্রাণপণে কে এই প্রাণাধিক শিশুসন্তানের যত্ন করিবে? কাহার প্রতি ভার দিয়া, তিনি শিশুর এ দৃঢ় মায়াপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিবেন?

দিন যায় কিন্তু পত্নীশোক ভুলা যায় না। দিনে দিনে সত্যেন্দ্রের শোকসিন্ধু উদ্বেলিত হইতে লাগিল, শেষ আর বাধা বিপত্তি না মানিয়া দুকূল ভাসাইয়া গেল। এতদিন সত্যেন্দ্র আপনার রুদ্ধ হৃদয়ের শোক চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু আর পারিলেন না। পদ্য এবং গদ্য কাব্যাকারে সে শোকোচ্ছ্বাস সবেগে সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। এতদিনে মৃত পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্যের গুরু ভার সত্যেন্দ্রের স্কন্ধ হইতে কতকটা নামিয়া গেল। যে শোক-প্রবাহ এতদিন সত্যেন্দ্রের দীর্ণ হৃদয়ের জীর্ণ দ্বারে নির্ম্মম ভাবে আঘাত করিতেছিল, আজ যেন তাহা কাব্যাকারে রুদ্ধদ্বারের গোপন ছিদ্রপথে সবেগে বাহির হইয়া গেল!

পত্নীশোকবিধুর কাব্যকারের প্রতি বিধাতার বুঝি অভিসম্পাত আছে! সুতরাং বিপত্নীকসুলভ বিড়ম্বনা সত্যেন্দ্রের অদৃষ্টেও ঘটিল! বৃদ্ধা জননীর নিতান্ত অনুরোধে এবং ছেলেটির দুঃখনিবারণ ও সঙ্গে সঙ্গে সে বন্ধনরজ্জু হইতে কতকটা মুক্ত হইতেও বটে, সত্যেন্দ্র, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে, বাধ্য হইয়া এক ত্রয়োদশবর্ষীয়া সুন্দরী কিশোরীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিলেন। হেম-

বন্ধন শিথিল করিতে সত্যেন্দ্র বুঝি প্রেমবন্ধনে বদ্ধ হইলেন! নবপরিণীতা পত্নীর হাসিটি, চাহনিটি, এমন কি কণ্ঠস্বরটিও যেন প্রথমারই মত! and such was she; এই সেই!

* * * *

ছেলেটা বড় বোকা! সে আজও তার মাকে চিনিল না! হেমের পিতা মাতা যখন রাত্রিতে আলাপে নিমগ্ন থাকেন, তখন সে মাঝ হইতে, "বাবা এ কে? মা কোথায়?" বলিয়া রসভঙ্গ করিয়া দেয়! সত্যেন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া বাঁচেন না! আবার হেম ঘুমাইতে দেয় না; বড় বকে, বড় জ্বালায়! রাত্রিতে সময়ে ঘুমাইতে না পাইয়া সত্যেন্দ্রের শরীরটার ভাবান্তর হইতে লাগিল। শেষ বাধ্য হইয়া, হেমেন্দ্রের শয়নের ব্যবস্থা দাইয়ের নিকট করিতে হইল। কিন্তু অবুঝ ছেলে, সেখানে ঘুমায় না। বাবার কাছে শোব বলিয়া বাহানা করে, কাঁদে, কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়ে, ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কাঁদিয়া উঠে।

আহারের সময়ও হেম সত্যেন্দ্রকে ভাল করিয়া খাইতে দেয় না, তারি বিরক্ত করে। রোজ রোজ এমন করিয়া "আধ পেটা" খাইলে বাবুর শরীর টিকিবে কেন? তাই হেমের মায়ের নিজের তত্ত্বাবধানে খোকার আহারের বন্দোবস্ত হইল! সত্যেন্দ্র প্রথমে এ ব্যবস্থায় তেমন সম্মতি দেন নাই, কিন্তু যখন হেমের মা স্বয়ং তাহাকে খাওয়াইবার ভার লইতেছেন, তখন এ আপত্তি শুধু "তাঁহার" অপমান করা মাত্র। সুতরাং ইহাতে প্রথমে মত দেন নাই বলিয়া সত্যেন্দ্র বরং মহা অপ্রস্তুতই হইয়াছিলেন!

বৎসরের ভিতরেই হেমেন্দ্রের একটি ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করিল। পিতার ক্রোড়ে হেমেন্দ্রের আর বড় অধিকার রহিল না!

এ দিকে দিনে দিনে হেমেন্দ্রের প্রফুল্লমুখ-কমল মলিন হইতে লাগিল, সে নির্ম্মল হৃদয়ে কালিমা পড়িল, কুসুমকোরকে কীট প্রবেশ করিল! স্থির হইল ছেলেটা নিশ্চয়ই হিংসায় শুকাইয়া উঠিতেছে!

এ রোগের আর ঔষধ কি বল?

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সাহিত্য।

(পৌষ।)

বৎসর ফুরাইয়া গিয়াছে, কিন্তু 'সাহিত্যের' বৎসর এখনও ফুরায় নাই। যে দেশে এরূপ একখানি উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্রেরও এই দশা, সে দেশের ধন-কুবেরগণ কিন্তু প্রস্তরমূর্ত্তিসংস্থাপন করিবার সময় মুক্তহস্ত! সাহিত্যের প্রবন্ধ-গুলি সুন্দর, সুরচিত, যথাবিন্যস্ত ও চিত্তাকর্ষক। হইলে কি হইবে? বাঙ্গালী কি সাহিত্যপ্রিয়? সাহিত্যের 'কবিতাকুঞ্জে' ভ্রমরগুঞ্জনের বিরাম নাই, যেন চিরবসন্ত বিরাজমান; আমরা যদৃচ্ছাক্রমে তাহার দুই একটি তান পাঠকবর্গের নিকট উপনীত করিলাম;—

তুমি স্নিগ্ধ যেমন শব্দবিহীন
স্তব্ধ বরষা-রাতি;
তুমি উজ্জ্বল যেন কুসুমবহুল
পুষ্পসময়ভাতি;
তুমি কোমল যেমন শারদ আকাশে
জ্যোৎস্নামধুর নিশি;
তুমি মধুর যেমন অরুণ-উদয়ে
পুলক-আকুল দিশি;
তুমি সুখদ যেমন বেদনাতপ্তে
অশ্রু-বেদনহারী;
তুমি উদার যেমন গগনবিলীন
সুনীল সাগরবারি;
তুমি অসীম যেমন নিঃস্ব হৃদয়ে
ব্যাকুল বাসনারাশি;
তুমি পূত যেমন শিশুর অধরে
সরস মধুর হাসি;
তুমি হাস্যে যেমন নববিকশিত
কুসুম লোচনলোভা;
তুমি ক্রন্দনে যেন শিশিরসিক্ত
বিকচ-কুসুম-শোভা;
তুমি প্রণয়ে যেমন সুনীল আকাশে
রজত জ্যোৎস্নাধারা
তুমি বিরাগে যেমন প্রভাতগগনে
ম্লান-আলোক তারা;
তুমি হৃদয়-সরসে ফুটিয়া উঠেছ
প্রভাতনলিনী সম;
তুমি চন্দ্র যেমন করেছ উজল
আঁধার হৃদয় মম।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ পদ্যে গদ্যে, গল্পে উপন্যাসে, রাজনৈতিক প্রবন্ধে বিবিধ বিধানে মাতৃভাষার সেবা করিতেছেন—এরূপ রচনাবৈচিত্র্য অন্য অনেক লেখকেরই নাই। শ্রীযুক্ত জলধর সেন হিমালয়ের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড লইয়া এক একখানি গদ্যকাব্য রচনা করিতে সক্ষম; রচনামাধুর্য্যে পাঠক মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া তাঁহার সেই এক কথা কত বারই কত রকমে শুনিতেছেন। এবার 'গঙ্গোত্রীর পথে' নামক প্রবন্ধে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে! শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিশ্বাসের

'মশক'শীর্ষক প্রবন্ধটি সময়োপযোগী ও শিক্ষাপ্রদ; ইহার সঙ্গে মশকের প্রত্যেক অবস্থার ছবি থাকিলে আরও ভাল হইত। শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর 'মহারাষ্ট্র ইতিহাসের উপকরণ' গুলির পরিচয় প্রদান করিয়া ইতিহাসানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। দেউস্কর মহাশয় মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত, অথচ বাঙ্গালা ভাষায় অধিকার আছে। তাঁহার চেষ্টায় মহারাষ্ট্রীয় ঐতিহাসিক সাহিত্য বাঙ্গালীর আয়ত্ত হইলে এ দেশের উপকার হইবে।

ভারতী।

(চৈত্র।)

'ভারতীর' একবিংশতি বৎসর পূর্ণ হইয়াছে; বৈশাখ হইতে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে যাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে অতঃপর ভারতীসম্পাদিকাদ্বয় ভারতীর সংশ্রব ত্যাগ করিবেন, তাঁহাদের জন্য শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী 'এ নহে বিদায়' শীর্ষক কবিতায় মর্ম্মস্পর্শ করিয়া লিখিয়াছেন;—

নিন্দা অপমান ঘৃণা দুঃখ ব্যথা যত,
সকলি লইয়াছিনু আপনার শিরে;
তোমারে রাখিয়াছিনু সযতনে অতি,
সুকোমল স্নেহঘেরা হৃদয়ের নীড়ে।
পল্লব শয়ান মাঝে ক্ষুদ্র পুষ্প কলি
যেমন নিভৃতে থাকে মুকুলসময়;
সহসা রবির আলো পড়ে যবে গায়
ফুটে উঠে অপরূপ রূপ মধুময়।
তেমনি আজিকে তুমি উঠেছ ফুটিয়া
আজ তুমি নহ আর নিতান্ত আমার;
এত রূপ, এত শোভা, এত মধুরিমা;
সমস্ত বিশ্বের তরে প্রীতি উপহার।
দাঁড়াও বিশ্বের মাঝে; চৌদিকে তোমার
উঠুক বন্দনা গান, মঙ্গল আরতি—
কুসুম অঞ্জলি দিয়া রচি' চারি পাশে
সুবাসের আবরণ মধুময় অতি।
আমিও রহিব কাছে, অলক্ষ্যে থাকিয়া
করিব তোমার সেবা; শ্রান্ত হ'লে পরে
রবি দিব শয্যা খানি; করিব বাজন,
অঞ্চল লুটায় যদি তুলি, দিব করে।

শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী বড় অসময়ে ভারতীকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন, তখন তাহার বাঁচিবার আশা তিরোহিত হইতে বসিয়াছিল। তাহার পর স্নেহে, যত্নে, সেবা শুশ্রূষায় ভারতী বাঁচিয়া এত বড় হইয়া আজ যে সুদক্ষ সম্পাদকের হস্তে সমর্পিত হইতে পারিল, ইহা কম আহ্লাদের কথা নহে। অতঃপর ভারতী যদি অপরূপরূপমহিমায় ফুটিয়া উঠিতে পারে তাহাতেও ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকাগণের স্নেহ যত্নের পরিচয় বিলুপ্ত হইবে না!

এবারকার ভারতীর প্রবন্ধগুলি বেশ সুখপাঠ্য হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'তৃপ্তি' শীর্ষক কবিতা ভাবে, ভাষায় হৃদয়াবেগে পাঠকের মর্ম্মস্পর্শ করিতে সক্ষম হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের 'প্রত্যাবর্ত্তন' ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের 'মীর কাসিম' এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। শ্রীমতী সরলা দেবী 'অস্মদ্ গৃহে বসন্তোৎসব উপলক্ষে রচিত' বলিয়া একটি গান ও তাহার স্বরলিপি দিয়াছেন। গানটি বড়ই সুন্দর—

হে সুন্দর বসন্ত বারেক ফিরাও
আজি মধুর অতীত কাল!
অতীত উৎসব, আন এ ভারতে
আন হে, আন হে
মধুমাসে আজি মধুর ইন্দ্রজাল!

কোকিল-কূজন-মুখরিত উপবন
মাঝে, আন হে,
মঞ্জুল চরণবিতাড়ন, মঞ্জু অশোক লাল!
চম্পক পেলব, চুত মুকুল নব
আন হে, আন হে,
পূর্ণদোহদ বকুল পুষ্পজাল!

রুণু রুণু ঝন ঝন বলয়শিঞ্জন
সাথে, আন হে,
চকিতলোচন, মোহনবাহুমৃণাল!
দোলারোহণ কলভাষণ সহ,
আন হে, আন হে
বারিসিঞ্চন লোল আলবাল!

যূথিসুবাসিত উত্তরী পীত
সাথে, আন হে
বীণাবাদিত ললিত গীত তাল!!
প্রিয় আলেখন, পুষ্প বিরচন
আন হে, আন হে,
কাল পুরাতন নিখিল মোহজাল!

রত্নাবলী নাটিকায় বসন্তোৎসবের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা সংস্কৃত-সাহিত্যে সবিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে; বঙ্গসাহিত্যে ইহার অভাব ছিল—তাহা এতদিনে বিদূরিত হইল কি? রত্নাবলীর 'মদনমহোৎসব-বর্ণনায়' দেখিতে পাই——

'স্রস্তঃ স্রগ্দামশোভাং ত্যজতি বিরচিতামাকুলঃ কেশপাশঃ
ক্ষীবায়া নূপুরৌ চ দ্বিগুণতরমিমৌ ক্রন্দতঃ পাদলগ্নৌ।
ব্যস্তঃ কম্পানুবন্ধাদনবরতমুরো হন্তি হারোঽয়মস্যাঃ
ক্রীড়ন্ত্যাঃ পীড়য়েব স্তনভরবিনমন্মধ্যভঙ্গানপেক্ষম্॥'

অপিচ

'উদ্যদ্বিদ্রুমকান্তিভিঃ কিশলয়ৈস্তাম্রাং ত্বিষং বিভ্রতো
ভৃঙ্গালীবিরুতৈঃ কলৈরবিশদব্যাহার লীলাভৃতঃ।

ঘূর্ণন্তো মলয়ানিলাহতিচলৈঃ শাখাসমূহৈ র্মুহুঃ
ভ্রান্তিং প্রাপ্য মধুপ্রসঙ্গমধুনা মত্তা ইবামী দ্রুমাঃ ॥'

অপিচ

'মূলে গণ্ডূষসেকাসব ইব বকুলৈর্বাম্যতে পুষ্পবৃষ্ট্যা
মধ্বাতাম্রে তরুণ্যা মুখশশিনি চিরাচ্চম্পকান্যদ্য ভান্তি।
আকর্ণ্যাশোকপাদাহতিষু চ রমতাং নির্ভরং নূপুরাণাং
ঝঙ্কারস্যানুগীতৈরনুকরণমিবারভ্যতে ভৃঙ্গসার্থৈঃ ॥'

বাঙ্গলা ভাষায় রচিত 'বসন্তোৎসবের' এই গানটিতে ভারতের কোন্ সময়ের পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া তুলিবে তাহা কিন্তু ঠিক ধরিতে পারি নাই। অতি প্রাচীন কালের বসন্তোৎসবের নাম 'মদন মহোৎসব'—সে দিন আর্য্যনারী পতিপদ-পূজা করিতেন। তৎপরবর্ত্তী যুগের বসন্তোৎসবের নাম 'হোলী'; তাহাই অদ্যাপি চলিতেছে! মদনমহোৎসবের দেবতা পুরুষ; নারী তাঁহারই পদতল-গতা গললগ্নীকৃতবাসা সাচ্ছাদিতা সালঙ্কৃতা পতিগতজীবিতা সংসারললামভূতা জীবনলতা। হোলীর বসন্তোৎসবে নারীই দেবতা, অথবা প্রখরা মুখরা পরিহাসচতুরা রসাভাসবহুলা স্বাধীনা নায়িকা, পুরুষ কেবল নিকুঞ্জদ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আবির কুঙ্কুমবিনিময়ের এবং রাধারাণীর অনুমতি পাইলে সভয়ে সসঙ্কোচে দোলারোহণের অধিকারপ্রাপ্ত! মদনমহোৎসবের দাম্পত্যপ্রেমপ্রভা নির্ম্মল জ্যোৎস্নালোকের মত শুভ্র সুন্দর, সর্ব্বজনারাধ্য; হোলীর উৎসব কেবল এক জনের পক্ষেই লীলা, অন্যের পক্ষে মহাপাপ! 'বসন্তোৎসবের' এই গাথায় ইহার কোন্ আদর্শটি ফুটিয়া উঠিয়াছে? আমরা নব্যসাহিত্যে মধুর অতীত কাল ফিরাইয়া আনিবার জন্য যখনই কবিতা বা উপন্যাসের সূচনা করি তখন কোন্ সময়ের অতীত কাল ফিরাইয়া আনিতে চাহি, তাহা বুঝাইতে না পারিয়া বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া থাকি। অতীত কাল মধুর হইতেও মধুর, কিন্তু ভাগ্যদোষে আমাদের দেশের সমগ্র অতীত সমান মধুর নহে; কোন অংশে অমৃত, কোন অংশে গরল, কোন অংশে বা অমৃতের সঙ্গে গরলের সংমিশ্রণ। সেকাল যদি ফিরিয়া আসে, যাহা যেমন ছিল ঠিক তেমনই ফিরিয়া আসে, আমাদের নব্যরুচি তাহার সকল চিত্রকেই সমানভাবে সমাদর প্রদর্শন করিতে পারিবে কি?

প্রদীপ।

(চৈত্র।)

বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে আশার আলোক জ্বালিবার জন্য 'প্রদীপের' অভ্যুদয় হইয়াছে; সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় তাহার উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য ব্যয়বাহুল্য করিতেছেন। এবার নয়টি প্রবন্ধ পত্রস্থ হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র কুমার রায় মহাশয়ের "সঙ্গিনী" নামক কিঞ্চিদূন দ্বাদশ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত গল্প। গল্পাংশ যৎসামান্য,—বি, এ, উপাধিধারী কৃষিকর্ম্মনিরত নবীন যুবক নরেন্দ্রনাথের চারুবালা নাম্নী স্নেহময়ী দুহিতার একটি আদরের অন্ধ বিড়াল; তাহারই নাম "সঙ্গিনী"। সে চারুর বিবাহান্তে শ্বশুরালয় গমন করিবার সময়ে অন্ধকারে পড়িয়া মিউ মিউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল, এদিকে চারুর "শ্বশুরগৃহের উচ্ছ্বসিত হর্ষকোলাহলমিশ্রমঙ্গলা (?) বাদ্যনিনাদ ও মিলনানন্দের উচ্চ হুলুধ্বনি তাহার বিজন কুমারীজীবনকুঞ্জের অজ্ঞাতনেপথ্যবর্ত্তিনী সেই অবজ্ঞাত অন্ধ সঙ্গিনীর নিরানন্দময় ক্ষুব্ধ আর্ত্তনাদটিকে কোন মতে তাহার হৃদয় হইতে বিলুপ্ত করিতে সক্ষম হইল না।" এই ক্ষুদ্র গল্পাংশ লইয়া প্রবন্ধলেখক কত সুখ দুঃখের কথাপ্রসঙ্গে সমালোচকদিগকেও ইঙ্গিতে দুই চারি কথায় সদুপদেশ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ কেহ মাসিকপত্রে বাক্যবহুল অন্তঃসারশূন্য উপকথার ছড়াছড়ি দেখিতে চান না। কিন্তু বাতাস বুঝিয়া পাইল তুলিয়া দেওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য; আসর জমাইতে হইলে উপকথার হাত খাট করিলে চলিবে না, সুতরাং ইহার জন্য নবীন সহযোগীকে তিরস্কার করা যায় না। 'প্রদীপে' এইরূপ বাক্যবহুল উপকথার আড়ম্বর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া সম্পাদক মহাশয়কে কাণে কাণে বলিতে চাই,—বাঙ্গলা ভাষার উপর কোন রূপ উৎপীড়ন অত্যাচার না হইলে ইহাতে বিশেষ ক্ষতি ছিল না। "সঙ্গিনী" ক্ষুদ্র গল্প, কিন্তু ইহাতে অনেকগুলি বৃহৎ কথা সন্নিবেশ করিতে গিয়া লেখক মহাশয় "অনার্য্যুচিত", "আভ্যুতিক", "কুহুকিনী" প্রভৃতি কতকগুলি শব্দবিন্যাস করিয়া বসিয়াছেন, এগুলি অবশ্যই সুশিক্ষিত সম্পাদক মহাশয় সংশোধন করিয়া দিতে পারিতেন। "তীক্ষ্ণ পরিহাস কণ্টকের ন্যায় ফুটিয়া উঠিত", বলিলে কি বুঝিব? ফুলই ফুটিয়া উঠে, কণ্টক কেবলই ফুটে,

কদাচ ফুটিয়া উঠে না; বাঙ্গলা ভাষায় ফুটা ও ফুটিয়া উঠার মধ্যে কি ভাবপার্থক্য বিলুপ্ত হইয়াছে? "অন্তরবাসিনী মহিয়সী নারীভাব"—শুনিতে নিতান্ত মন্দ হয় নাই, কিন্তু ইহা কি নূতন ধরণের ব্যাকরণ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা, না প্রচলিত ব্যাকরণে অনভিজ্ঞতার প্রমাণ? সার্ব্বভৌম মহাশয় প্রাচীন পণ্ডিত, তাঁহার "নাসারন্ধ্রে এক মুঠো নস্য প্রবেশ করাইয়া" দিলে রসিকতা মন্দ হয় না, কিন্তু তাহা কি আধুনিক নাতিদিগের পক্ষে নিরতিশয় ধৃষ্টতা ও অকালপক্কতার পরিচায়ক নহে? সার্ব্বভৌম মহাশয়ের বিপুল নাসারন্ধ্রও বুঝি এক সঙ্গে এতটা নস্য প্রবেশ করাইতে সম্মত নহে! এ সকল বিষয়ে সম্পাদক মহাশয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিপতিত হইলে "প্রদীপের" মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পত্রে এরূপ ভাষা ও ভাবপ্রয়োগবিভ্রাট সংঘটিত হইতে পারিত না; তাহাতে নবীন লেখকসম্প্রদায়েরও প্রভূত কল্যাণ হইত, তাঁহারা দশজনকে শিখাইতে বসিয়া নিজেরাও কিছু কিছু লিপিকৌশল শিক্ষা করিতে পারিতেন। সম্পাদক মহাশয়ের চেষ্টায় লেখক মহাশয়ের লেখনী যদি ক্রমে ক্রমে সংযত ও যথাবিন্যস্ত হয়, তাহাতে বঙ্গসাহিত্যের মঙ্গল হইবে, সেই ভরসায় কেবল দোষাংশেরই উল্লেখ করা হইল। দ্বিতীয় প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের ক্রমশঃপ্রকাশ্য "লাল পল্টন" নামক ঐতিহাসিক চিত্রের চতুর্থ পরিচ্ছেদ। পরিচ্ছেদটি নিতান্তই ক্ষুদ্রায়তন। মাসে মাসে এতটুকু করিয়া ঐতিহাসিক চিত্র প্রকাশিত হইলে রসবোধে ব্যাঘাত হয়। এক মাসে শুণ্ড, পর মাসে দন্ত, তৎপর মাসে পদচতুষ্টয় ও ক্রমশঃ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির ছবি ছাপিলে, লোকে তাহাকে সহসা হস্তীর প্রতিকৃতি বলিয়া না বুঝিতেও পারে। এরূপ প্রবন্ধের সমালোচনা চলে না। "কলিকাল" ক্রমশঃপ্রকাশ্য উপন্যাস, ইহার সম্বন্ধেও সেই কথা। ইহার ভাষা যেমন সরল তেমনি সুন্দর। উপন্যাসে বা গদ্যে এইরূপ ভাষাই প্রশস্ত। বৈষ্ণবচরিতাখ্যায়ক শ্রীযুক্ত অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায়ের "শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী ও তদীয় শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য্য" বোধ হয় এইবার শেষ হইল। ইহাতে যে সকল বৈষ্ণব কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার ভাবার্থ প্রদান না করায় অনেক স্থলে অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে অর্থ গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "হোলি কাহিনীর" গাথা কবিবর রবীন্দ্রনাথের ছাঁচে ঢালা, হইলেও বেশ সুখপাঠ্য হইয়াছে।

আসামের অসভ্য জাতি "মিষ্‌মীদিগের কথা লইয়া যে সচিত্র প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, তাহাতে অনুবাদসুলভ বহু দোষ থাকিলেও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে এবং পাঠে প্রচুর আমোদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের লিখিত 'রাজদ্রোহ আইন ও সমাজনীতি' এবারকার প্রদীপের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। ইহাতে পড়িবার ভাবিবার এবং ভাবিয়া আবার পড়িবার মত অনেক কথা দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সুন্দর হইয়াছে। আশু বাবু বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, কিন্তু শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, "ওকালতী বৃত্তি অবলম্বন করায় আজ কাল তিনি সাধারণতঃ সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চ্চার অবকাশ পান না।" এবং আরও দুঃখিত হইলাম যে, "বাঙ্গলা সাহিত্য পড়িতে তিনি প্রায়ই সময় পান না।" শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ক্রমশঃপ্রকাশ্য 'জ্যোতিষ' শীর্ষক প্রবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় মুদ্রিত করিয়া এবারকার প্রদীপ সমাপ্ত হইয়াছে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশদ ব্যাখ্যায় জ্যোতিষের গূঢ় রহস্য সাধারণের বোধগম্য হইবে বলিয়া ভরসা হইতেছে। এবার 'পৃথিবী গোল' এই কথা বুঝাইবার জন্য কতকগুলি প্রমাণ প্রয়োগ করা হইয়াছে। দেখিয়া সুখী হইলাম যে সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে। সুখী হইবার বিশেষ কারণ এই যে International Scientific Series গ্রন্থাবলীর কোন বিখ্যাত পুস্তকে লিখিত হইয়াছে যে, ভিনিসীয় নাবিকেরা ভূমধ্যসাগরে পোতারোহণ করিয়া ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতে করিতেই পৃথিবীর গোলত্বের সর্ব্বজনসুপরিচিত প্রমাণটির আবিষ্কার করেন। কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দেখাইয়া দিয়াছেন যে, ইহা এদেশের পূর্ব্বাচার্য্যদিগের অপরিজ্ঞাত ছিল না; যথা—

"সমুদ্রমধ্যাদ্‌তটতস্তটান্তং স্থূণাগ্রমাদৌ তটগেন দৃষ্টম্।
নরেণ পোতস্য ততস্তদর্দ্ধং সর্ব্বং ক্রমাদন্তিকবর্ত্তিনঃ স্যাৎ॥"

নব্যভারত।

(চৈত্র।)

'নব্যভারতের' পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ণ হইল। বহু বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিয়া 'নব্যভারত' যে এত দিন সাহিত্যসেবা করিতে সক্ষম হইয়াছেন, ইহা সবিশেষ

আহ্লাদের কথা। চৈত্রের সংখ্যায় "প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা" সমেত একাদশটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে অধিকাংশই ক্রমশঃপ্রকাশ্য প্রবন্ধ;—শেষ না হইলে সমালোচনা চলে না। শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের 'প্রতিভা' শীর্ষক সমালোচনাটি এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে—বঙ্গসাহিত্যে এরূপ প্রবন্ধ বিরল; ইহা চিন্তাশীলতার সহিত সৌন্দর্য্যবিকাশের পরিচয়ে পরিপূর্ণ। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে 'পঞ্চরত্নম্' নামক পাঁচটি সংস্কৃত কবিতা ও তাহার পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গলায় প্রবাদ আছে—"মূর্খস্য লাঠ্যৌষধম্"; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মূর্খের কি ঔষধ আছে? 'পঞ্চরত্নেও' তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা——

শক্যো বারয়িতুং জলেন হুতভুক্ ছত্রেণ সূর্য্যাতপঃ
নাগেন্দ্রো নিশিতাঙ্কুশেন চপলো দণ্ডেন গোগর্দ্দভৌ।
ব্যাধি র্বৈদ্যকবৈষজৈ রনুদিনং মন্ত্রপ্রভাবাদ্ বিষম্
সর্ব্বস্যৌষধমস্তি শাস্ত্রবিহিতং মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধম্॥

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয় সরল পদ্যে গীতার অনুবাদ করিতেছেন; অনুবাদকের কবিতারচনায় নিপুণতা আছে, কিন্তু বিষয় বড়ই দুর্ব্বোধ বলিয়া অনুবাদ সকল স্থলে সরল হইতেছে না, সুতরাং টীকা টিপ্পনীও প্রদত্ত হইতেছে। শ্রীযুক্ত শ্রীপতি রায় মহাশয় 'বিলাতে বড় দিন' নামক প্রবন্ধে ইংলণ্ডের প্রধান পর্ব্বকাহিনী বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় বর্ষশেষে অনেক প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশ করিতে না পারিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, কিন্তু 'নব্যভারতের' সম্পাদক অলস নহেন; তিনি বিগত বর্ষে ৬৪ খানি প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন। চৈত্র সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের 'ইংরাজের জয়' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থের সমালোচনা উপলক্ষে সম্পাদক মহাশয় আমাদের লেখক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের প্রণীত ঐতিহাসিক চিত্রেরও উল্লেখ করিয়াছেন। নিখিলনাথের 'মুর্শিদাবাদ কাহিনীর' ও অক্ষয়কুমারের 'সিরাজদ্দৌল্লার' প্রবন্ধগুলি মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইবার পর বিহারীলালের 'ইংরাজের জয়' প্রকাশিত হইয়াছে—সুতরাং তিনিই সমালোচ্য বিষয়গুলি পুস্তকাকারে

প্রথম প্রচার করিবার গৌরবলাভ করিয়াছেন। নব্যভারতের সমালোচনা পাঠ করিয়া মনে হইল, বুঝি সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় এই তিন খানি পুস্তক তুলনায় পাঠ করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। আশা করি আমরা সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়ের নিকট অন্য দুই খানি ঐতিহাসিক গ্রন্থের সমালোচনাও ক্রমশঃ দেখিতে পাইব। বঙ্গসাহিত্যে ইতিহাসের সমাদর বর্দ্ধিত হইলে সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জাতীয় চরিত্রও উন্নতিলাভ করিবে—আমরা এই কারণে ঐতিহাসিক গ্রন্থ মাত্রেরই বিস্তৃত সমালোচনা দেখিতে চাই।

পূর্ণিমা।
(চৈত্র।)

চৈত্রের 'পূর্ণিমায়' "পাপের পরিণাম" নামক ক্রমশঃপ্রকাশ্য গল্প ও "মৃত্যুর পর" নামক ক্রমশঃপ্রকাশ্য প্রবন্ধ সমাপ্ত হইয়াছে। এই দুইটি ভিন্ন এবারকার পূর্ণিমায় একটি কবিতা, সমালোচনা ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের লিখিত ৺সুরেন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের মৃত্যুকথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সমালোচনায় সরকার মহাশয় আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া পত্রসম্পাদনবিষয়ে যে সুমিষ্ট সদুপদেশ বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা সাদরে গ্রহণ করিলাম। মফস্বলের মাসিক পত্রের সুর, সূত্র বা প্রণালীবন্ধন করা অনায়াসসাধ্য নহে; যাঁহারা দুই চারি জন লেখক লইয়া পূর্ণিমার ন্যায় পত্রসম্পাদন করিতেছেন তাঁহারা এ বিষয়ে সমধিক সৌভাগ্যশালী; তাঁহারা পরামর্শ করিয়া যন্ত্র মিলাইয়া সুর বাঁধিতে পারিয়াছেন। আমরা স্বাধীন মতামত প্রচারের জন্য পত্রকলেবর উন্মুক্ত রাখি, আমরা গাঁথি না, বাঁধি না,—কেবল ডালি সাজাইয়া পাঁচ ফুলের সাজিটি পাঠকহস্তে সাদরে উপহার প্রদান করি। এ বিষয়ে সরকার মহাশয়ের মতে আমরা অব্যবসায়ী; কিন্তু সহযোগী 'প্রদীপ' ও 'নব্যভারত'ও যে আমাদের ন্যায় তিরস্কৃত, ইহাতেই আমরা দুঃখিত!

ছোট কথা।

কথা ফুরায় না। সুখ ফুরায়, দুঃখ ফুরায়, এমন যে সুখ দুঃখের প্রহেলিকাময় মানবজীবন তাহাও ফুরায়;—কিন্তু কথা ফুরায় না। এক যুগের কথা আর যুগে আসিয়া কবিতার ভিতর দিয়া, সঙ্গীতের ভিতর দিয়া, জনশ্রুতির আনুগত্য লাভ করিয়া পুরাতনকে পুরাতন হইতে দেয় না। এই যে একটি বৎসর

চলিয়া গেল, তাহার সুখ গেল, দুঃখ গেল, আশা গেল, প্রতীক্ষা গেল,—কিন্তু তাহার কথা ফুরাইল না। সে ভীষণ অন্নকষ্টের কথা, সে কঙ্কালসার ক্ষুধার্ত্তের মুষ্টিভিক্ষার্থ কাতর ক্রন্দন, সে মহামারী ভূমিকম্প ঝঞ্ঝাবাতের উৎপীড়নকাহিনী—ইহার কোন কথা ফুরাইল না।

কথায় সংসার ভরপুর হইয়া রহিয়াছে। এখানে আসিয়া নীরবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার উপায় নাই। কত কথা শুনিতে হয়, কত কথা শুনাইতে হয়, কে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারে? এক জন মানুষের জীবনে তাহাকে যত কথা শুনিতে হয়, যত কথা শুনাইতে হয়, তাহা গাঁথিয়া রাখিতে পারিলে পর্ব্বতাকার গ্রন্থ রচনা করা যাইতে পারিত!

এত কথার কোলাহলের মধ্যে কোন্ কথাটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ! কোন্ কথায় রাজা প্রজা পণ্ডিত মূর্খ সকলেই সমান পাগল! কোন্ কথার অপরিমিত ব্যবহারে সংসারে সুখ, কোন্ কথার অপর্য্যাপ্ত আলোচনায় সংসারে দুঃখ? অনেক কথা বলিয়াছ, অনেক কথা শুনিয়াছ, বলিতে পার কোন্ কথাটি সকল কথা সকল তর্ক সকল যুক্তি পদবিদলিত করিয়া সকলের উপর প্রাধান্য-বিস্তারে সক্ষম হইয়াছে।

সে একটি নিতান্ত ছোট কথা, ছোট হউক, কিন্তু তাহার তাড়নায় বৃহৎ হইতে বৃহত্তর মস্তিষ্কও বিচলিত হইয়া থাকে। তাহা সর্ব্বজনারাধ্য সর্ব্বজনবিজ্ঞাত অথচ সর্ব্বশাস্ত্রবর্ণিত সমস্ত অনর্থের মূল!

সে কথা আর কিছুই নহে;—**আমি!** খুব ছোট কথা, কিন্তু তাহার কত অসীম ক্ষমতা। আমি, আমার, আমাকে,—আমাদ্বারা, আমা হইতে, আমাতে—কর্ত্তা কর্ম্ম করণ অপাদান সম্বন্ধ অধিকরণ প্রভৃতি কারকভেদে বহুরূপত্ব লাভ করিয়া এই একটি মাত্র ছোট কথায় সমস্ত মানবজীবন পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

পৃথিবীর অধিকাংশ কথাই আত্মকথা। কেহ প্রকাশ্যে কেহ বা অলক্ষিতে এই আত্মকথাই বলিয়া বলিয়া শেষ করিতে পারিতেছে না। বলিতে সুখ, শুনিতে সুখ—এমন সর্ব্বসুখময় ছোট কথা আর কোথায় পাইবে?

আমার কথা শেষ হইবার নহে। কেবল আমার কথা চিন্তা করিতে বসিলেই এক দিন ইহার শেষ হইতে পারে! যখন ভাবিয়া দেখি 'আমি কত ক্ষুদ্র' তখনই জ্ঞানোদয় হয়। জ্ঞানোদয় না হইলে 'আমি আমার' কখনও ফুরায় না। সেই জন্যই ত তুমি আমাকে বুঝাইতে চাহিতেছ 'তুমি বড়'—আমি তোমাকে বুঝাইতে চাহিতেছি 'আমি বড়'—এ তর্কের মীমাংসা নাই, এ কথার অন্ত নাই।

ভিখারী।

ভৈরবী। একতালা।

ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
আরো কি তোমার চাই?
ওগো ভিখারী, আমার ভিখারী, চলেছ
কি কাতর গান গাই'!
প্রতিদিন প্রাতে নব নব ধনে
তুষিব তোমারে সাধ ছিল মনে
ভিখারী, আমার ভিখারী!
হায় পলকে সকলি সঁপেছি চরণে,
আর ত কিছুই নাই!
ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ
আরো কি তোমার চাই!
আমি আমার বুকের আঁচল ঘেরিয়া
তোমারে পরা'নু বাস;
আমি আমার ভুবন শূন্য করেছি
তোমার পূরাতে আশ!
মম প্রাণ মন যৌবন নব
করপুটতলে পড়ে আছে ভব,
ভিখারী, আমার ভিখারী!
হায় আরো যদি চাও, মোরে কিছু দাও,
ফিরে আমি দিব তাই!
ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
আরো কি তোমার চাই!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিশ্ব-রচনা।

উপন্যাস। দূরবীক্ষণের সৃষ্টি হইতে এই তিন শত বৎসর মধ্যে যে সকল অত্যদ্ভুত, আশাতীত, অচিন্তিতপূর্ব্ব জ্যোতিষিক আবিষ্কৃতি হইয়াছে, তাহা সাহিত্যজগতে কাহারও অবিদিত নাই। এই দিব্যচক্ষুঃসরূপ অপূর্ব্ব দৃগ্‌যন্ত্র সহায়ে সুদূরস্থিত গ্রহগণ জ্যোতিষীর করতলে আমলকবৎ প্রতিভাত হইল,—দূর নিকট হইল, সুতরাং অল্প বৃহৎ হইল। চন্দ্রমা পৃথিবীর প্রদেশসরূপ হইয়া ভূতত্ত্ববিদের আলোচ্য হইলেন। মঙ্গল প্রকৃত পক্ষে কুজ (পৃথিবীর অপত্য) হউন আর না হউন, পৃথিবীর ন্যায় জীবের বাসোপযোগী বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত হইল। এই দিব্য শস্ত্রপ্রভাবে জ্যোতিষী সৌরজগতের সর্ব্বত্র বিজ্ঞান-পতাকা রোপণ করিলেন। স্বয়ং গ্রহরাজ তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিলেন। সূর্য্য অনুচর বুধ ও শুক্রে দ্বিচন্দ্রক মঙ্গলে, চতুশ্চন্দ্রক বৃহস্পতিতে এবং অষ্টচন্দ্রক সোষ্ণীষ শনিতে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া জ্যোতিষীর জয়াশা তৃপ্তিলাভ করিল না। তাঁহার সেই তেজস্বী যন্ত্র প্রগাঢ় তমঃস্তর ভেদ করিয়া বরুণলোক আবিষ্কার ও অধিকার করিল। এবং নূতন অধিকৃত রাজ্যের যেমন জরিপ হয়, তেমনি গ্রহরাজ্যসমূহের দৈর্ঘ্যদূরত্ববিস্তারাদির পরিমাণ অবধারিত হইল। অনন্তর ভাস্করাদি প্রাচীন আচার্য্যগণের—

"আকৃষ্টিশক্তিশ্চ মহী * *
স্বস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাতি
* * *॥" ৩।৬ সি, শি॥

এই মতের, অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণের ব্যাপ্তিসাধনজন্য যখন সপ্তদশ খৃষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে সেই 'আপেল-পতন' শ্রোত্রপেয় জনশ্রুতির অধিনায়ক সেই অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন নর অমর আবির্ভূত হইয়া প্রকৃতির সাক্ষাৎ জগন্ময়ী শক্তি-স্বরূপ বিচিত্র অব্যক্ত মহাকর্ষণের তত্ত্ব ও ধর্ম্ম যথাযথরূপে ব্যাখ্যা করিলেন, তখন যেন এঞ্জিন-গৃহের দ্বার মুক্ত হইল এবং জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ প্রবেশপূর্ব্বক

বিশ্বযন্ত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এখন গতির নিদান জানা গেল। কেপ্লারের সুবিখ্যাত নিয়মত্রয় অতি বিশদ রূপে ব্যাখ্যাত হইল। এখন সিদ্ধান্তীদিগের,

"অদৃশ্যরূপাঃ কালস্য মূর্ত্তয়ো ভগণাশ্রিতাঃ।
শীঘ্রমন্দোচ্চপাতাখ্যা গ্রহাণাং গতিহেতবঃ॥
তদ্বদ্বাতারশ্মিভির্বদ্ধাস্তৈঃ সব্যেতর পাণিভিঃ।
প্রাক্‌পশ্চাদপকৃষ্যন্তে যথাসন্নং স্বদিঙ্মুখম্॥" ২।১ সূ, সি।

গ্রহগণের এই সকল ভিন্ন ভিন্ন গতির মূল কারণ পাওয়া গেল। এখন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ দুরবগাহ গণিতপ্রভাবে সাঙ্গোপাঙ্গ গ্রহগণকে যেন তুলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক ওজন করিলেন। কোন্ জ্যোতিষ্কে কত সামগ্রী আছে তাহা অবধারিত হইল। গ্রহগণের স্থিতিগতি সম্বন্ধে আর কিছুমাত্র ভুল রহিল না। যে সকল কারণবশতঃ জ্যোতিষিক ঘটনা দৃগ্‌গণিতৈক্য হইত না, তাহা এক্ষণে জানা গেল, এখন—

"বিভ্রংস্তী রবিচন্দ্রাদৌ ভবিষ্যতি যুগে যুগে।" বশিষ্ঠঃ।

এ আশঙ্কা আর রহিল না। এই সময় হইতে—

"যস্মিন্ পক্ষে যত্রকালে যেন দৃগ্‌গণিতৈক্যকম্।
দৃশ্যতে তেন পক্ষেণ কুর্য্যাৎ তিথ্যাদিনির্ণয়ম্॥" বশিষ্ঠঃ॥

এরূপ আদেশ করিতে হইল না, এবং

"কথমপি যদিদং চেদ্ভূরিকালে শ্লথং স্যান্
মুহুরপি পরিলক্ষ্যোন্দুগ্রহাদ্যাক্ষযোগং।
সদমলগুরুতুল্যপ্রাপ্তবুদ্ধি প্রকাশৈঃ
কথিত সদুপপত্ত্যা শুদ্ধিকেন্দ্রে প্রচাল্যে॥" বৃহত্তিথিচিন্তামণিঃ।

তাহাও নিষ্প্রয়োজন হইল। এখন জ্যোতিষিগণ সিদ্ধ পুরুষের ন্যায় জ্যোতিষিক ব্যাপার সকলের আদেশ করিতে লাগিলেন, এবং জ্যোতিষ্কগণ যেন তাঁহাদের আদেশানুবর্ত্তী হইয়া আদিষ্ট কালে আদিষ্ট দেশে আদিষ্ট ব্যাপারের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। জ্যোতিষী বলিলেন অমুক সময়ে গ্রহণ হইবে, ঠিক সেই সময়ে গ্রহণ লাগিল। এখন বরাহমিহিরের ন্যায়

"হীনাতিরিক্তকালে ফলমুক্তং পূর্ব্বশাস্ত্রদৃষ্টত্বাৎ।
স্ফুটগণিতবিদঃ কালঃ কথঞ্চিদপি নান্যথা ভবতি॥" ৫।২৫। বৃহৎসংহিতা।

দুঃখ প্রকাশ করিতে হইল না। জ্যোতিষী বলিলেন, অমুক সময়ে গুরু চন্দ্রের ভেদযোগ হইবে, ঠিক সেই সময়ে ভেদযোগ ঘটিল। যে ধূমকেতুগণ একাল পর্য্যন্ত শকুন বলিয়া প্রত্যাখ্যাত ছিল, তাহারা এখন সাবিত্রপরিবার মধ্যে পরিগণিত হইল। তাহাদিগের কক্ষা, গতির বেগ ও ভগণকাল নির্ণীত হইল। এখন বরাহমিহিরের

"দর্শনমস্তময়ো বা ন গণিতবিধিনাস্য শক্যতে জ্ঞাতুম্।" ১১।৩। বৃহৎসংহিতা।

এ কথা আর রহিল না। এই সময়ে জ্যোতিষীর দৈবজ্ঞ-উপাধি সার্থকতা লাভ করিল। তিনি বলিলেন, অমুক সালে অমুক দিনে আকাশের অমুক স্থানে ধূমকেতু উঠিবে। আদিষ্ট ধূমকেতু অমনি আদিষ্ট গগনে আদিষ্ট ক্ষণে আবির্ভূত হইল।

কেবল সাবিত্রপরিবারবর্গকে উক্ত রূপ অপাত্রদণ্ড তুলে ওজন হইতে হইয়াছিল এমন নহে, স্বয়ং সবিতাও এ পরীক্ষা হইতে পরিত্রাণ পান নাই।

নব্য জ্যোতিষের এই দ্বিতীয় অবস্থায় দৃষ্ট গ্রহে এবং গণিত গ্রহে এক আধ কলার তফাৎ দেখিলে গণিতজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের অসুখের আর পরিসীমা থাকিত না। দেখ কেমন করিয়া কোথায় ভুল হইল; যন্ত্রের দোষ, পর্য্যবেক্ষণের ভ্রম, কি বাস্তব গ্রহে কোন নূতন সংস্কারের কারণ উপস্থিত হইল, ইত্যাদি বিষয়ের আন্দোলন জন্য হুলস্থূল ব্যাপার ঘটিয়া উঠিত। গণিত বরুণে ও বাস্তব বরুণে কথঞ্চিৎ বিষমতা দেখিয়া ইউরোপীয় জ্যোতিষিগণ প্রাচীন পর্য্যবেক্ষণের কাগজপত্র তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, কেহ বা নূতন সারণী প্রস্তুত করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অনন্তর এই বিষমতার সম্ভবপর কারণের এই এক কারণ বলিয়া অনুমিত হইল যে বরুণের ঊর্দ্ধতর আকাশে কোন গ্রহ আছে, তাহারই আকর্ষণবশতঃ দৃক্‌সিদ্ধ বরুণলাভ হইতেছে না। অনেক বিচারের পর অজ্ঞাত গ্রহের আকর্ষণই এই অনৈক্যের কারণ বলিয়া স্থির হইল। অন্বেষ্টব্য গ্রহ যদি বরুণের অধোভাগে থাকিত তাহা হইলে শনির গতিতে বিক্ষোভ জন্মাইত, কিন্তু তাহা জন্মায় নাই। সুতরাং সমস্যা বিষম হইয়া উঠিল, অনন্ত ব্যোমসাগরে একটি নির্দ্দিষ্ট জাতীয় একটি মৎস্য আছে; এ মাছ ধরে কে? এমন জেলে কে? জাল ফেলে কোথায়? সূতা ধরিবে; সূতা ফেলে কোথায়?

সূতা তলাবে কেন? ইহার তুলনায় অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ কোথায় লাগে? অসীম অন্তরিক্ষে কোটি কোটি জ্যোতিষ্ক রহিয়াছে, ইহার মধ্যে কোন্‌টি গ্রহলক্ষণাক্রান্ত? কোন্‌টির প্রতি দূরবীক্ষণ সন্ধান করিব? কোন্‌টি অভীপ্সিত ফল প্রদানে সক্ষম? এই সকল দুর্ভেদ্য প্রশ্নজাল ছেদ করিয়া ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের আদম্‌স্ এবং ফ্রান্সের লেবেরিত্র শুদ্ধ গণিতবলে, বিনা দূরবীক্ষণে, আকাশের দিকে একবারও না তাকাইয়া এক নূতন গ্রহ প্রকটিত করিলেন। তৎকালে যে সকল রাশিতে বরুণ ছিলেন তাহার কোন স্থানে কত দূরে কত ভারি গ্রহ থাকিলে গণিত ও বাস্তব বরুণে উক্ত বিষমতা ঘটিতে পারে, তাহা যথোচিত গণিতকৌশলে স্থির হইলে, পর্য্যবেক্ষণে সুকুশল জ্যোতিষীর দূরবীক্ষণে আবিষ্কর্ত্তব্য গ্রহ ধরা পড়িল। অতএব

"ধীরেকং পারমার্থিকং যন্ত্রম্।" ভাস্কর।

লেবেরিত্র কল্পান্তস্থায়ী কীর্ত্তিশৈলের শিখরে বসিলেন এবং আদম্‌স্ তাঁহার পার্শ্বে স্থান পাইলেন। এই গ্রহের ইউরোপীয় নাম নেপটুন, আমি ইহাকে ইন্দ্র বলি। ইন্দ্র বলি কেন, তাহার কারণ "ভারতী" ইত্যাদি পত্রিকায় আছে।

দূরবীক্ষণ, দূরবীক্ষণসহ গণিত এবং শুদ্ধ মহাকর্ষণসম্বন্ধীয় গণিত—এই ত্রিবিধ সাধনপ্রভাবে জ্যোতিষসাম্রাজ্যে যে সকল অলৌকিক কীর্ত্তি হইয়াছে তাহার যথাকথঞ্চিৎ উল্লেখ করা হইল। ইতিমধ্যে ভানুমতির চিত্তচমৎকারিণী পিচ্ছিকার ন্যায় বর্ণবীক্ষণযন্ত্রদ্বারা বর্ণপট্টিকার বর্ণবিশ্লেষণাদি অচিন্তিতপূর্ব্ব অচেষ্টিতপূর্ব্ব যে দুরধিগম্য ব্যাপার সকল বিনা আড়ম্বরে সংসাধিত হইয়া গ্রহগণের নমুনা না দেখিয়া পরীক্ষা না করিয়া তাহাদের বাহ্য প্রকৃতির মূলীভূত পদার্থনিচয়ের লক্ষণাদির পরিচয় প্রদান করিবে, তাহা স্বপ্নের অগোচর। জ্যোতিষ্কের আলোকসম্ভূত বর্ণপট্টিকার তীর্য্যক্ শ্যামরেখাপাশ পরীক্ষা করিয়া রবি চন্দ্র ও গ্রহনক্ষত্রে কি কি ভৌতিক পদার্থ সসার তরল বা গ্যাসভাবাপন্ন হইয়া কি পরিমাণে আছে তাহা পদার্থবিদ্ জ্যোতিষী ঠিকঠাক বলিয়া দেন। তপোবনে সমাধিস্থ যোগী যেমন যোগাসন পরিত্যাগ না করিয়া নিমীলিতলোচনে বিভূতিবলে অভীষ্ট লোকে গমনপূর্ব্বক তত্রত্য সমস্ত বিষয় জ্ঞানগোচর করেন, তেমনই জ্যোতির্ব্বিদ্ বেধশালায় বসিয়া, দৃক্‌যন্ত্র সহায়ে কেবল স্বীয় প্রজ্ঞাবলে, জ্যোতিষ্কগণসম্বন্ধীয় প্রভূত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকটিত করেন।

অতএব বুঝা গেল যে, বিশ্বের অঙ্গ প্রত্যঙ্গসরূপ রবি, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কগণসম্বন্ধে দূরবীক্ষণাদি যন্ত্র ও গণিতসাহায্যে মানুষ যথাসাধ্য জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে মানুষ উক্ত দ্বিবিধ সাধনআশ্রয়ে নিখিল বিশ্ব কি রীতি অনুসারে বিরচিত হইয়াছে, তাহার কথা কিছু বলিতে পারেন? অর্থাৎ এই জ্যোতিষ্কগণ অন্তরিক্ষে কোন্ ভাবে কি ভঙ্গিক্রমে বিন্যস্ত হইয়া জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার কোন সমাচার পাওয়া যায় কি না? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। ইহার উত্তর এক কথা 'হাঁ' কি 'না' চলে না। এ ক্ষেত্রে দাঁড়াইলে জ্যোতিষীকে টলটলায়মান হইতে হয়। ইহা মানুষের জ্ঞানভূমির অন্ত সীমা, ইহার সারবত্তা বড় কম। এ স্থলে কোন কথা নিঃসংশয়ে বলিতে সাহস কুলায় না, ইতস্ততঃ করিতে হয়; পদে পদে উপন্যাসের অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এ প্রস্তাবসম্বন্ধীয় অনেক সিদ্ধান্ত অনুমানসিদ্ধ, সুতরাং ভাবী আবিষ্কার দ্বারা রূপান্তরিত, বা অসিদ্ধ বলিয়া পরিত্যক্ত হইতে পারে। অতএব শুদ্ধ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কোন কথাই বলা উচিত নহে। পর্য্যবেক্ষণ বা সাদৃশ্য দ্বার সমর্থিত তথ্যরূপ ভিত্তির উপর যে সকল মতকে স্থাপন করা গিয়াছে, কেবল সেই সকল গুলির কথা পাড়িতে পারা যায়। আমাদের স্বভাবই এমনই যে সৃষ্টি সম্বন্ধে নানারূপ কল্পনা না করিয়া আমরা ক্ষান্ত থাকিতে পারি না; প্রথমে কি ছিল, তাহার পর কি হইল, এই রূপ বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক করি এবং ঘুরিয়া মরি। অতএব বিজ্ঞান যদি আমাদিগকে যথাসম্ভব আলোক প্রদান করিয়া ভ্রমান্ধকার হইতে রক্ষা করেন, তাহা হইলে আমরা চিরদৃষ্ট ও সুপরীক্ষিত তথ্যের সহিত যে সকল মতের সামঞ্জস্য আছে, তাহারই সমর্থন করিতে চেষ্টা পাইব।

বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহা কেবল দূরদর্শিতামূলক, অর্থাৎ বাহ্যপদার্থ সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু জানি, তাহা কেবল দেখিয়া দেখিয়া ঠেকিয়া ঠেকিয়া শিখিয়াছি। এরূপ শিক্ষার ফল হইল কেবল তথ্যের জ্ঞানলাভ। তথ্যসংগ্রহ হইলে সে গুলির তুলনা হয়, তুলনা দ্বারা তথ্যনিচয়ের সম্বন্ধ বিচার করা যায়। সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিতে পারিলেই অনুমান অর্থাৎ এই স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস জন্মে যে সদৃশ কারণ জন্য সদৃশ ফল উৎপন্ন হয় অর্থাৎ অনুমান দ্বারা আমরা সাধারণ নিয়মে উপনীত হই।

শাস্ত্র,—সত্যের অনুসন্ধান। ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কুসংস্কারবিরহিতচিত্তে তথ্যের পরীক্ষা না করিলে সত্যানুসন্ধান হইতে পারে না। সত্যানুসন্ধান করিতে হইলে, কি ছোট, কি বড় সকল তথ্যকে উপাদেয় ফলপূর্ণ এবং মহতী চিন্তার পর্য্যাপ্ত ভূমি বলিয়া যথোচিত আদর করিতে হয়।

"চৌদ্দ পোয়া নৌকা খানি
গড়েছে কোন্ কারিকর হদ্দ রে তার গুণ বাখানি।"

যখন এই ক্ষুদ্র নরদেহের তত্ত্ব জানা আমাদের পক্ষে অসাধ্য তখন এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের নক্সা, কাঠাম ও কার্য্যকারিতা হৃদয়ঙ্গম করা মানুষের পক্ষে কেমন করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে? তথাপি অচিন্ত্য, অব্যক্ত পুরুষোত্তমের কার্য্যকৌশলে নিদিধ্যাসন অপেক্ষা মানুষমনের শ্রেয়স্করী প্রবৃত্তি আর কি আছে? এতদ্দ্বারা আত্মার উন্নতি, মহত্ত্বে ও মহিমায় শ্রদ্ধা এবং শাস্ত্রাধ্যয়নের পরম ফল যে সত্যে, জ্ঞানে, সাধুতায় এবং সৌন্দর্য্যে প্রীতি, তাহা জন্মে। এ আনন্দপ্রদ চিন্তায় চিন্তিত থাকিলে ভূমানন্দ লাভ হয়, এই আকাশের চিন্তাই ভূমানন্দের চিন্তা।

"কোহ্যন্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো নস্যাৎ"

এবম্ভূত ধ্যান দ্বারা আত্মা পার্থিব শৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতত্বে অধিকারী হয়। কি ভূতত্ত্ব কি জীবতত্ত্ব কি রসতত্ত্ব সকল শাস্ত্রে ভগবানের মহিয়সী কীর্ত্তি পরিকীর্ত্তিত আছে। কিন্তু আকাশ ভিন্ন জ্যোতিষশাস্ত্রপ্রতিপন্ন এরূপ অনাদির এরূপ অনন্তের, এরূপ অসীমের পরিচয় আর কোথায় পাইবে? কি বিস্ময়াবহ, কি ভয়াবহ বিরাট বিগ্রহ! ত্রিলোকব্যবহিত দূরত্ব, দুষ্প্রসহ ভাস্বরত্ব, মনোজব বেগ! আদ্যাশক্তির কি শক্তি! কি প্রভাব! তাঁহার ইঙ্গিতে এই অনন্ত বিশ্ব ঘুরিতেছে চলিতেছে! "নমস্তে জগৎ কারণায়।" তুমি ধন্য! এই কীটাণুকে তোমার অনন্ত অপার মহিমায় ধ্যান করিবার শক্তি প্রদান করিয়াছ!

এ প্রশ্ন সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক বিচার করিতে হইলে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে, অত্যন্ত তেজস্বী দূরবীক্ষণ দিয়া এই যে চারি পাঁচ কোটি ছোট বড় তারা দেখা যায়, এ গুলি অন্তরিক্ষে কি রূপে বিন্যস্ত আছে। সৌর জগতের কোন্ দিকে তারা গুলি সাজান আছে, তাহা দূরবীক্ষণ সহায়ে প্রত্যক্ষীভূত হয়

এবং বড় বড় দূরবীক্ষণে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারা দেখা যায় তাহার অধিকাংশই আকাশব্যাপিনী মন্দাকিনী নামে যে তারাময়ী মেখলা তাহারই অন্তর্ভূত। পরন্তু এতদ্দ্বারা তারানিচয়ের বাস্তব অবস্থান জানা গেল না। বাস্তব অবস্থান জানিতে হইলে দিক্ এবং দূরত্ব,উভয়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তারা সকল এত দূরে আছে যে সেগুলি বস্তুতঃ এক একটি সূর্য্যবৎ জাজ্বল্যমান প্রকাণ্ড পিণ্ড হইলেও দূরবীক্ষণে ঝিক্‌ঝিকে ধূলার গুঁড়ার মত দেখায়; সুতরাং সেগুলির আকারের পরিমাণ হইতে পারে না। বিশ ত্রিশটা তারা মাত্রের পরিমেয় লম্বন থাকায় তাহাদেরই কেবল দূরত্ব জানা গিয়াছে। লম্বন অভাবে যে দূরত্বের পরিমাণ হয় না, তাহা গণিতজ্ঞদিগের অবিদিত নাই। তবেই তারাগুলিকে ভগবান্ কিরূপ ব্যবস্থাপূর্ব্বক সাজাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য কেবল এক একটি তারার আকার অর্থাৎ ঔজ্জ্বল্যের তারতম্যের বিচার পূর্ব্বক সম্ভবপর অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়। সব তারাগুলি যদি বস্তুতঃ সমান উজ্জ্বল হইত তাহা হইলে তারায় দৃশ্যমান আকার দেখিয়া দূরত্বের একটা আন্দাজি পরিমাণ ধরিতে পারা যাইত, এবং সে আন্দাজ নিতান্ত বেআড়া হইত না। কিন্তু বেশ জানা আছে যে ঔজ্জ্বল্যে কোন তারা কোন তারার সমান নহে, তথাপি তারাগণের দৃশ্যমান আকারে যত বৈষম্য দেখা যায়, বাস্তব আকারে তত বৈষম্য না থাকিতে পারে। যাহা হউক কিছুই না করা অপেক্ষা তারাগুলি সমুজ্জ্বল ধরিয়া একটা বিচারণা করা শ্রেয়ঃকল্প। গালিলিও প্রভৃতি প্রথম পর্য্যবেক্ষকেরা এই রূপই করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীমাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের ইংরাজি।

অপাত্রদণ্ড,	Without beam and pans.
আদেশ,	Prediction.
উপন্যাস,	Preface, Conjecture.
কক্ষা,	Orbit.
গ্রহরাজ,	The Sun.
নিয়মত্রয়,	Three laws of motion.
ভগণ কাল,	Period.
ভেদযোগ,	Transit, Occultation.
ভৌতিক,	Elementary.
মন্দাকিনী,	Galaxy.
মেখলা,	Belt.
লম্বন,	Parallax.
বরুণ,	Uranus.
বর্ণপট্টিকা,	Spectrum.
বর্ণবীক্ষণ,	Spectroscope.
বর্ণবিশ্লেষণ,	Spectrum analysis.
বিগ্রহ,	Body.
ব্যাপ্তিসাধন,	Generalization.
শকুন,	Ill omen.
সসার,	Solid.
সাদৃশ্য,	Analogy.
সামগ্রী,	Mass.
সারণী,	Table.
সোষ্ণীষ,	With the Rings.

রাজা রামানন্দ রায়।

(১)

উড়িষ্যার প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ উড়িষ্যাকে বাঙ্গলার "বিওশিয়া" মনে করেন। উড়িষ্যা বিচ্ছিন্ন ভাবে ভারতের এক প্রান্তে অবস্থিত, এবং রেলপথাদিদ্বারা এখনও সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সুগম ও সুপরিচিত হয় নাই বলিয়াই বাঙ্গালিগণ এই রূপ ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন। কিন্তু উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাস বা আধুনিক রাজনৈতিক অবস্থা বা শিক্ষোন্নতির * বিষয় চিন্তা করিলে, উড়িষ্যাকে ভারতবর্ষের কোন প্রদেশ অপেক্ষাই পশ্চাদ্বর্ত্তী বলা যাইতে পারে না।

হিন্দুগৌরবধ্বংসী পাঠান সম্রাটগণের বিজয়বৈজয়ন্তী যখন আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথের সকল ভূভাগে, বিন্ধ্যাচলশিখরে এবং কুমারিকাপ্রান্তে মহাসাগরোপকূলে গর্ব্বোন্নতমস্তকে, নৃপাদি সর্ব্বসাধারণ জনগণের হৃদয়ে ভীতি উৎপাদন করিয়া পত পত শব্দে উড্ডীন হইয়াছিল, † যখন একে একে সকল প্রদেশই পাঠান সৈনিকের পদভরে কম্পিত হইতেছিল, সেই সময়ে উৎকলাধিপতিগণ আর্য্যস্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, দেবদ্বিজসংরক্ষণভার স্বহস্তে সুন্দর

* বাঙ্গালার সাংবৎসরিক শাসন বিজ্ঞাপনাতে প্রকাশিত বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষোন্নতিপ্রদর্শক মানচিত্র দ্রষ্টব্য।

† গজপতিবংশীয় রাজগণের শাসনকালে উড়িষ্যা রাজ্যের সীমা—উত্তরে ত্রিবেণী, দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, ও পশ্চিমে গুর্জ্জর রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। গঙ্গাবংশীয় অনঙ্গভীমদেবের সময় হইতে উড়িষ্যারাজগণ 'বীর শ্রীগজপতি গৌড়েশ্বর নবকোটি কর্ণাটক বর্গেশ্বর বীরাবিবীরবর প্রতাপশ্রী" এই গৌরবান্বিত উপাধি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। বিশ্বকোষ ও উড়িষ্যার ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

উৎকল রাজ প্রতাপরুদ্র সম্বন্ধে রামানন্দের

"যন্নামাপি নিশম্য সন্নিবিশতে সেকন্দরঃ কন্দরং,
স্বং বর্ণং ফলবর্গভূমিতিলকঃ সাস্রং সমুদ্বীক্ষতে।
যোন গুর্জ্জরভূপতি র্জরদিবারণাং নিজং পওনং,
বাতব্যগ্র পয়োবি পোতগমিব স্বংবেদ গৌড়েশ্বরঃ॥"

এই শ্লোকটি হইতেও উৎকল রাজগণের প্রতাব অনুমিত হইতে পারে।

রূপে বহন করিয়া * আর্য্যদর্শনবিজ্ঞানস্মৃতিসেবকবর্গের জীবিকার্জ্জন চিন্তা হইতে তাঁহাদিগকে মুক্ত রাখিয়া, দেশীয় ভাষার কবিগণের একমাত্র উৎসাহদাতা ও আশ্রয়স্থল হইয়া, পররাষ্ট্রপতিগণের স্মরণপথে ভীতিকণ্টক রূপে প্রতিভাত হইয়া উৎকল রাজ্যে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন। যে সকল সুবিদ্বান আর্য্যসন্তান মুসলমান রাজ্যে তাঁহাদের গুণের সমাদর হইবে না মনে করিতেন, একমাত্র উৎকলই সেই সময়, তরঙ্গসঙ্কুল মহাসমুদ্রমধ্যে তামসী রজনীতে পথভ্রষ্ট পোতগগণের আনন্দবর্দ্ধক আলোকমঞ্চস্বরূপ, তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ তাঁহাদের আনন্দ সঞ্চার করিত। † স্বধর্ম্মানুরক্ত আর্য্যসন্তানগণ এই সময়ে নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মচিন্তার জন্য একমাত্র উৎকল রাজ্যেই আশ্রয়প্রাপ্ত হইতেন। ‡ কর্ম্মকুশল বুদ্ধিজীবী আর্য্যসন্তানগণ জীবিকার্জ্জনের জন্য মুসলমানগণের দাসত্ব অপ্রীতিকর বোধ করিলে উৎকল রাজের অধীনে নিয়োজিত হইয়া উৎকলেই বসবাস করিতেন। সম্ভবতঃ এই প্রবন্ধের শীর্ষোল্লিখিত মহাত্মাও উপর্য্যুক্ত কোন কোন কারণে উৎকলপ্রবাসী হইয়া উৎকলেই সমস্ত জীবন যাপন করিয়াছেন।

রাজা রামানন্দ রায় বঙ্গবাসী বৈষ্ণব-সমাজে অপরিচিত নহেন। তাঁহার মধুর—

"পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ, না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেখল জানি॥
এ সখি সে সব প্রেম কহানি।
কানুঠামে কহবি বিছুরহ জানি॥ ধ্রু॥

* উড়িষ্যার ইতিহাস নামক গ্রন্থে গঙ্গাবংশীয় রাজগণের শাসন বিবরণ দ্রষ্টব্য।

† উৎকলপতি ভৈলঙ্গ মুকুন্দদেবের শাসনকালে জনৈক গৌড়ীয় মহাভারতকার রাজসম্মান লাভাশায় উৎকলে গমন করেন। ইঁহার নাম রঘুনাথ। ইঁহার প্রণীত "অশ্বমেধ পঞ্চালিকা" নামক প্রায় তিন শত বৎসরের হস্তলিখিত গ্রন্থ বহু অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হইয়াছি। এই মহাভারত প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু ইঁহার ও ইঁহার প্রণীত এই পুস্তক অল্প দিন হইলে সাহিত্য পরিষদের জনৈক সভ্য লিপিবদ্ধ করতঃ পরিষদে প্রেরণ করিয়াছেন।

‡ সম্ভবতঃ নির্ব্বিঘ্নে আর্য্যরাজ্যে স্বধর্ম্মাচরণ উদ্দেশ্যে চৈতন্যদেব উৎকলে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

না খোজনু দূতী, না খোজনু আন।
দুহুঁ কর মিলন মধত পাঁচবাণ॥
অব সোই বিরাগে তুহুঁ ভেলি দূতী।
সুপুরুখ প্রেমিক ঐ ছন রীতি॥
বর্জ্জন রুদ্র নরাধিপ মান।
রামানন্দ রায় কবি ভাণ॥ *

পদটি যে কেবল মহাপ্রভু শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গদেবের প্রিয় সঙ্গীত ছিল, কেবল যে তিনিই এই গীতটি শ্রবণ করিয়া আত্মহারা হইতেন, এমন নহে; এখনও এই পদটি সাধক বৈষ্ণবগণের পরম প্রিয় সামগ্রী; ইহার কীর্ত্তনে এখনও ভজনানন্দ প্রেমিক বৈষ্ণবগণ বিমল আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন।

"পহিলহি" পদ ভিন্ন গৌড়ীয় বা মৈথিল বা এতদুভয়মিশ্র ভাষায় রাজা রামানন্দ কোন সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন কিনা, জানিতে পারা যায় নাই। তবে তাঁহার রচিত কতকগুলি সংস্কৃত পদ এবং "জগন্নাথবল্লভ" নামক একখানি সংস্কৃত নাটক দেখিয়াছি। তৎপ্রণীত নাটক ও পদাদির আলোচনা এই প্রবন্ধের যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইবে।

পদ ও নাটক রচনা ভিন্ন অন্য কারণেও রাজা রামানন্দের জীবনী আলোচনার যোগ্য। সাময়িক ইতিহাস ও গৌড়ীয় ভাষার তত্ত্বালোচনায় রামানন্দের জীবনী যেরূপ আলোচনীয়, তাঁহার বিষয়রতির সহিত ধর্ম্মানুরক্তির অপূর্ব্ব ও অলোকসামান্য সম্মিলনও সেইরূপ চিন্তনীয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদিষ্ট উৎকট সন্ন্যাসের ফলে স্ত্রীলোকের নিকট তণ্ডুল ভিক্ষাপরাধে ছোট হরিদাসকে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল, কিন্তু রূপসী তরুণী অভিনেত্রী সহ রাজা রামানন্দ নির্জ্জনে অবস্থান করিলেও, স্বয়ং মহাপ্রভুও সেই "বিষয়ী শূদ্রাধম" রামানন্দের নিকট স্বয়ং জগৎপূজ্য সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ হইয়াও উপদেশ গ্রহণ ও সতত তাঁহার সহিত একত্র অবস্থান ও ধর্ম্মালোচনা ও প্রেমাস্বাদন করতঃ তাঁহার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। কেন,—তাহার আলোচনা করিতে গেলেই রামানন্দের মহৎ জীবনের আলোচনা করা আবশ্যক হয়।

* এই পদটি চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদে, পদকল্পতরু ও পদামৃত সমুদ্রে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

রায় রামানন্দ বঙ্গসমাজে বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত না হইলেও সুপরিচিত নহেন। ইঁহার গরিমা প্রবীণ বৈষ্ণবগণও সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর গৌরব-বালার্কের সুবর্ণকিরণ, পৌর্ণমাসী যামিনীপ্রভাতে অস্তগমনোন্মুখ রামানন্দ-মহত্ত্ব-চন্দ্রমার ক্ষীয়মান সুস্নিগ্ধ রশ্মিকে নিষ্প্রভ করিয়া ফেলিয়াছে। আজকাল বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। প্রতিভাপ্রসূত কবিত্বালোচনা মাত্রেই মুগ্ধ না থাকিয়া কৃতজ্ঞ রসজ্ঞ পাঠকগণ প্রতি ভাষার কবির, এবং স্মরণীয় কর্ম্মবীরগণের কর্ম্মরাজির স্মরণমাত্রেই যথেষ্ট বোধ না করিয়া, অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ কর্ম্মবীরগণের জীবনী-আলোচনার জন্য লালায়িত হইয়াছেন। রাজা রামানন্দ স্বাধীন প্রবল প্রতাপ উৎকলাধীপ প্রতাপ রুদ্রের মন্ত্রী ও ধর্ম্মবীর মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের অন্তরঙ্গ এবং প্রাচীন বাঙ্গলা পদকর্ত্তৃগণের মধ্যে গণনীয় কবি ছিলেন, ইঁহার জীবনী-আলোচনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বিবেচনায় এই প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইতেছে।

শ্রীরাধেশচন্দ্র শেঠ।

জগৎ শেঠ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মাণিকচাঁদ।

মুর্শিদ কুলি খাঁ মুক্সুদাবাদে আগমন করিলে, সম্রাট আরঙ্গজেব দেওয়ানের সহিত পৌত্র আজিম ওশ্মানের মনোবিবাদ অবগত হইয়া তাঁহাকে বিহারে রাজধানী স্থাপন করিতে আদেশ প্রদান করেন। নবাব আজিম ওশ্মান স্বীয় পুত্র ফরখ্ শেরকে ঢাকায় প্রতিনিধিস্বরূপ রাখিয়া বিহারে উপস্থিত হন ও পাটনায় রাজধানী স্থাপন করেন। তদবধি পাটনা আজিমাবাদ নামে অভিহিত হয়। এদিকে দেওয়ান রাজস্বসংক্রান্ত সমস্ত হিসাবপত্র লইয়া সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইলেন। সম্রাট সে সময়ে দাক্ষিণাত্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

তিনি দেওয়ান মুর্শিদের রাজস্ববৃদ্ধিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানীর সঙ্গে বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার নায়েব নাজিমী প্রদান করিলেন। তদ্ভিন্ন মুর্শিদ কুলি সম্মানসূচক উপাধি ও খেলাতাদিতে ভূষিত হইয়া বাঙ্গালায় আগমন করিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন। মুক্সুদাবাদে উপস্থিত হইয়া মুর্শিদ কুলী খাঁ স্বীয় নামানুসারে ইহাকে মুর্শিদাবাদ আখ্যা প্রদান করেন, তদবধি মুক্সুদাবাদ মুর্শিদাবাদ নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি করিয়া মুর্শিদ কুলী জাফর খাঁ রাজস্বসংক্রান্ত বিষয়ের ক্রমোন্নতি সাধনে তৎপর হইলেন। তিনি ঐ সম্বন্ধে শেঠ মাণিকচাঁদের সহিত পরামর্শ করিলে, তিনি প্রথমতঃ মুর্শিদাবাদে একটি টাঁকশাল স্থাপনের প্রস্তাব করেন। কারণ, মুর্শিদাবাদ তৎকালে দেওয়ানী বিভাগের মুখ্য স্থান হওয়ায় সর্ব্বদাই মুদ্রাদির আবশ্যক হইত। টাঁকশাল স্থাপিত হইলে অন্য স্থান হইতে মুদ্রাদির আনয়নে কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না মনে করিয়া দেওয়ান মুর্শিদ মাণিকচাঁদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাণিকচাঁদের গদীরও উন্নতি হইবে বলিয়া বুঝিয়া পারিলেন। সেই পরামর্শানুসারে ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে মহিমাপুরের পরপারে গঙ্গাতীরে মুর্শিদাবাদ-টাঁকশাল স্থাপিত হইল; এবং শেঠ মাণিকচাঁদ তাহার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইলেন। শেঠদিগের গদীর পরপারে টাঁকশাল স্থাপিত হওয়ায় মাণিকচাঁদের পক্ষে তাহার পরিদর্শনের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহার যত্নে মুর্শিদাবাদ-টাঁকশালের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

যতদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় মুসলমান রাজত্বের সামান্যমাত্রও অস্তিত্ব ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত শেঠদিগের সহিত ইহার বিশেষ রূপ সম্বন্ধই ছিল। ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিক্‌গণ আপনাদের সুবিধার জন্য এই টাঁকশাল হইতে মুদ্রা মুদ্রিত করাইয়া লইতেন। নবাব সায়েস্তা খাঁর আদেশে বাঙ্গলার অন্যান্য স্থানের ন্যায় কাশিমবাজারের কুঠী সরকার হইতে বাজেয়াপ্ত হয়। কিন্তু নবাব ইব্রাহিম খাঁর আদেশে যদিও ইংরাজগণ বাঙ্গলায় পুনঃ প্রবেশের অধিকার পাইয়াছিলেন, তথাপি কাশিমবাজারে তাঁহারা রীতিমত কার্য্য আরম্ভ করিতে পারেন নাই। মুর্শিদাবাদ-টাঁকশাল স্থাপিত হইলে তাঁহারা পুনর্ব্বার কাশিমবাজার-কুঠী সুদৃঢ় করিয়া উৎসাহ সহকারে কার্য্য আরম্ভ করেন। কারণ, এই

টাঁকশালের জন্য কাশিমবাজার প্রদেশস্থ ব্যবসায়িগণের বিশেষ রূপ উপকার সংসাধিত হইয়াছিল। এই সময়ে লণ্ডন কোম্পানী ও ইংলিশ কোম্পানী নামে দুই প্রতিদ্বন্দী ইংরাজ কোম্পানী মিলিত হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া নামে একটি মাত্র কোম্পানীতে পরিণত হওয়ায় ইংরাজদিগের ব্যবসায়ের আরও সুবিধা ঘটে। কোম্পানী আপনাদিগের সুবিধার জন্য মুর্শিদ কুলি খাঁকে ২৫ সহস্র টাকা প্রদান করিয়া ইংলণ্ড হইতে আনীত অমুদ্রিত রৌপ্যসমূহ মুর্শিদাবাদ-টাঁকশাল হইতে মুদ্রাকারে পরিণত করাইয়া লওয়ার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। টাঁকশালের কর্ম্মচারিগণের আদেশে ইংরাজেরা সপ্তাহে তিন দিন আপনাদের মুদ্রা মুদ্রিত করাইয়া লইতেন। ইংরাজদিগের জন্য মুদ্রিত মুদ্রা সকলও সরকারী মুদ্রার ন্যায়ই ব্যবহৃত হইত। পলাশী যুদ্ধের পর হইতে তাঁহারা আপনাদিগের জন্য স্বতন্ত্র মুদ্রা মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করেন, এবং তাহাতেও প্রথমতঃ দিল্লীর বাদসাহের নাম অঙ্কিত থাকিত। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা কলিকাতায় আপনাদিগের টাঁকশাল স্থাপন করেন। কিন্তু মুর্শিদাবাদ টাঁকশালের প্রতিদ্বন্দিতায় তাঁহাদিগকে অনেক দিন পর্য্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। শেঠেরা সেই সময়ে সামান্য রূপ বাটা দিয়া মুর্শিদাবাদ-টাঁকশাল হইতে আপনাদের জন্য মুদ্রা মুদ্রিত করাইয়া লইতেন। দেশমধ্যে মুদ্রা প্রচলনের ভার তাঁহাদেরই প্রতি অর্পিত হওয়ায় ইংরাজদিগের প্রথমতঃ নানারূপ অসুবিধা ঘটিয়াছিল, নবাব মীর কাসিমের সিংহাসনারোহণের পর ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাস হইতে কলিকাতা টাঁকশালের সমস্ত অসুবিধাই দূর হয়; এবং ইংরাজেরা সকল প্রকার সুবিধা লাভ করেন। তদবধি মুর্শিদাবাদ টাঁকশালের অধঃপতন উপস্থিত হয়, এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাহার অন্তর্ধান ঘটে। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে আবার মুর্শিদাবাদে টাঁকশালের স্থাপনা হয়। কিন্তু তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে সমস্ত প্রাদেশিক টাঁকশাল উঠিয়া গেলেও মুর্শিদাবাদ টাঁকশালের কার্য্য একেবারে রহিত হয় নাই। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে মুর্শিদাবাদের কালেক্টর টাঁকশালের সমস্ত উপকরণাদি কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন ও টাঁকশাল-গৃহ প্রকাশ্য নীলামে বিক্রীত হয়। * নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর স্থাপিত টাকশালের ও

* রিয়াজুস সালাতীন গ্রন্থে ৩ কোটি ৩ লক্ষ লিখিত আছে। ফার্‌সী সে শব্দে ৩ ও সী, ৩০। সে ও সীর গোলযোগ হইয়া থাকিবে।

ইংরাজ কোম্পানীর টাকশালের স্থান বিভিন্ন। মুর্শিদ কুলী খাঁর স্থাপিত টাঁকশাল মহিমাপুরের পরপারে স্থাপিত ছিল, অদ্যাপি তাহার যৎসামান্য ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। জগৎ শেঠদিগের ভগ্নাবশিষ্ট বাসভবনের সম্মুখে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে উক্ত টাঁকশালের চিহ্ন বিদ্যমান আছে। যেরূপ অবগত হওয়া যায় তাহাতে মুর্শিদাবাদ-টাঁকশালের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল বোধ হয়। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দের রাজস্ব হিসাবে মুর্শিদাবাদ টাঁকশাল হইতে ৩,০৪১০৩৲ টাকা আয়ের কথা উল্লিখিত আছে। আজিও মুর্শিদাবাদ-টাঁকশালের মুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায়। বাজারে শাহ আলম বাদসাহের নামাঙ্কিত যে সমস্ত মোহর দৃষ্ট হয়, সে গুলি মুর্শিদাবাদ-টাঁকশাল হইতেই মুদ্রিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, দেওয়ান মুর্শিদ কুলি বাঙ্গলা রাজস্বের অনেক পরিমাণে উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে বাঙ্গালা হইতে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার রাজস্ব দিল্লীতে প্রেরিত হইত। * এই রাজস্বসম্বন্ধে শেঠ মাণিকচাঁদ দেওয়ান মুর্শিদ কুলিকে অনেক সাহায্য করায় তিনি বাদসাহের অনুমতি ক্রমে তাঁহাকে বাঙ্গালার পেস্কার রূপে নিযুক্ত করেন। বাঙ্গালার যাবতীয় জমীদার অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ মাণিকচাঁদের নিকট আপনাদের দেয় রাজস্ব প্রদান করিতেন। মাণিকচাঁদ তাহা সরকারে পেশ করিতেন। রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থার জন্য মুর্শিদ কুলি খাঁ পুণ্যাহের সূচনা করিয়াছিলেন। বৎসরের শেষে সমস্ত রাজস্ব পরিশোধ করিয়া নব বর্ষের প্রথমে শুভ পুণ্যাহে বর্ত্তমান বর্ষের কতক রাজস্ব প্রদান করিয়া জমিদারগণ সনন্দ বাহাল করাইয়া লইতেন। রাজস্ববিষয়ে মাণিকচাঁদের এইরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকায় বাঙ্গালার সমস্ত জমিদারের সহিত তাঁহার বিশেষরূপ পরিচয় ঘটে, সময়ে সময়ে যখন জমিদারগণ নির্দ্দিষ্ট সময়মধ্যে রাজস্বপ্রদানে অক্ষম হইতেন, তখন তাঁহারা শেঠ মাণিকচাঁদকে তাঁহার গদী হইতে সমস্ত রাজস্ব পরিশোধ করিতে বলিতেন। পরে যথারীতি সুদ প্রদান করিয়া তাঁহাদের দেয় অর্থের পরিশোধ করিতেন। এইরূপে বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত জমিদারের সহিত মাণিকচাঁদের কারবার চলিতে লাগিল। তৎকালে বাঙ্গালা হইতে দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণের এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। সমস্ত মুদ্রা বাক্সবন্দী হইয়া দুই শতেরও অধিক

* Hunter's Stastical Accounts of Murshidabad P. 174.

গো-শকটে স্থাপিত হইয়া উপযুক্ত প্রহরী ও একজন নায়েব খাজাঞ্জীর সহিত প্রেরিত হইত। সেই সঙ্গে বাদসাহ ও অমাত্যবর্গের জন্য নানাপ্রকার উপঢৌকন পাঠাইবারও ব্যবস্থা ছিল। এই সমস্ত শকট ও প্রহরী বিহার পর্য্যন্ত পঁহুছিত, পরে তথা হইতে নূতন শকট ও প্রহরী দ্বারা সেই সমস্ত রাজস্ব এলাহাবাদ পর্য্যন্ত যাইত, তথা হইতে আবার নূতন শকট ও প্রহরীর সাহায্যে একেবারে দিল্লী গিয়া উপস্থিত হইত। ইহাতে সময়ে সময়ে অসুবিধা ঘটায়; দেওয়ান মুর্শিদ কুলি শেঠ মাণিকচাঁদের পরামর্শ ক্রমে তাঁহাদের দিল্লীর গদীতে হুণ্ডি পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন, এবং সেই হুণ্ডি অনুসারে দিল্লীর শেঠ গদীয়ানগণ বাঙ্গালার সমস্ত রাজস্ব সম্রাটদরবারে উপস্থিত করিতেন। এদিকে মাণিকচাঁদ বাঙ্গালার গদীতে সমস্ত রাজস্ব জমা করিয়া লইতেন। এইরূপে বাঙ্গালার জমিদারদিগের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া দিল্লীতে পৌঁছান পর্য্যন্ত সমস্তই মাণিকচাঁদকে করিতে হইত। সেইজন্য বাঙ্গালার রাজস্বের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।

মুর্শিদ কুলী খাঁর এই সমস্ত বন্দোবস্তের সময় দিল্লীতে বাদসাহ পরিবর্ত্তন ও নানারূপ বিপ্লব উপস্থিত হয়। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আরঙ্গজেবের দেহত্যাগ ঘটিলে তাঁহার পুত্রগণ গৃহবিবাদে উন্মত্ত হইয়া উঠেন। অবশেষে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মোয়াজিম বাহাদুর শাহ উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। বাহাদুর শাহ নবাব আজিম ওশ্মানের পিতা বাহাদুর শাহের সময়েও মুর্শিদ কুলী তিন প্রদেশের দেওয়ানী এবং বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার নায়েব নাজিমী পদেই নিযুক্ত ছিলেন। বাহাদুর সাহের পরে জাহাঙ্গর শাহ, অবশেষে ফারক্ সিয়ার দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭১৩ খৃঃ অব্দে সম্রাট ফরক্ শেরের নিকট হইতে মুর্শিদ দেওয়ানী ও নাজিমী উভয় পদেরই ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। তদবধি তিনি নবাব মুর্শিদ কুলী নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। নবাব মুর্শিদ কুলী দেওয়ানী ও নাজিমী উভয় পদই প্রাপ্ত হইয়া বাঙ্গালার শাসন ও বন্দোবস্তে অধিকতর মনোযোগ প্রদান করিলেন। যদিও নায়েব নাজিমীর সময় হইতেই তিনি অনেকটা স্বাধীন ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন তথাপি অনেক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন। এই সময় হইতে তিনি নির্ভয়ে কার্য্য আরম্ভ করেন। নবাব নিজে উচ্চ পদ পাইয়া

মাণিকচাঁদকেও সম্মানিত করিয়া তুলেন। যদিও ইতিপূর্ব্বে লোকে তাঁহাদিগকে শেঠ বলিত, তথাপি বাদশাহ দরবার হইতে তাঁহারা উহার কোন সনন্দ বা ফার্ম্মাণ প্রাপ্ত হন নাই। বাদশাহ ফরক্ শের ইঁহাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, এবং তাঁহাদের সহিত বাদশাহেরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। যৎকালে বাদশাহ ফারক্‌সিয়ার সিংহাসনপ্রাপ্তির আশায় সৈন্যাদিসংগ্রহের জন্য অর্থাভাব অনুভব করিয়াছিলেন, সেই সময়ে শেঠেরা যথেষ্ট পরিমাণে তাঁহার সাহায্য করেন। এতদ্ভিন্ন বাদশাহ নিজেও মাণিকচাঁদকে বিশেষরূপ অবগত ছিলেন। পিতা আজিম ওশ্মানের ঢাকায় অবস্থিতিকালে শেঠ মাণিকচাঁদের সহিত সম্রাটের প্রথম পরিচয় হয়, তাহার পর ফারখ্ সিয়ার অনেক দিন বাঙ্গলায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন, এই সমস্ত কারণে তিনি মাণিকচাঁদকে উত্তমরূপেই অবগত ছিলেন। মাণিকচাঁদকে উপযুক্ত পাত্র জানিয়া ও নবাব মুর্শিদের অনুরোধ ক্রমে বাদশাহ ফারখ্ সিয়ার ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে (হিজরী ১১২৭) মাণিকচাঁদকে শেঠ উপাধিতে ভূষিত করিয়া যথারীতি ফার্ম্মাণ প্রদান করেন। শেঠ মাণিকচাঁদের উক্ত ফার্ম্মাণ অদ্যাপি জগৎশেঠদিগের নিকট বিদ্যমান আছে। আমরাও যথাস্থানে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলাম।

মুর্শিদ কুলী খাঁ দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হওয়া অবধি বাঙ্গলার রাজস্বসম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সম্পূর্ণ ক্ষমতা না পাওয়ায় অনেক কার্য্য অসম্পূর্ণ ভাবে সম্পাদন করিতে বাধ্য হন। নবাব হইয়া তিনি ইহার আমূল সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। এবিষয়ে শেঠ মাণিকচাঁদ তাঁহার প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। বাঙ্গলার জমিদারসম্প্রদায়ের হস্তে তৎকালে রাজস্ব-আদায়ের ভার ছিল, কিন্তু তাহারা অনেক সময়ে সমস্ত রাজস্বপ্রদানে সক্ষম হইতেন না। মুর্শিদ কুলী খাঁ তাঁহাদের নিকট হইতে রাজস্ব-আদায়ের ভার কাড়িয়া লইয়া কতকগুলি আমীনের হস্তে তাহা প্রদান করেন। এই আমিনী প্রথা তিনি পূর্ব্ব হইতেই ক্রমে ক্রমে প্রচলিত করিতেছিলেন। উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া দুই চারি জন জমিদারের হস্তেও তাহার ভার অর্পিত হইয়াছিল এই সকল জমিদারদিগের মধ্যে নাটোর বা রাজসাহীর, বর্দ্ধমানের, দিনাজপুরের, নদীয়ার ও বিষ্ণুপুরের রাজারাই প্রধান। এতদ্ভিন্ন বীরভূমের জমি-

দারেরও উল্লেখ দেখা যায়। বিষ্ণুপুর কতকটা স্বাধীন ভাবেও কার্য্য করিতেন। ত্রিপুরা ও কুঁচবিহারের স্বাধীন রাজাদিগকে জয় করিয়া তাঁহাদিগকে করদরূপে গণ্য করা হয়। যে সকল জমিদারদিগের রাজস্ব-আদায় হইত না, তাঁহারা ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে আনীত হইতেন; এবং তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করাও হইত; কয়েকজন লোকের প্রতি এই উৎপীড়নের ভার প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে নাজীর আমেদ ও সৈয়দ রেজা খাঁ প্রধান। রেজা খাঁ নবাবের স্বসম্পর্কীয় হওয়ায় তাঁহার ক্ষমতা অসীম হইয়া উঠে। তিনি দুর্গন্ধময় নানা আবর্জ্জনাপূর্ণ এক নরককুণ্ড স্থাপন করিয়া তাহাতে জমিদারদিগকে নিক্ষেপ করিতেন, এবং হিন্দুদিগকে উপহাস করিবার জন্য তাহার 'বৈকুণ্ঠ' আখ্যা প্রদান করেন। যে সমস্ত জমিদারের হস্ত হইতে জমিদারী কাড়িয়া লওয়া হইত, জীবিকার জন্য তাঁহাদিগকে নানকর, বনকর ও জলকর নামে কতকগুলি বৃত্তি প্রদত্ত হইত। কোন স্থানে তাহাদের পরিবর্ত্তে জমি দেওয়ারও ব্যবস্থা ছিল। অনেক উৎপীড়িত জমিদার মুর্শিদাবাদে বন্দী অবস্থায় কাল কাটাইতে বাধ্য হন, নবাব সুজা উদ্দীন তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়া তাঁহাদের প্রতি উৎপীড়নকারী কর্ম্মচারিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন।

রাজস্ব ও শাসন সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করার জন্য নবাব মুর্শিদ কুলী সমস্ত বাঙ্গলা ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করেন। রাজা তোডর মল্লের সময়ে সমস্ত বাঙ্গলা ১৯ সরকারে ও ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত হয়। এক্ষণে তাহা ১৩ চাকলায় ৩৪ সরকারে ও ১৬৬০ পরগণায় বিভক্ত হইয়া ১৪,২৮৮১৮৬৲ টাকা মোট জমা নির্দ্দিষ্ট হইল। এই ১৩ চাকলার মধ্যে হিজলী ও বন্দর বালেশ্বর উড়িষ্যা হইতে গৃহীত। সপ্তগ্রাম, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, যশোহর ও ভূষণা এই পাঁচটি গঙ্গা বা পদ্মার পশ্চিম, এবং আকবরনগর (রাজমহল), ঘোড়াঘাট, কড়াইবাড়ী, জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা), শ্রীহট্ট, ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম), এই ছয়টি পদ্মার উত্তর ও পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। এই সমস্ত বন্দোবস্তের জন্য যে [illegible] হিসাব প্রস্তুত হয় তাহার নাম 'জমা কামেন তুমার'।* উক্ত আসল জমা ব্যতীত মুর্শিদ কুলী খাঁ ২॥ লক্ষ টাকার উপর সবওয়ার বা অতিরিক্ত কর ধার্য্য করিয়া-

* সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহাকে "জমা কামেল তুমারী" এইরূপ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। উৎসাহ সম্পাদক।

ছিলেন।* ১৭২২ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদ কুলি খাঁর উক্ত বন্দোবস্ত কার্য্যে পরিণত হয়। কিন্তু সেই বৎসরই শেঠ মাণিকচাঁদ পরলোকগত হন। তিনি মুর্শিদ কুলীকে এই বন্দোবস্তে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু জমিদারদিগের প্রতি অত্যাচার, উৎপীড়ন তাঁহার কতদূর অনুমোদিত ছিল তাহা আমরা বলিতে পারি না। সম্ভবতঃ তিনি উক্ত পরামর্শের বিরোধী ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। ঐ সমস্ত উৎপীড়ন, অত্যাচার, নবাবের তাদৃশ অনুমোদিত না হইলেও তাঁহার কর্ম্মচারীয়া যে তাহাতে বিশেষরূপ তৎপর ছিল, ইহার অনেক প্রমাণ আছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শেঠ মাণিকচাঁদের সহিত নবাব মুর্শিদ কুলীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। উভয়ে উভয়ের সাহায্য করিতে ত্রুটি করিতেন না। নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর অনুরোধ ক্রমে যেমন বাদশাহ ফারখ্‌সিয়ার মাণিকচাঁদকে শেঠ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন, আবার এরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে মুর্শিদের নবাবিপ্রাপ্তির জন্য নজর, উপঢৌকনাদি প্রদানে যে সমস্ত অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল শেঠ মাণিকচাঁদ অকাতরে তাহার সাহায্য করিয়াছিলেন। নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁ শেঠ মাণিকচাঁদকে যেরূপ বিশ্বাস করিতেন, নিজের পরিবারের মধ্যে আর কাহাকেও সেরূপ করিতেন কিনা সন্দেহ। এই বিশ্বাসের জন্য শেঠ মাণিকচাঁদকে নবাবের কোষাধ্যক্ষেরও কার্য্য করিতে হইত। সরকারী ও নবাবের নিজ অর্থ সমস্তই তাঁহার নিকট গচ্ছিত থাকিত। এইরূপ দেখা যায় যে শেঠ মাণিকচাঁদের নিকট নবাবের নিজের ৫ কোটি (কোন কোন মতে ৭ কোটি) টাকা গচ্ছিত ছিল। এই টাকা প্রত্যর্পিত না হওয়ায় শেঠ বংশীয়দের সহিত মুর্শিদ কুলীর দৌহিত্র নবাব সরফরাজ খাঁর মনোবিবাদ ঘটে বলিয়া শেঠ বংশীয়েরা উল্লেখ করিয়া থাকেন। আমরা যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিব।

এইরূপে মুর্শিদ কুলীর রাজস্ববন্দোবস্তে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া ও নিজের গদীর শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়া শেঠ মাণিকচাঁদ ১৭২২ খৃষ্টাব্দে নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করেন। তিনি নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র ফতেচাঁদকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ বলেন যে ফতেচাঁদ তাঁহার ভাগিনেয়। ধনবাই নাম্নী তাঁহার

* Grant's Analysis of Bengai Finunce.

এক ভগিনীর সহিত বারাণসীর শেঠ উদয়চাঁদের বিবাহ হয়, ফতেচাঁদ তাঁহাদেরই কনিষ্ঠ পুত্র। এই ফতেচাঁদই প্রথমে জগৎ শেঠ উপাধি প্রাপ্ত হন, আমরা পরে সে বিষয়ের উল্লেখ করিব। মহিমাপুরের পরপারে 'দয়াবাগ' নামে মনোহর উদ্যানে শেঠ মাণিকচাঁদের স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হয়। অনেক দিন পর্য্যন্ত সেই উদ্যানটি শোভা বিস্তার করিয়া ভাগীরথীতীর আলোকিত করিত। কয়েক বৎসর হইল, সেই উদ্যানের সহিত স্মৃতিস্তম্ভটিকেও ভাগীরথী গর্ভস্থ করিয়াছেন। মাণিকচাঁদের নির্ম্মিত মহিমাপুরের বাটীরও অধিকাংশ তাঁহার গর্ভস্থ। যৎকিঞ্চিৎ ভগ্নাবশেষ আজিও তাঁহার নাম স্মৃতিপথে আনিয়া দেয়। তাঁহার বিশেষ যত্নের সামগ্রী মুর্শিদাবাদ টাঁকশালেরও সামান্যমাত্র চিহ্ন আছে। দুই এক বৎসর পরে তাহাও ধরণীপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবে।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

শেঠ মাণিকচাঁদের ফার্ম্মান।

পরমেশ্বরের নাম
(লাল কালীতে)

(দস্তখত লাল কালীতে)

মহম্মদ মইনুদ্দীন
আলমগীর শানী
ফারখ সাএর
বাদসাহ গাজী
ফার্ম্মান আবুল
মজফ্ফর।

(গোল মোহর)
ঈশ্বরের নাম

১১ পুত্র গীরণ সাহ
১২ পুত্র আমীর তৈমুর সাহেব কেরান
১ পুত্র সাহ আলম বাদসাহ
২ পৌত্র আলমগীর বাদসাহ
৩ পৌত্র সাজাহান বাদসাহ
৪ পৌত্র জাহাঙ্গীর বাদসাহ
৫ পৌত্র আকবর বাদসাহ
৭ পৌত্র হুমায়ুন বাদসাহ
৮ পৌত্র বাবর বাদসাহ
৮ পুত্র উমর সেখ সাহ
৯ পুত্র সুলতান আবু সৈয়দ সাহ
১০ পুত্র সুলতান মহম্মদ সাহ

১১২৫
মহম্মদ ফারখ সাএর, পুত্র আজিমুশ্বান, আবুল মজফ্ফর মইনুদ্দীন আলমগীর শানী। বাদসাহ গাজী সন আহদ।

এই জয় ও মঙ্গলযুক্ত সময়ে এই মহামান্য ও বিশ্বাসযোগ্য আদেশপত্র দ্বারা মাণিকচান্দ, এই চিরস্থায়ী রাজ্য হইতে মাণিকচান্দ শেঠ খেতাব প্রাপ্ত হইলেন। অধিকৃত রাজ্যের সমুদয় বর্ত্তমান ও ভাবী হাকিম, আমলা ও মুৎসুদ্দী প্রভৃতির উচিত যে, তাঁহারা উল্লিখিত ব্যক্তিকে শেঠ লেখেন। ইহাতে বিশেষ যত্ন লওয়া আবশ্যক, এবং হুজুর আলি হইতে তাগিদ জানেন। ইতি তারিখ ৮ জিলহজ্জ তৃতীয় সন জলুস।

(পরপৃষ্ঠার লেখা)।

যিনি মহামান্য রাজ্যের ন্যায়াধারস্বরূপ, যিনি সাম্রাজ্যের বিশ্বাসনীয়, সম্ভ্রান্তবংশীয়, উচ্চপদস্থ ও ক্ষমতাপন্ন, যিনি রাজ্যের ও ধনের সুবন্দোবস্তকারী, যিনি তরবারি ও লেখনী-পরিচালনে সুনিপুণ, যিনি পতাকার উন্নয়নে সমর্থ, যিনি সুবন্দোবস্তকারী নিরপেক্ষ উজীর, যিনি সাম্রাজ্যের দুরূহ ব্যাপারের অবলম্বনস্বরূপ, যিনি উজীরগণের মধ্যে বিশ্বাসী ও বন্ধু, সেই মিনুদ্দৌলা বাহাদুর জাফর জঙ্গ শেপা সালারের সেনানিবেশ বরাবরেষু।

(মোহর)
মহম্মদ ফারখ
সাএর বাদসাহ গাজী
খালা দুল্বাহ শেপা সালার,
ইয়ার বাওফা ফিদরি কুতবল
মুল্ক এমিনুদ্দৌলা সৈয়দ
আবদ খাঁ বাহাদুর
জাফর জঙ্গ। *

---

* আমরা শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ের নিকট বাদশাহ ফরখ শায়ারের মোহরের যে প্রতিলিপি দেখিয়াছি তাহাতে মধ্যচক্রে আজিমুশ্বানের পুত্র ফরখ শায়ারের নাম ও তাহার চারি পার্শ্বে চক্রাকারে দক্ষিণ হইতে বামাবর্ত্তে ক্রমশঃ তৈমুর ও তাঁহার পুত্র, পৌত্র ইত্যাদি ক্রমে শাহ আলম পর্য্যন্ত নাম খোদিত আছে—সমস্ত মোহরটি চক্রাকার ও তৎসংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র চক্রে সর্ব্বোপরি ঈশ্বরের নাম। মোহর দেখিলেই কাহার পুত্র কে তাহা বুঝা যায়। অক্ষয় বাবু বলেন 'বাদশাহ ফরখ শায়ার লাল কালীতে দস্তখত করিতেন না, তিনি কোরমার ঝোলে অঙ্গুলি ডুবাইয়া তদ্দ্বারা সনন্দ নিশানী করিতেন। এইরূপ অপূর্ব্ব দস্তখত রাজসাহীতে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।' উ, স

অহল্যা।

প্রথম প্রেমের মৃদু বিকাশের মত,
বসন্ত অনিল আসি, সরমে বিব্রত
ধরণীরে ধীরে ধীরে করিয়া চুম্বন,
দীর্ঘ হিম-নিদ্রা ভাঙ্গি করায় চেতন;
চারিদিকে ফুলে, ফলে, পল্লবে, মুকুলে
ওঠে ভরি, যেন দুটি স্নেহহস্ত তুলে
অন্নপূর্ণা আশীর্ব্বাদ করেন সন্তানে,
বকুলের বাসপূর্ণ নির্জ্জন কাননে;
রাগ রক্ত রক্তাশোক তরুর ছায়ায়
পাষাণী পড়িয়া আমি অনন্ত নিদ্রায়।

অনন্ত নিদ্রায়? হা রে উন্মাদ হৃদয়!
কোথা নিদ্রা? অনন্ত এ জাগরণে ময়
অনন্ত যন্ত্রণা। নাহি দৃষ্টি এ নয়নে,
পাষাণী, শকতি নাই শুনিতে শ্রবণে,
পরশ-শকতি-হীন দুখানি এ কর,
চরণ চলিতে নারে, ফুটে নাতো স্বর
বিবশ এ রসনায়; কিন্তু ওরে মন,
অচেতন দেহে তুই চিরসচেতন।
পশে নাই নাসিকায় বকুলের ঘ্রাণ,
পরশিছে প্রাণে মোর; করেছি নির্ম্মাণ
শব্দ, ঘ্রাণ, শত মূর্ত্তিময়ী বসুন্ধরা,
আমার হৃদয়-মাঝে; জ্যোৎস্না-অম্বরা
সুখময়ী নিশি যবে পশে এ কাননে
দেহে নাহি অনুভব, পরশয়ে মনে।

বসন্তের বিরহেতে আকুল অন্তর
বরষা-আকাশ ঝরে ঝর ঝর ঝর;
নাহি অশ্রু এ আমার পাষাণ-নয়নে,
বহে তীব্র রক্তস্রোত নিভৃত পরাণে।
চপলা চমকি যায় হৃদয়-আকাশে,
কেতকীর গন্ধ মাখি সমীরণ আসে,
কণা তার প্রাণে ভাসে, অনুভবে বুঝি
বসন্ত ফুরায়ে বর্ষা দেখা দিল আজি।
জগতের লোক দেখে অশোকের তলে,
পাষাণপ্রতিমা সিক্ত হতেছে সলিলে।

একদা প্রভাতে, জলদের আবরণ
করি ছিন্ন, শরতের কনক তপন
দেখা দিল পূর্ব্বাকাশে গন্ধ মাখি অঙ্গে
শেফালির, কামিনীর, সলিলতরঙ্গে
নাচিতে নাচিতে বায়ু দেখা দিল আসি,
পূর্ণ সরোবর, উচ্ছ্বসিত বারিরাশি,
তবু স্থির; কূলে কূলে করে ঢল ঢল
বন-মাঝে তটিনীর সলিল তরল,
সুখপূর্ণ উচ্ছ্বসিত হৃদয় যেমন।
শ্যাম শস্য-শোভা-বিভূষিত এ কানন,
সেই দুর্ব্বাদলদলে (সম্মুখে তটিনী)
রৌদ্রতপ্ত প্রস্তরপ্রতিমা একখানি।

পীত শস্য শীর্ষে ধরি হিমমুক্তা গলে,
হেমন্ত আসিয়া যবে এই বনস্থলে
করেন প্রবেশ, পশে অন্তরে আমার
যেন তাঁর পদধ্বনি, শস্যগন্ধ আর।
মনে পড়ে আমার সে সাধের কুটীর,

সম্মুখেতে প্রবাহিতা ক্ষীণা তটিনীর
মৃদু সে কল্লোলধ্বনি; পক্ক শস্য লয়ে,
সরলা কৃষকাঙ্গনা দাঁড়াতো আসিয়ে
উপহার দিত মোরে। কাশ পুষ্পরাশি
থাকিত চৌদিকে শুভ্র সৌন্দর্য্য বিকাশি।
গৃহকাজ শেষ করি দিবা-অবসানে
বসিতাম যবে আসি কুটীর প্রাঙ্গণে
দেখিতাম দূরে মূর্ত্তিমান দিবাকর,
চন্দ্রসম স্নিগ্ধ হাস্য, প্রফুল্ল অধর
যেন রক্ত শতদল, সেই স্নিগ্ধ দৃষ্টি
হৃদয়ে আমার যেন অমৃতের বৃষ্টি।
প্রভু মোর ধ্যানভঙ্গে ফিরিছেন গৃহে,
সম্মুখে আমারে দেখি কত প্রেমে স্নেহে
সুধাতেন কত কথা; হায় আজো জ্বলে
পাষাণমূর্ত্তির প্রাণ সে স্মৃতি-অনলে।

শব্দময়ী সুখময়ী অয়ি বসুন্ধরে,
দে মা, মুক্তি একবার মুহূর্ত্তের তরে,
শিলাবদ্ধ মাগো এই বিদীর্ণ হৃদয়,
বিদীর্ণ; তবু তো প্রাণ নাহি বাহিরায়;
দে মা, মুক্তি একবার মুহূর্ত্তের তরে,
বদনে ফুটুক ভাষা, উঠি নীলাম্বরে
বিদীর্ণ-হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রতিধ্বনি সনে
দিকে দিকে ভেসে যাক্ পবন-স্বননে
পাষাণ-প্রতিমা আমি খণ্ড খণ্ড হয়ে
রুদ্ধ এ জীবন মোর যাক্ বাহিরিয়ে।

শ্রীসরলাবালা দাসী।

প্রাদেশিক সমিতি।

(ঢাকা-যাত্রা)।

প্রাদেশিক সমিতির নাটোর অধিবেশন বোধ হয় কাহারও স্মৃতি হইতে অপসৃত হয় নাই। বিগত বর্ষের ১২ই জুন তারিখে অধিবেশনের শেষ দিনে সভার কার্য্যসমাপ্তির কিঞ্চিন্মাত্র পূর্ব্বে যে প্রলয় ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার মহাভীতির মধ্যে বাবু হেমচন্দ্র রায় সমাগত প্রতিনিধিগণকে বর্ত্তমান বর্ষে ঢাকায় সম্মিলিত হইতে সাদরে আহ্বান করেন। বঙ্গের বড় দুর্দ্দিনে ঢাকার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলাম, ঢাকা অধিবেশনের উজ্জ্বল চিত্রে তাহার সার্থকতা লাভ করিয়াছি।

প্রাদেশিক সমিতির বাৎসরিক অধিবেশন ক্রমে বহরমপুর, কৃষ্ণনগর ও নাটোরে সম্পাদিত হইয়াছিল। আশা ছিল, বাঙ্গলার অপরাপর জেলার প্রতিনিধিসংখ্যা ন্যূনাধিক হইলেও উক্ত তিন জেলা হইতে ঢাকা কন্‌ফারেন্সে আশানুরূপ প্রতিনিধি প্রেরিত হইবে। বহুবিধ কঠিন সমস্যাপূর্ণ বিষয় এবৎসর লোকের চিত্ত আন্দোলিত রাখিয়াছিল, আশা ছিল বাঙ্গলার প্রধান প্রধান নেতা সকলেই ঢাকায় উপস্থিত হইবেন। এই ক্ষুদ্র আশা কতদূর ফলবতী হইয়াছে পাঠকগণের বোধ হয় তাহা অবিদিত নাই।

রাজসাহী হইতে প্রায় ১০ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে অন্ততঃ ৫ জনের ঢাকায় যাওয়া সম্বন্ধে প্রথমে কোন সন্দেহ ছিল না। শেষোক্ত দলের মধ্যে আমি ও আমার একটি স্বনামখ্যাত বন্ধুও ছিলেন।

৩০শে মে সমিতির কার্য্যারম্ভ হইবে স্থির ছিল। ২৮শে মে শনিবার প্রাতে আমি ও আমার পূর্ব্বোক্ত বন্ধুটি স্থানীয় ষ্টীমার ঘাটে উপস্থিত হইলাম। ভরসা ছিল অপরাপর প্রতিনিধির সহিত তথায় মিলিত হইয়া সকলে একত্রে ঢাকা যাত্রা করিব। জাহাজ আসিতে বিলম্ব হইল, ক্রমে ৫টা বাজিয়া গেল, কিন্তু আমাদের সহযোগী প্রতিনিধির মধ্যে কাহারও সাক্ষাৎ পাইলাম না। অগত্যা আমরা দুটি ক্ষুদ্র প্রাণী মহরমের ছুটি উপলক্ষে গৃহযাত্রী কয়েকটি বন্ধুর

সহিত জাহাজে চাপিয়া পদ্মার স্রোতে ভাসিয়া চলিলাম। সেদিন জাহাজেই রাত্রি কাটাইতে হইল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে দামুকদিয়াঘাট পহুঁছান ঘটিল না। পর দিন প্রাতে ৮টার সময় তথায় উপস্থিত হইলাম।

তৎপূর্ব্বেই পথিমধ্যে আর একজন নূতন সঙ্গী জুটিয়া গিয়াছিলেন, তিনি অন্য এক জেলার আমাদের সমব্যবসায়ী, কার্য্যোপলক্ষে রাজসাহী আসিয়াছিলেন এবং ঘটনাক্রমে আমাদের সহিত একত্রেই জাহাজে চাপিয়াছিলেন। ঢাকায় যাওয়ার তাঁহার কোন অভিসন্ধিই ছিল না, বরং এসম্বন্ধে আমাদের প্রস্তাবে অনেক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, যুক্তিতে তাঁহার কোন আপত্তিই টিকিল না। তাঁহার অপারগতা সম্বন্ধে তিনি যে যে কারণ নির্দ্দেশ করিলেন তাহার সকল গুলিই তর্কে অতি অকিঞ্চিৎকর প্রতীয়মান হইল। বন্ধু নিরুপায় হইয়া ঢাকাযাত্রায় আমাদের সঙ্গী হইলেন। অবশ্য আমাদের এই জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনব্যাপারে আমাদের নূতন সঙ্গীর বিশেষ সহানুভূতি ছিল নতুবা নানাবিধ বিঘ্ন সত্ত্বেও তাঁহার চিত্ত ঢাকাদর্শনে আকৃষ্ট হইত না। যাহা হউক উপস্থিত ব্যাপারের আলোচনায় আমার মনে হইয়াছিল আমাদের মধ্যে অনেকেরই পক্ষে সমিতির কার্য্যে যোগদান করিবার আপত্তি কাল্পনিক মাত্র। সামান্য ত্যাগস্বীকার করিলেই আমাদের অধিকাংশ আপত্তি ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে!

আমরা তিন জন কন্‌ফারেন্সযাত্রী বেলা ১০টার গাড়ীতে দামুকদিয়া হইতে রওনা হইয়া বেলা প্রায় ৫টার সময়ে গোয়ালন্দ পৌহুঁছিলাম। গাড়ীতে "বন্দে মাতরং" ও "অয়ি ভুবনমনোমোহিনি" গীতের মধুর সুললিত সুর শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাজবাড়ী ষ্টেশনে ঘুম ভাঙ্গিল। কিছুক্ষণ পরেই গোয়ালন্দ আসিয়া গাড়ী হইতে নামিলাম। নামিয়াই দেখি সম্মুখে পদ্মা আপনার সদাচঞ্চল বিশাল দেহ বিস্তার করিয়া পড়িয়া আছে; অগণিত বাষ্পীয় পোত তাহার বক্ষে ভাসিতেছে, দূরে শ্রেণীবদ্ধ তরণী গর্ব্বিণী রাজহংসীর ন্যায় শুভ্রপক্ষে ভর দিয়া স্রোতের প্রতিকূলে উড়িয়া চলিয়াছে!

গোয়ালন্দেই সে রাত্রি কাটাইবার বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইলাম। বুঝিলাম প্রথম দিনের সভাসন্দর্শনসুখ আমাদের ভাগ্যে ঘটিল না। নিরাশ হৃদয়ে অভ্যর্থনা কমিটীর নিকট তারযোগে ব্যাপার জানান হইল। ইহা যে বৃথা হয় নাই তাহা পরে বুঝিয়াছিলাম।

৩০শে প্রত্যুষে কাছাড় ষ্টিমারে রওনা হইলাম। জাহাজে আরও একজন নূতন প্রতিনিধি জুটিলেন। প্রকৃতির অপরূপ রূপমহিমা সন্দর্শন করিতে করিতে বেগে ছুটিয়া চলিলাম। চতুষ্পার্শে বেগবতী স্রোতস্বিনী বাহু প্রসারিত করিয়া কল কল রবে ছুটিয়া চলিয়াছে, দূরে নদীবক্ষে দুইটি ক্ষুদ্র মানবমূর্ত্তি কয়েক খণ্ড কাষ্ঠ মাত্র আশ্রয় করিয়া স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে; কূলে কূলে অসংখ্য গ্রাম নগর নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। কি সুন্দর শোভা! পূর্ব্ববঙ্গ প্রধানতঃ নদীপ্লাবিত দেশ; কতবার বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী, শীতলাক্ষীর অনন্ত শোভা চাহিয়া দেখিয়াছি—দেখিতে দেখিতে প্রাণমন পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে!

ক্রমে বেলা ১২টা উত্তীর্ণ হইলে নদীর ক্রোড়দেশ ভেদ করিয়া চলিতে চলিতে নাতিদূরে নারায়ণগঞ্জের শুভ্র সুন্দর সৌধরাজি দৃষ্টিগোচর হইল। ট্রেণ ছাড়িবার পূর্ব্বেই তথায় পহুঁছিতে পারিব জানিয়া কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে হৃদয় পরিপ্লুত হইল, ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা আমার সাধ্যাতীত।

ট্রেণ ছাড়িবার কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই জাহাজ ঘাটে ভিড়িল। নদীকূলসংলগ্ন কাষ্ঠের উপর একই রকমের কাল রঙ্গের পোষাকে সজ্জিত হইয়া ভলণ্টিয়ারদল সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন। আমাদিগের পরিচয়প্রাপ্তিমাত্র তাঁহারা শশব্যস্তে সযত্নে আমাদের জিনিষপত্র স্কন্ধে করিয়া লইয়া চলিলেন; আমাদের অসংখ্য নিষেধবাক্য অরণ্যে রোদনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। আমরা গাড়ীতে উঠিবার পরক্ষণেই গাড়ী ছাড়িল। একজন ভলাণ্টিয়ারের নিকট শুনিলাম বেলা ১২টার সময় সভা বসিবে স্থির ছিল, সেই দিন প্রাতে আমাদের তারের সংবাদ আসার সময় পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। বেলা ২॥টার সময় সমিতির কার্য্য আরম্ভ হইবে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ঢাকায় পহুঁছিব জানিয়া আমরা একেবারে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইব স্থির করিলাম। অধিবেশনের উদ্বোধন আমাদের হস্তচ্যুত হইতেছিল, অভ্যর্থনা কমিটীর অনুগ্রহে তাহা হইল না দেখিয়া তাঁহাদিগকে হৃদয়ের সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। নারায়ণগঞ্জ ষ্টেশনে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য "ব্লাক কোট" আখ্যাত নূতন ভলাণ্টিয়ার রেজিমেণ্ট প্রেরিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ ঢাকার ভলাণ্টিয়ারদল প্রধানতঃ শিখ ও গুর্খা এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। সাদর সম্ভাষণের মধ্য

দিয়া গাড়ী ছুটিয়া চলিল। আমাদের দুই পার্শ্বে সারি সারি গ্রাম, গ্রামের প্রান্তভাগে দাঁড়াইয়া দুই একটি বিস্ময়বিহ্বলা রমণীমূর্ত্তি। গ্রামের পর বিস্তৃত প্রান্তর, প্রান্তরক্রোড়ে ক্ষুদ্র শাখা নদী; নদীকূলে কয়েকটি মেষ ও গাভি চকিতনেত্রে গাড়ীর প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। নিকটেই একটি রাখাল বালক হস্তস্থিত যষ্টি অবলম্বন করিয়া ঈষৎ বঙ্কিমভাবে দাঁড়াইয়া আছে। ক্রমে পূর্ব্বাকাশ নীলাভ নিবিড় কৃষ্ণবর্ণের মেঘমালায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। মেঘাড়ম্বরের মধ্য দিয়া অবিরাম গতিতে আমরা গন্তব্য স্থানে অগ্রসর হইতেছি। আজ যেন সকলই নূতন দেখিতেছি, বোধ হইতে লাগিল, কি এক অভিনব স্বপ্নরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। বেলা তিন টার সময় ষ্টেশনে গাড়ী আসিল।

ষ্টেশনে অভ্যর্থনা কমিটির একজন সভ্য ও আর কয়েক জন ভলাণ্টিয়ার উপস্থিত ছিলেন। কমিটির সভ্য মহাশয় আমার একজন পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধু। ষ্টেশনে ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া ভলাণ্টিয়ারের সহিত আমরা চারি জন মণ্ডপগৃহাভিমুখে ছুটিলাম। সে সময় অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল। ভলাণ্টিয়ার আপন সাজে সজ্জিত হইয়া দণ্ড ও পতাকা হস্তে গাড়ীর কোচ বক্সে উপবেশন করিয়াছিলেন। রাস্তায় মহরমের যাত্রিপূর্ণ আর একখানি গাড়ী দৃষ্টিগোচর হইল। তাহার কোচ বক্সেও বিচিত্র সাজে সজ্জিত দণ্ড পতাকাধারী ব্যক্তি দেখিলাম। উভয়ের সাদৃশ্য ও বৈষম্যমহিমা মানসপটে চিত্রিত হইয়া উঠিল। সভাগৃহে পৌঁহুছিবার পূর্ব্বেই প্রবলবেগে বারিধারা পতিত হইতে লাগিল। ঝঞ্ঝাবাত ও বৃষ্টির মধ্য দিয়াই আমরা ক্রাউন থিয়েটারগৃহে উপস্থিত হইলাম। ভলাণ্টিয়ার সাহায্যে মণ্ডপ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম সুসজ্জিত থিয়েটারহল দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ। সম্মুখে মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি মাননীয় গুরুপ্রসাদ সেন সমাগত প্রতিনিধিগণকে স্বাগত সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতেছিলেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

ভূ-গর্ভ।

ভূগর্ভস্থ পদার্থের রূপ কি? কঠিন, তরল অথবা বাষ্পীয়? কিংবা ইহাদিগের মধ্যবর্ত্তী অন্য কোনরূপ অবস্থা?

পদার্থ সকলের ঘনত্ব অনুসারেই রূপ হইয়া থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা ঘন পদার্থ কঠিন, তদপেক্ষা ন্যূন ঘনত্বে তরল, এবং তদপেক্ষা ন্যূন ঘনত্ব হইলে বাষ্পীয় অবয়ব হয়। পরমাণু সকলের সন্নিবেশ অনুসারে ঘনত্ব উৎপন্ন হয়। উহারা যতই পরস্পরের সহিত অধিকতর নিকট সন্নিবিষ্ট থাকে ততই ঘনত্বও অধিক হয়। অন্য প্রকারে বলিতে গেলে, এরূপও বলা যায় যে পরমাণুগণ পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইতে যতই বাধা পায়, ততই সে পদার্থকে ঘন বলা যায়, অর্থাৎ বিপ্রকর্ষণ শক্তি যত কম, ঘনত্ব তত বেশী। কঠিন পদার্থ সকলের পরমাণুগণের বিশ্লিষ্ট হইবার পক্ষে বাধা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; অর্থাৎ তাহারা "গড়ায়" না। তরল পদার্থ সকলের পরমাণুগণ সহজেই পরস্পর বিশ্লিষ্ট হয়; সুতরাং উহারা সহজেই গড়াইয়া যাইতে পারে; এবং বাষ্পীয় পদার্থ সকলের পরমাণুগণ পরস্পর এতই বিশ্লিষ্ট যে বিশেষ চাপ না দিলে উহার ঘনত্ব উৎপাদন করা যায় না।

আবার যে পদার্থ এক অবস্থায় কঠিন তাহাই অন্য অবস্থায় তরল ও বাষ্পীয় হইতে পারে। এইরূপ অবস্থাপরিবর্ত্তন প্রধানতঃ উত্তাপ ও চাপ দ্বারা সাধিত হয়। কঠিন পদার্থকে তাপ দ্বারা তরল, ও তরল পদার্থকে তাপ দ্বারা বাষ্পীয় করা যায়। কিন্তু যে পরিমাণ তাপে একটি তরল বস্তুকে নিম্ন স্থানে বাষ্পাবয়ব করা যায়, তদপেক্ষা কম তাপেই ঐ বস্তুকে উচ্চ পর্ব্বতশিখরে বাষ্পাবস্থা করা যাইতে পারে। নিম্ন স্থান হইতে উচ্চ স্থানে বায়ুর চাপ কম; সুতরাং উত্তাপও কম আবশ্যক হয়। ফলতঃ ইহা পরীক্ষা দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে যে পদার্থ সকলের রূপান্তর করিতে হইলে তাপ ও চাপ উভয়ের প্রতিই দৃষ্টি রাখিতে হয়। চাপ অতিরিক্ত হইলে রূপান্তর কার্য্যে তাপও অতিরিক্ত আবশ্যক হইবে; তাহা না হইলে ঐ কার্য্য অপেক্ষাকৃত কম উত্তাপেই সাধিত হইবে

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে পদার্থের রূপ উহার পরমাণু সকলের অল্পাধিক ঘনত্বের প্রতি নির্ভর করে। আবার সেই ঘনত্ব, তাপ ও চাপের উপর নির্ভর করিতেছে। বেশী উত্তাপে ঘনত্বের হ্রাস, ও বেশী চাপে ঘনত্বের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই তথ্য গণিতের ভাষায় অল্পাক্ষরে এইরূপে লেখা যায়।

$$ঘ \propto \frac{চা}{তা}$$

অর্থাৎ ঘনত্ব চাপের সহিত সম অনুপাতে হ্রাসবৃদ্ধি হয়; এবং তাপের সহিত বিপরীত অনুপাতে হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

এক্ষণে দেখা যাউক ভূগর্ভের অবস্থা কিরূপ। পৃথিবী গোলাকার। উহার ব্যাস প্রায় ৮০০০ মাইল। অর্থাৎ ক খ রেখার পরিমাণ ৪০০০ হাজার ক্রোশ।

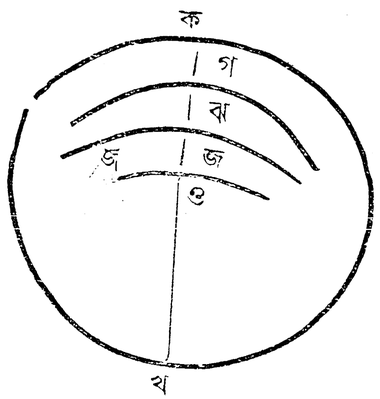

ও জ = কঠিন
জ ঝ = তরল
ঝ গ = প্রায় দ্রব
গ ক = কঠিন

ক গ (প্রায় ২৫।৩০ মাইল নিম্ন পর্য্যন্ত) ভূ-পঞ্জর বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ এই পরিমাণ স্থান পরিদৃশ্যমান মৃণ্ময় অথবা প্রস্তরময় অবস্থায় আছে। ইহারই মধ্যে এবং উপরে জীবগণ বাস করিতেছে। 'ও' চিহ্নিত স্থান ভূকেন্দ্র। ইহার চতুঃপার্শ্বস্থ পদার্থের অবস্থা কিরূপ, ইহাই আলোচ্য বিষয়।

কূপাদি খননকালে দেখা যায় যে উপর হইতে যতই নীচে যাওয়া যায় ততই পৃথিবীর মৃণ্ময়ভাগ ভিন্ন ভিন্ন স্তরবিন্যস্ত; এবং ঊর্দ্ধ হইতে অধঃস্তরে তাপ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে প্রায় ৩০ গজ পরিমাণ নিম্নে গেলে এক ডিক্রী তাপ বেশী হয়। কিন্তু অধিক নিম্নে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়ম স্থির থাকে কিনা বলা যায় না; সম্ভবতঃ থাকে না। যাহা হউক ৩০ গজে যদি এক ডিক্রী তাপ বৃদ্ধি হওয়া বিবেচনা করা যায় তবে 'ও' পর্য্যন্ত ৪০০০ হাজার মাইল নিম্নে তাপের পরিমাণ যে অত্যন্ত অধিক হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, সম্ভবতঃ কোন পদার্থই তাদৃশ তাপে কঠিন অথবা তরল

অবস্থায় থাকিতে পারে না। কারণ তাপবৃদ্ধিতেই ঘনত্বের হ্রাস, সুতরাং অন্য কোন কারণ না থাকিলে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারিত যে ভূগর্ভস্থ পদার্থের অবস্থা বাষ্পীয়; এবং অতীব সূক্ষ্ম বাষ্পীয়, ইহাও বলিতে ইতস্ততঃ হইত না। কিন্তু এস্থলে আর একটি কারণ বশতঃ এই অবস্থা সংঘটনের বাধা উপস্থিত হইতেছে। সে কারণ চাপ। আমরা দেখিয়াছি যে চাপের আধিক্যে ঘনত্বের বৃদ্ধি। ক্রমে উপর হইতে নীচে ভূগর্ভ মধ্যে যতই প্রবেশ করা যায়, ততই ভিন্ন ভিন্ন স্তরের চাপ একত্রিত হইয়া চাপসমষ্টি বৃদ্ধি করে। ক অপেক্ষা গ স্থানে উপরস্থ মাটির চাপ বেশী, তদপেক্ষা "ও" স্থানে আরও বেশী,—এইরূপ। এইরূপে অনুমিত হইয়াছে যে ভূমধ্য দেশে প্রতি বর্গ ইঞ্চি স্থানে ন্যূনাধিক ৫৬২,৫০০ মন চাপ পড়িতেছে। এই কারণ বশতঃ ভূগর্ভস্থ পদার্থ অত্যন্ত ঘনীভূত ও কঠিন অবস্থাপন্ন হইবে। কিন্তু তাপের অধিক্যহেতু ঐ পদার্থ অতীব বাষ্পীয় অবস্থাপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং দুই প্রধান কারণবশতঃ দুই বিপরীত ফল হওয়া সাব্যস্ত হইতেছে।

ইহার অর্থ কি? এই দুই বিপরীত কারণে প্রকৃত অবস্থা কিরূপ হইবে? যুগপৎ কঠিন ও তরলাবস্থা হইতে পারে না। অবশ্যই ইহার মধ্যবর্ত্তী কোন রূপ অবস্থা হইবে সন্দেহ নাই, সে অবস্থা কি?

কঠিন ও তরলের মধ্যবর্ত্তী নানারূপ অবস্থা আছে, এবং তরল ও বায়বীয় অবস্থার মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা আছে। কাদামাটির অবস্থা—না কঠিন, না তরল। আবার জল ধূমে পরিণত হয়, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বাবস্থা (Critical state, সংযোগাবস্থা) না তরল না বায়বীয়। যে সকল মৃণ্ময় ও ধাতুময় পদার্থে পৃথিবী গঠিত তাহারা কেহই ভূগর্ভস্থ অত্যন্ত অধিক চাপপীড়নে, (অতিমাত্র উত্তাপ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও) বাষ্পীয় অবস্থাপন্ন হইতে পারে না।

সুতরাং কঠিন ও তরল এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী কোন অবস্থাই ভূগর্ভের প্রকৃত অবস্থা। কিন্তু তরল ও কঠিন অবস্থার সংযোগস্থলে (Critical state) তাপ ও চাপ অনুসারে উভয়ের মধ্যে কিছুই প্রভেদ থাকে না। তদ্রূপ তরল অবস্থাকেও কঠিন, কঠিন অবস্থাকেও তরল বলা যায়। উহা বিবেচনা ও কল্পনাশক্তি অতিক্রম করিতে পারে। কিন্তু তাদৃশ অবস্থা বিশ্বে বিদ্যমান

আছে। তাপাধিক্যবশতঃ পদার্থের পরমাণুগণের পরস্পর বিপ্রকর্ষণ-শক্তি যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আবার চাপের আধিক্যহেতু ঐ শক্তি ততই নিবারিত ও দমিত হইতেছে। অন্য প্রকারে বলিতে গেলে এইরূপ বলা যায় যে এক কারণে কঠিন পদার্থের গড়াইবার শক্তি বাড়িতেছে অর্থাৎ তরলত্ব পাইতেছে, অন্য কারণে উহার গড়াইবার শক্তি লোপ হইতেছে অর্থাৎ ঘন হইতেছে। এস্থলে তরলতা কাঠিন্যে, এবং কঠিনতা তারল্যে পরিণত হইতেছে। এই অবস্থায় তরলে কঠিনে কিছুই প্রভেদ নাই।

কিন্তু ঐ উভয় শক্তির সমতা হইলেই ঈদৃশ ফল উৎপন্ন হইবে। নচেৎ একের আধিক্য হইলেই ফলেরও তারতম্য হইবে। যদি তাপের ফল অপেক্ষা চাপের ফল অধিক হয়, তবে অবস্থাও তরল অপেক্ষা কঠিনের দিকেই একটু অধিক থাকিবে, অর্থাৎ ঐ পদার্থ (Critical state) তরল-কঠিনের সংযোগাবস্থা হইতে কঠিনের দিকেই কিঞ্চিৎ অগ্রসর থাকিবে। প্রকৃত পক্ষেও বোধ হয় চাপের ক্রিয়া তাপের ক্রিয়া অপেক্ষা অতিরিক্ত ফলোৎপাদন করে। তবেই ভূগর্ভের অবস্থা কঠিন ও তরলের সংযোগাবস্থার নিকটকর্ত্তী পূর্ব্বাবস্থা।

কিন্তু ক্রমে ভূমধ্য হইতে যত উপরে উঠা যায়, ততই চাপ ও তাপ দুইই কমিতে থাকে। এবং চাপ তাপ অপেক্ষা অনুপাতে অধিক হ্রাস হওয়ায় ভূমধ্যদেশের কিছুদূর উপরে অর্থাৎ "জ" চিহ্নিত স্থানে কঠিন ভাব অপেক্ষা তরল ভাবেরই আধিক্য হইবে, কারণ চাপে ঘনত্ব এবং তাপেই তরলতা হয়। সুতরাং তথায় পদার্থের তরলাবস্থা। আবার ঝ গ এই স্থান মধ্যে কোথাও তাপের ক্রিয়া চাপ অপেক্ষা অনুতাপে অধিক হ্রাস হওয়ায় পদার্থের ঘনতা অথবা কাঠিন্যের শেষাবস্থা গ ক স্থানে। ইহা দ্বারা দেখা যাইবে যে ঝ ক স্থান একটি তরল পদার্থের উপর ভাসমান রহিয়াছে। উহার নিম্নে ভূগর্ভের কঠিনাবস্থাপন্ন পদার্থ বিদ্যমান আছে।

শ্রীশশধর রায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

নব্যভারত।

(বৈশাখ)

নব্যভারত ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। বর্ষারম্ভের প্রথম প্রবন্ধ 'কি চাই কি পাই'। সম্পাদক মহাশয় এই প্রবন্ধে তাঁহার বিগত পঞ্চদশ বর্ষের আশা, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি এই পঞ্চদশ বর্ষের অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছেন যে 'শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের আদর কমিতেছে, ধনের আদর বাড়িতেছে, বিশ্বাস ভক্তি অন্তর্হিত হইতেছে, সংসারজ্ঞান বৃদ্ধি পাইতেছে।' তিনি চাহিয়াছেন স্বর্গ পাইয়াছেন নরক, চাহিয়াছেন আন্তরিকতা পাইয়াছেন বাহ্যাড়ম্বর, চাহিয়াছেন দেবত্ব পাইয়াছেন পশুত্ব, কি তীব্র অভিজ্ঞতা!—বর্ত্তমানকে মন্দ বলা, অতীতকে পূজা করা ও ভবিষ্যতে স্বর্ণযুগ কল্পনা করা মানুষের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রবন্ধলেখকও তাহার হাত এড়াইতে পারেন নাই। যদি প্রকৃতপক্ষে আমরা ক্রমে অবনতির পথে যাইতেছি ইহাই সত্য হয়, তবে আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা ও আদর্শের আমূল সংস্কার, অথবা কাহারও কাহারও মতে কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব ব্যতীত উত্থানের আশা আছে কি? শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের 'বিলাসে বিনাশ' প্রবন্ধটি ক্রমশঃ চলিতেছে। ক্রমশঃপ্রকাশ্য প্রবন্ধ শেষ না হইলে সমালোচনা চলে না—তবে যতদূর বুঝা যাইতেছে তাহাতে প্রবন্ধটি সারবান ও সুখপাঠ্য হইবে আশা করা যায়। প্রবন্ধ ক্রমে শুষ্ক হইয়া না পড়ে সে জন্য লেখক মহাশয় নায়িকা আনিবেন, আভাস দিয়াছেন। বিলাসের ব্যাখ্যাটা আরও একটু পরিষ্কার করিতে পারিলে ভাল হয়। 'একান্নভুক্ত' শীর্ষক প্রবন্ধে নূতনত্ব কিছু দেখিলাম না, সকল বিষয়েরই ভালমন্দ দুই দিক আছে; প্রবন্ধলেখক কেবল এক দিকটাই দেখিয়াছেন। তাঁহার মতে একান্নভুক্ত পরিবার দরিদ্রতার আবাসভূমি, কিন্তু ইহাও কি ঠিক নহে যে দরিদ্রতার তীব্র কষাঘাত হইতে অনেকেই রক্ষা পাইত না যদি এ দেশে একান্নভুক্ত পরিবারপ্রথা না থাকিত? লেখক মহাশয় একস্থানে বলিয়াছেন 'একান্নভুক্ত পরিবারের বালক বালিকার শিক্ষা সকল সময় সম্ভব নহে', কিন্তু আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে

একান্নভুক্ত পরিবারমধ্যে জন্মিয়াছে বলিয়াই, অনেক বালক বালিকা শিক্ষার অবসর পাইয়াছে, বড় হইয়াছে, নচেৎ সংসারে গুরুভারগ্রস্ত হইয়া আজন্ম মূর্খ থাকিত। আর একটি কথা এই যে বঙ্গদেশ হইতে একান্নভুক্ত পরিবার-প্রথা উঠাইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালীর অনেক সামাজিক আচারব্যবহারের পরিবর্ত্তন আবশ্যক নয় কি? আত্মনির্ভরতার ও আত্মসম্মানের আমাদের অভাব আছে বলিয়া কেবল একান্নভুক্ত পরিবারপ্রথাই তাহার জন্য দায়ী নহে, বাঙ্গালীর সমাজ ও স্বভাবও অনেকটা দায়ী। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী 'বঙ্কিম চন্দ্র' শীর্ষক প্রবন্ধের সূচনা করিয়া আশা দিয়াছেন যে চরিত্রচিত্রাঙ্কনে তিনি বঙ্কিম বাবুর যে যে দোষ দেখিয়াছেন তৎসম্বন্ধে বারান্তরে 'কোমল ভাষায় দুইএক কথা' বলিবেন। 'বিলাতে বড় দিন' প্রবন্ধ এবার শেষ হইয়াছে। অন্যান্য দশ কথার মধ্যে ইংরেজেরা সামাজিক আচারব্যবহার বিষয়ে কিরূপ রক্ষণশীল ও কুসংস্কারাবদ্ধ তাহা এ প্রবন্ধ পড়িলে অনেকটা বুঝা যায়। আমাদের সামাজিক আচারব্যবহারাদি উঠাইয়া দিতে উপদেশ দিবার সময় কিন্তু ইংরেজেরা উদারনৈতিকের এক শেষ। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ লিখিত 'দেবগৃহে কথোপকথন' বেশ মনোরম হইয়াছে। চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ানের 'স্বদেশ প্রত্যাগমন' শীর্ষক প্রবন্ধটি মন্দ হয় নাই। এ সংখ্যায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন কবিতা নাই। দুই একটি কবিতা প্রকাশ না করিলেই যেন কবির ও সম্পাদকের গৌরব বহাল থাকিত।

পূর্ণিমা।

(বৈশাখ)

নববর্ষের "পূর্ণিমা" নূতন উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মর্ম্মগাথা রচয়িত্রী "এমনি সপ্তমে বীণা বাজুক আমার" বলিয়া নব বর্ষের আহ্বান-সূচক কবিতা লিখিয়া পুরাতন বর্ষের বিদায় চাহিবার সময়ে অনেক ''বুকভাঙ্গা দগ্ধ অশ্রুর'' (!) কথা লিখিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় ''আত্মকথায়'' লিখিয়াছেন,—"বাঙ্গলা সংবাদপত্র পড়িবার লোক থাকিতে পারে কিন্তু বাঙ্গলা মাসিকপত্রের পাঠক নাই। কাট্‌তি না থাকিলে মাল যায় কোথায়? নহিলে বাঙ্গালার মাসিকপত্র টিকিল না কেন?" সহযোগীর কথার আভাসে মনে হয়

বুঝি পাঠকেরই অপরাধের অন্ত নাই! কিন্তু বাঙ্গালা মাসিকপত্র যেরূপ ভাবে লিখিত ও সম্পাদিত হয় তাহা কি কিয়ৎপরিমাণেও 'কারণ' বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত নহে? শ্রীআবদুল করিম "অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী" দিয়া কানু ফকিরের একটি 'হকিয়ত' প্রকাশিত করিয়াছেন, এবং তা শেষ ছত্র 'গলেতে বাজিল প্রেমলাস' টীকাসংযোগে বিশদ করিবার লিখিয়াছেন,—"প্রেম লাসা-প্রেম লা; প্রেমের ফাঁস।" লাসা লাক্ষা শব্দের অপভ্রংশ নয় কি? শিকারীরা এখনও আঠা দিয়া পক্ষী শিকার করে ও গ্রাম্যভাষায় তাহাকে 'লাসা' বলিয়া থাকে। এবারকার 'পূর্ণিমায়' ৺সুরেন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের একখানি ছবি প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু পত্রমধ্যে কুত্রাপি তাঁহার প্রসঙ্গ দেখিতে পাইলাম না!

ভারতী।

(বৈশাখ)

বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীর সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়াছেন। দেশীয় সংবাদপত্রের পক্ষে আজ কাল বড় দুঃসময় পড়িয়াছে, রাজপুরুষবর্গের কুটিল কটাক্ষে, কোন কোন সংবাদপত্র-সম্পাদকের কারা-দণ্ডে ও প্রচলিত রাজবিধির অভিনব সংস্কারে লোকের মন এমন অবসন্ন া পড়িয়াছে যে আর মুখ ফুটিয়া হৃদয়বেদনা প্রকাশ করিতেও প্রবৃত্তি ীন। রাজাকে ভাল বাসি ভক্তি করি ও নিরন্তর উন্নতি কামনা করি াই ত তাঁহার নিকট প্রাণের বেদনা প্রকাশ করিতে চাই। তাহাকে দ্রোহ বলিয়া আমাদের দুঃখদৈন্যের করুণ ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া আমা-ক দণ্ডদান করিতে হইলে দুঃসময় ভিন্ন আর কি বলিতে পারি। াই দুঃসময়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়া একটি কবিতা লিখিয়া ভারতীর বাচন' করিয়াছেন। দেখিয়া সুখী হইলাম যে কবিবর নিতান্ত পড়িয়াও গন্তব্যপথ পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার 'দুঃসময়' ক কবিতাটি সেই জন্য বড়ই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। তিনি আমাদিগকে এমন দুঃসময়ে আশার সঙ্গীত শুনাইবার জন্য গাহিয়াছেন :—

উর্দ্ধ আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি
ইঙ্গিত করি তোমাপানে আছে চাহিয়া,

নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছ্বলি
শত তরঙ্গে তোমা পানে উঠে ধাইয়া,
বহু দূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি
এস এস সুরে করুণ মিনতি-মাখা,
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা!

এবারকার ভারতীতে 'প্রসঙ্গ কথা' সমেত দ্বাদশটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 'দুরাশা' গল্পটি বেশ হৃদয়গ্রাহী ও কৌতুহলদীপক। ভাষাও বেশ উজ্জ্বল ও মধুর। 'কণ্ঠরোধ' সিডিস্যান বিল পাশ হওয়া উপলক্ষে লিখিত। 'বৃটিশ গায়েনা' একটি ভ্রমণবৃত্তান্ত, ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। 'ঐতিহাসিক ম্যালিসন' প্রবন্ধটি অতি সুন্দর হইয়াছে। ম্যালিসনের ইতিহাসে বিশ্বাস-যোগ্যতাগুণের অভাব আছে এই উক্তি যে সম্পূর্ণ অলীক তাহা এই প্রবন্ধে পরিষ্কার রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। 'বঙ্গভাষা' প্রবন্ধে বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের সুবিস্তৃত আলোচনার সূচনা করা হইয়াছে। 'ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক বঙ্গসাহিত্যসেবকগণকে দেশীয় ইতিহাসসংকলনে উদাসীন দেখিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন ও ইতিহাসসংকলনের পন্থা নির্ণয় করিয়াছেন। 'দিল্লীর চিত্রশালিকা' প্রবন্ধটির ভাষা ও বর্ণনা উভয়েতেই বাহাত্বরী আছে।

সাহিত্য।

(মাঘ)

এসংখ্যার নয়টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জলধর সেনের 'মস্থরী পথে' শীর্ষক ভ্রমণবৃত্তান্তটি সুখপাঠ্য হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'এলফিন্সো ডোডে' প্রবন্ধে বিখ্যাত ফরাসী উপন্যাসলেখক ডোডের জীবনচরিত ও তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার আলোচনা করা হইয়াছে। প্রবন্ধটি সুন্দর হইয়াছে। 'রাজা টোডর মল্ল' প্রবন্ধে টোডর মল্লের বীরত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। অক্ষয় বাবুর 'রাণী ভবানী' ক্রমশঃ চলিতেছে। 'বাঙ্গলার ইতিহাসে বৈকুণ্ঠ' কালীপ্রসন্ন বাবুর একটি সুন্দর ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। কোন

কোন ইংরাজ ও মুসলমান ঐতিহাসিক মুর্শিদ কুলী খাঁকে জমিদারপীড়ক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, লেখক দেখাইয়াছেন যে এরূপ দোষারোপ করিবার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।

প্রদী[…]।

[…]র মূল।

(বৈশা[…] […]মাধ

প্রদীপ ক্রমেই উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে। এ সংখ্যার সকল প্রবন্ধগুলিই সুন্দর ও সারবান। শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্তের 'বৃহস্পতির কলঙ্ক' একটি সুন্দর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। অক্ষয় বাবু 'হালওয়েল মনুমেন্ট' লিখিয়া এমন একটি ঐতিহাসিক সত্য উদ্ধার করিয়াছেন যাহার জন্য প্রত্যেক বঙ্গবাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইবেন সন্দেহ নাই। 'শ্রীবিলাসের দুর্ব্বুদ্ধি' গল্পটি মন্দ হয় নাই; শ্রীবিলাস ও সরোজবাসিনীর দুর্ব্বুদ্ধির ফলভোগ আর একটু দীর্ঘ হইলে যেন ভাল হইত। 'সিরাজদ্দৌলা' প্রবন্ধ অক্ষয় বাবুর প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক চিত্র সিরাজ-দ্দৌলার সমালোচনা। সমালোচনাটি বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। পলাশিযুদ্ধের সমালোচনা আমাদের নিকট কিন্তু অবস্থাবিবেচনায় তীব্র বোধ হয় নাই। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের জীবনী বেশ শিক্ষাপ্রদ। 'প্রবাসের সুখ' শ্রীযুক্ত জলধর সেনের লেখা। প্রবন্ধটি ভাল হয় নাই। 'বিদায়' কবিতাটি কবি রবীন্দ্রনাথের রচনা। ইহার ভিতর দিয়া 'বাঁধন ছিঁড়িবার' ভাব সম্যক্ পরিস্ফুট হইলেও কিসের জন্য 'বাঁধন ছিঁড়িতে' হইবে তাহা তেমন অভিব্যক্ত হয় নাই। সংসারবৈরাগ্যে কেহ সন্ন্যাসী হয়, কেহ বা প্রগাঢ় প্রেমে নূতন ভাবে সংসারী হইয়া থাকে। সেবার জন্য বিদায়—এত দিনের উৎসবময় বিলাসলালসাপূর্ণ নন্দনবনের নিকট বিদায়—মঞ্জুর করা যাইতে পারে, কিন্তু সংসারের নিকট বিদায় লইয়া হাত পা গুটাইবার জন্য বিদায় নামঞ্জুর। কবি ইঙ্গিতে অর্দ্ধোক্ত ধ্বনিতে তাহার আভাস দিবার জন্য বলিয়াছেন,—

বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর!
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর!

কিসেরি বা সুখ, ক'দিনের প্রাণ,
ঐ উঠিয়াছে সংগ্রাম-গান,
অমর মরণ রক্ত-চরণ
নাচিছে সগৌরবে।
সময় হয়ছে নিকট এখন
বাঁধন অন্ধ ত হবে!

বামাবোধিনী।

(বৈশাখ)

এবারকার বামাবোধিনীর পত্রিকার 'শোকোচ্ছ্বাস' প্রবন্ধটি অতি সুন্দর হইয়াছে। 'একজাতিত্ব' প্রবন্ধটি ক্রমশঃ চলিতেছে। 'আদর্শ হিন্দু পরিবার' প্রবন্ধটি স্ত্রীলোকের পাঠের ঠিক উপযুক্ত হইয়াছে। 'বামা রচনা' কবিতা কয়েকটিও মন্দ হয় নাই।

শ্রীভবানীগোবিন্দ চৌধুরী।

প্রাপ্ত গ্রন্থ।

অদ্বৈতপ্রকাশ।

শ্রীকেশবলাল রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত; মূল্য ৸০। শ্রীহট্টের অন্তর্গত সুনামগঞ্জ সবডিভিসনে লাউড় পরগণায় নবগ্রামে অদ্বৈতাচার্য্যের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কুবের পণ্ডিত, মাতার নাম লাভা ঠাকুরাণী। নবগ্রাম এখন বিজন প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু সেকালে তৎপ্রদেশে দিব্যসিংহ নামক হিন্দুরাজার রাজধানী ছিল; কুবের পণ্ডিত তাঁহারই প্রধান মন্ত্রী বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। অদ্বৈতদেবের পূর্ব্বাশ্রমের নাম কমলাক্ষ। কমলাক্ষ অল্প বয়সেই সাহিত্য অভিধান অলঙ্কার ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করিয়া অসাধারণ তর্কশক্তিপ্রভাবে স্বজন-বান্ধবগণকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। একদা কুবের পণ্ডিত পুত্রকে কালিকামূর্ত্তিসম্মুখে প্রণত হইবার জন্য আদেশ করায় কমলাক্ষ তর্ক তুলিয়াছিলেন :—

"——— শুন পিতা না করহ রোষ।
একনিষ্ঠ না হইলে হয় বহু দোষ॥
যৈছে বৃক্ষমূলে জল করিলে সেচন।
শাখাপল্লবাদ্যে হয় তৃপ্তির সাধন॥
তৈছে সর্ব্ব দেবদেবীর মূল নারায়ণে।
পূজিলে সকল পূজা হয় সমাধানে॥
বিষ্ণুমায়া ভগবতী বহিরঙ্গা বলে।
যাঁহার মায়াতে জীব তত্ত্বজ্ঞান ভুলে॥
প্রাণিহিংসা-যজ্ঞে যেই হয় উল্লসিত।
সে দেবীর উপাসনা না হয় উচিত॥
তেঁহ যদি জগন্মাতা জগৎ তাঁর পুত্র।
সন্তান বধিতে কিবা আছে যুক্তিশাস্ত্র॥"

দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমে বিদ্যাশিক্ষার্থ কমলাক্ষ শান্তিপুরে আগমন করেন এবং বিবিধ বিদ্যা অধিকার করিয়া শান্তিপুরেই জীবন যাপন করেন। পিতা মাতা অপত্যবাৎসল্যবিমুগ্ধচিত্তে তাঁহার নিকট আসিয়া গঙ্গাতীরেই অবস্থান করিতেন। জরাপলিত দিব্যসিংহও শান্তিপুরে আসিয়া অদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া কৃষ্ণদাস নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

অদ্বৈতের শিক্ষায় রাজা ফকির হইল, বিষয়ী বিষয়ানুরাগ বিসর্জ্জন করিল, যৌবনজলতরঙ্গতাড়িত যুবকদল শম দমের শিক্ষালাভে ভগবদ্ভক্ত হইয়া উঠিল;—ইহাতে অদ্বৈতাচার্য্যের কথা উত্তরোত্তর দেশরাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

দিব্যসিংহ "বাল্য লীলাসূত্র" নামে অদ্বৈতের বাল্যজীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। অদ্বৈতের শিষ্যানুচর ঈশাননাগর তদবলম্বনে ও প্রত্যক্ষ ঘটনাবর্ণনে অদ্বৈত প্রকাশ নামক সুললিত বৈষ্ণবগ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ 'ঈশান নাগরের কড়চা' নামে পরিচিত। ঈশান বলেন :—

"চৌদ্দ শত নবতি শকাব্দ পরিমাণে।
লীলা গ্রন্থ সাঙ্গ কৈনু শ্রীলাউড় ধামে॥"

ইহা এত দিন মুদ্রিত হয় নাই বলিয়া সর্ব্ব সাধারণের অপরিজ্ঞাত ছিল। ভাষাপ্রয়োগকৌশলে, ভাববিন্যাসব্যাপারে, বৈষ্ণবধর্ম্মান্দোলনের আদি

কাহিনীকীর্ত্তনে 'অদ্বৈত প্রকাশ' একখানি বৈষ্ণবারাধিত সুললিত ভক্তি-রসাত্মক পুরাতন গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত এবং সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই আদরের বস্তু।

অনুরাগবল্লী।

শ্রীমন্মনোহর দাস প্রণীত। মূল্য ছয় আনা। ইহাও একখানি পুরাতন বৈষ্ণবগ্রন্থ। শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্যানুশিষ্য মনোহর দাস দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচনা করেন।

"রাম বাণাশ্ব চন্দ্রাদিমিতে সংবৎসরে গতে।
বৃন্দাবনান্তরে পূর্ণাযাতানুরাগবল্লিকা॥"

এই সংস্কৃত শ্লোকানুসারে ১৭৫৩ শকে 'অনুরাগ বল্লী' রচিত হওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকার সংস্কৃতসাহিত্যে সুপরিচিত, বাঙ্গলা পদরচনায় সুনিপুণ এবং স্থানে স্থানে কবিজনোচিত সৌন্দর্য্যবিকাশে সিদ্ধহস্ত।

মালা।

শ্রীকৃষ্ণগোপাল চক্রবর্ত্তিপ্রণীত। মূল্য ছয় আনা 'মালাকার নূতন ব্রতী হইলেও পুষ্পচয়ন ও মালাগ্রন্থনবিষয়ে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা আছে'—প্রকাশক মহাশয় বিজ্ঞাপনারম্ভে এই কথাগুলি না লিখিলে বিশেষ ক্ষতি ছিল না।

অশ্রুমালা।

ইহাও উক্ত নূতন ব্রতীর লিখিত ক্ষুদ্র কাব্য। ইহাতে স্থানে স্থানে লিপি-কৌশলের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'তৃতীয় অশ্রু' তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ-স্থল।

অঞ্জলি।

ইহাও অশ্রুমালার কবির লেখনীপ্রসূত। বাঙ্গালায় বহু কবির অভ্যুদয় হইয়াছে, কিন্তু সকলেই বিষাদকাহিনী গান করিতেছেন। ইহাতে আর কিছু না হউক, গানগুলি নিতান্তই একঘেয়ে হইয়া উঠিতেছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কবিতারচনায় ক্ষমতা নাই তাহা নহে—সে ক্ষমতা বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট হইলেই ভাল হয়।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

মাতার আহ্বান।

একবার তোমার দুয়ারে দাঁড়ায়ে
ফুকারিয়া ডাক জননি!
প্রান্তরে তব সন্ধ্যা নামিছে
আঁধার হইছে ধরণী।
ডাক "চলে আয়, তোরা কোলে আয়,"
ডাক সকরুণ আপন ভাষায়!
সে বাণী হৃদয়ে করুণা জাগায়,
বেজে উঠে শিরা ধমনী,
হেলায় খেলায় যে আছে যেথায়
সচকিয়া উঠে অমনি।

আমরা প্রভাতে নদী পার হ'নু,
ফিরিনু কিসের দুরাশে।
উষ্ণ ধান্য অঞ্চলে লয়ে
ঢালিনু জঠর-হুতাশে!
খেয়া বহেনাকো, চাহি ফিরিবারে,
তোমার তরণী পাঠাও এ পারে,
আপনার ক্ষেত গ্রামের কিনারে
পড়িয়া রহিল কোথা সে!
বিজন বিরাট্ শূন্য সে মাঠ
কাঁদিছে উতলা বাতাসে!

কাঁপিয়া কাঁপিয়া দীপখানি তব
নিবু-নিবু করে পবনে,
জননি, তাহারে করিয়ো রক্ষা
আপন বক্ষঃ-বসনে!
তুলি ধর ত ি দক্ষিণ করে,
তোমার ল ট যেন আলো পড়ে,
চিনি দূর হতে, ফিরে আসি ঘরে,
না ভুলে আলেয়া-ছলনে!
এ পারে দুয়ার রুদ্ধ জন
এ পর-পুরীর ভবনে।
তোমার বনের ফুলের গন্ধ
আসিছে সন্ধ্যাসমীরে।
শেষ গান গা হে তোমার কোকিল
সুদূর কুঞ্জতিমিরে।
পথে কোন ে ছ নাহি আর বাকী,
গহন কাননে তাঁহা ছে জোনাকী,
আকুল অশ্রু ভরি দুই আঁখি
উচ্ছ্বসি উঠে অধীরে।
"তোরা যে আমার" ডাক একবার
দাঁড়ায়ে দুয়ার-বাহিরে!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হেষ্টিংসের শিক্ষানবিশী।

(০)

এক সময়ে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের নামে এদেশে এবং বিলাতে শত ধিক্কার ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। এখন তাহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহাকে কলঙ্কমুক্ত মহাপুরুষ সাজাইবার জন্য কত নূতন নূতন ইতিহাস ও জীবনচরিত লিখিত হইতেছে।

লাইওনেল জেমস্ ট্রটার এই ে একখানি নূতন জীবনচরিত রচনা করিয়াছেন। বার্ক ও সেরিডানের বক্তৃতায়, মিল ও থরণটনের ইতিহাসে, মেকলের সুলিখিত ঐতিহাসিক সন্দর্ভে হেষ্টিংসের যে সকল কলঙ্ককাহিনী লোকসমাজে সর্ব্বজনপরিচিত হইয়াছে, তাহার অলীকত্ব প্রতিপাদন করাই বর্ত্তমান গ্রন্থখানির মুখ্য উদ্দেশ্য।

ইহা অবশ্যই ইংরাজি ভাষায় লিখিত। কিন্তু গ্রন্থনিবদ্ধ অধিকাংশ কথাই ভারতবর্ষের কথা। বিদেশের প্রতিভাশালী লেখকসম্প্রদায় আমাদের সুখ দুঃখের কথা কিরূপ ভাবে বর্ণনা করিয়া থাকেন, তাহা জানিতে কাহার না কৌতূহল হয়?

ইংলণ্ডের অন্তর্গত চর্চ্চহিল পল্লীতে ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের জন্ম হয়। ইংরাজবণিক্‌সমিতির ওমরাহে সরকাররূপে এ দেশে পদার্পণ করিয়া, হেষ্টিংস কালক্রমে ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথম গবর্ণর জেনারেল হইয়া, ত্রয়োদশ বৎসর বৃটীশ ভারতসাম্রাজ্যের শাসনভার পরিচালনা করিয়া, উত্তর-কালে সপ্তবর্ষব্যাপী অশ্রুতপূর্ব্ব বিচারাভিনয়ে বিড়ম্বিত হইয়া, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ইতিহাসে পড়িয়াছি,—"ক্লাইবের বীরবাহু ভারতবর্ষে যে রাজ্যবিস্তারের সূত্রপাত করিয়াছিল, হেষ্টিংসের শাসনকৌশল সে রাজ্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ও সুদূরবিস্তৃত মহাসাম্রাজ্যে পরিণত করে; তজ্জন্য হেষ্টিংসের স্মৃতি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।" তিনি অন্তিমকালে কোম্পানী বাহাদুরের নিকট যে আবেদনপত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে "কোম্পানীর, ইংলণ্ডের এবং ভারতবর্ষের কল্যাণকামনাই যে তাঁহার জীবনের শেষ প্রার্থনা" তাহাও

সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হইয়াছিল! * এরূপ ঐতিহাসিক চিত্র অবশ্যই ধীর ভাবে আলোচনা করিবার যোগ্য।

হেষ্টিংস দরিদ্রের সন্তান। শৈশবে মাতৃহীন হইয়া পিতৃত্যক্ত অনাথ বালক † কখন পিতামহ কখন বা পিতৃব্যের স্নেহানুরাগে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত লালিত পালিত ও শিক্ষিত হইয়া উদরান্নের জন্য সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সে দুঃখদৈন্যের করুণকাহিনী যথার্থই মর্ম্মস্পর্শ করে! হেষ্টিংসের প্রতিভা ছিল। তিনি কোলম্যান্, কাউপার, লর্ড সেল-বোরণ ও ইলাইজা ইম্পে প্রভৃতি প্রতিভাশালী বৃটীশবালকবৃন্দের সহাধ্যায়ী হইয়াও বিদ্যালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। প্রাণে না জানি কত আশা জাগিয়া উঠিয়াছিল! শৈশবের উদ্দাম হৃদয়ের উন্মত্ত কল্পনা না জানি কত সুখের চিত্র অঙ্কন করিতেছিল; ঋণদায়ে পিতৃ পিতামহের বাস্তু ভিঁটাখানিও বিক্রীত হইয়া গিয়াছিল; তাহার উদ্ধার সাধন করিয়া তাহাকে সুখের নন্দনকানন সাজাইবার জন্য কত স্বপ্নই না মোহজাল বিস্তার করিতেছিল! এমন সময়ে তাঁহাকে উদরান্নের জন্য বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হইল। শিক্ষক তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে উদ্যত, আবশ্যক হইলে স্বয়ং ব্যয়ভার বহন করিতেও প্রস্তুত, ঠিক এইরূপ সময়েই হেষ্টিংসকে আবেদনপত্রহস্তে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দ্বারস্থ হইতে হইল!

একজন স্বজাতিবৎসল ইংরাজলেখক বহুযত্নে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জীর্ণ দপ্তর হইতে এই আবেদন পত্রখানি খুঁজিয়া বাহির করিয়া বহুব্যয়ে তাহার প্রতিলিপি প্রকাশিত করিয়াছেন। বালক হেষ্টিংসের স্বহস্তলিখিত

* "My latest prayers shall be offered for their service; and for the welfare of my beloved country; and for that also of the lond. Whose interests were so long committed to my partial guardianship."—Trotter's Warren Hastings, a Biography, 378.

† হেষ্টিংস মাতৃহীন হইবার পর তাঁহার পিতা কিছুদিনমাত্র তাঁহাকে লালন পালন করেন, পরে তিনি একটি কশাই কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া আমেরিকাভিমুখে প্রস্থান করায় মাতৃহীন বালক পিতৃত্যক্ত হইয়া পিতামহের স্কন্ধে নিপতিত হন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার পিতামহের অবস্থাও সচ্ছল ছিল না।—উৎসাহ সম্পাদক।

আত্মকাহিনী বলিয়া আবেদন পত্রখানি অদ্যাপি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে! *

হেষ্টিংস্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গুদাম সরকার হইয়া ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে উপনীত হন। যুবক হেষ্টিংস্ উদরান্নের জন্য যে পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহার বার্ষিক বেতন পাঁচ পাউণ্ড মাত্র;—তৎকালে ভারতবর্ষে তাহার মূল্য পঞ্চাশ টাকা!

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কত অল্প বেতনে কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতেন, তাহা এখন অলীক স্বপ্নকাহিনী বলিয়া মনে হয়। কোথায় ইংলণ্ড, আর কোথায় ভারতবর্ষ! সে কালে উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া এ দেশে আসিতে ছয় মাস অতীত হইয়া যাইত। এ দেশে আসিয়াও জলবায়ুর প্রকোপে, কুসংসর্গের প্রলোভনে অনেকেই অল্পদিনের মধ্যে পঞ্চত্ব লাভ করিত। তথাপি লোকে বার্ষিক পঞ্চাশ টাকার গুদামসরকারির জন্য এতদূর লালায়িত হইত কেন?

বেতন যাহাই হউক, উপরি পাওনার অন্ত ছিল না;—সে কথা কর্ত্তৃপক্ষীয়ের অগোচর ছিল না। তাঁহারা বরং সেই জন্যই এত অল্প বেতন প্রদান করিতেন! যাঁহারা এইরূপ যৎসামান্য বেতনে ভারতবর্ষে পদার্পণ

* To the Hon'ble the Court of directors of the United East India Company.

The humble petition of Warren Hastings aged about sixteen years and upwards

Showeth

That your petitioner has been bred up to writing and Accounts and being very desirous of serving your Honours as a Writer in India

He therefore humbly prays your Honours will please to entertain him in that station which he promises to dicharge with the greatest Diligence and Fidelity and is ready to give such security as your Honours shall require.

And your Honours petitioner (as in duty bound) shall ever pray

Warren Hastings.

করিতেন, অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাদের নবাবী চাল চলনে লোকের চমক লাগিয়া যাইত।* তাঁহাদের দ্বারে দ্বারবান, অশ্বশালে অশ্বচতুষ্টয়, ভোজন সময়ে সুললিত বাদ্যোদ্যম তাঁহাদের সৌভাগ্যগর্ব্বের পরিচয় প্রদান করিত।* বিলাতের লোকে এই জন্য ইঁহাদিগকে 'নবাব' বলিয়া উপহাস করিতেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইহার জন্য কত শাসন গর্জ্জন করিতেন। কিন্তু তাঁহারা বহুদূরে, আর তাঁহাদের কর্ম্মচারিগণ ভারতবর্ষের বিলাসলালসার প্রবলাবর্ত্তে বিঘূর্ণিতমস্তক। সুতরাং শাসন গর্জ্জনে ফল হইত না। ইংরাজমাত্রেই এ দেশে আসিয়া গুপ্তবাণিজ্যে ধনোপার্জ্জন করিবার জন্য প্রাণপণে আয়োজন করিতেন। বার্ষিক পঞ্চাশ টাকার বেতন উপলক্ষমাত্র, কোন রূপে এ দেশে আসিয়া ধনোপার্জ্জন করাই লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজেরা তজ্জন্য একজন না একজন কৃষ্ণকায় সহচর সংগ্রহ করিয়া লইতেন, এবং তাহার নামে ও তাহার যোগেই সমস্ত ধনোপার্জ্জনের কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ করিতেন। হেষ্টিংস্ এ জন্য যাঁহার শরণাগত হইয়াছিলেন তাঁহার নাম কৃষ্ণকান্ত। তিনি বাঙ্গলার ইতিহাসে কাশিমবাজাররাজবংশের আদিপুরুষ "কান্ত বাবু" নামেই সমধিক পরিচিত।

সেকালে কোম্পানীর অধীনে যে সকল পদ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহার সর্ব্ব নিম্ন পদে বার্ষিক পঞ্চাশ টাকা বেতনের গুদামসরকার, তদূর্দ্ধে বার্ষিক ১৫০ টাকা বেতনের কুঠিয়াল, তদূর্দ্ধে বার্ষিক ৩০০ টাকা বেতনের ছোট সাহেব ও ৪০০ টাকা বেতনের বড় সাহেব। কেবল ইংরাজ গভর্ণরের বেতন ছিল—বার্ষিক তিন সহস্র মুদ্রা!

হেষ্টিংস্ এ দেশে আসিয়া অল্পদিনের মধ্যে কাশিমবাজারের ইংরাজকুঠিতে গুদামসরকার হইয়াছিলেন। সেকালে কাশিমবাজারের ইংরাজকুঠি সবিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজেরা একটি ছোট খাট কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়া নিরুদ্বেগে বাণিজ্যব্যাপারে অর্থোপার্জ্জন করিতেন, এবং সময়ে সময়ে নবাবদরবারের পাত্রমিত্রগণকে উৎকোচ উপঢৌকন দিয়া আত্মকার্য্য সাধন করিতেন। হেষ্টিংসকে এই সময়ে দাদনের খাতাপত্র লইয়া ব্যস্ত থাকিতে

* Complaints were already heard in England of the extravagance of young fellows, who sat to dinner with a band of music, and rode about in a carriage and four.—Trotter's Warren Hastings: a Biography.

হইত, সর্ব্বদা এ দেশের লোকের সঙ্গে আদান প্রদানের কার্য্যে নিবিষ্ট হইতে হইত, এবং আবশ্যক হইলে নানা আড়ং পরিভ্রমণ করিয়া কোম্পানীর মালপত্র সংগ্রহ করিতে হইত। এই কার্য্যে দেশের লোকের সহিত মিলিত হইয়া হেষ্টিংস এ দেশের তৎকালপ্রচলিত ভাষাসমূহ শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন,—ইহাই তাঁহার পদোন্নতির প্রথম সোপান।

দুই বৎসরের মধ্যেই হেষ্টিংস একজন কার্য্যকুশল কর্ম্মচারী বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহাকে কাশিমবাজারের ইংরাজদরবারের সদস্যপদে নিয়োগ করা হইল। এই পদে অভিষিক্ত হইবার অব্যবহিত পরেই বঙ্গ-বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে ইংরাজবণিকের মনোমালিন্য ঘনীভূত হইয়া যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। কাশিমবাজার গেল, কলিকাতা গেল,—ইংরাজ নরনারী পলায়ন করিয়া ফল্‌তার বন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; সহসা বাঙ্গলা দেশের গ্রাম নগর হইতে ইংরাজের নাম বিলুপ্ত হইয়া গেল!

ট্রটার এই বিপ্লবকাহিনী যেরূপ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা মার্সম্যান সাহেবের ইতিহাসের চর্ব্বিতচর্ব্বণ মাত্র! তিনি বলেন, বাঙ্গলায় যেখানে যে কোন ইংরাজকুঠি ছিল সমস্তই লুণ্ঠিত হইয়াছিল, এবং অন্ধকূপে একটি মাত্র ইংরাজমহিলা পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাকেও সিরাজদ্দৌলার অন্তঃপুরের সেবাদাসী হইতে হইয়াছিল! ইহা যে অতিশয়োক্তি মাত্র সৌভাগ্যক্রমে ইংরাজেরাই তাহার প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন।

সিরাজদ্দৌলা কলিকাতা অবরোধ করিবার পূর্ব্বেই ঢাকা, জগদীয়া, বলেশ্বর প্রভৃতি মফঃস্বলস্থ ইংরাজকুঠির গোমস্তাগণকে তহবিলপত্র কুক্ষিগত করিয়া পলায়ন করিবার জন্য পত্র লিখায় তাঁহারা পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিলেন।* হলওয়েল যে রমণীর অন্ধকূপকক্ষে বন্দিনী হইবার কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার নাম বিবি কেয়ারী; তিনি যে আদৌ ইংরাজমহিলা ছিলেন না এবং কদাপি মোগলের অন্তঃপুরে পদার্পণ করেন নাই, তাহা বষ্টিড্ লিখিত কলিকাতার পুরাকীর্ত্তি বিষয়ক পুস্তকে সবিশেষ লিখিত রহিয়াছে!†

* Hastings MSS.

† Busteed's Echoes from Old Calcutta.

ট্রটারের পুস্তকে প্রকাশ যে, এই বিপ্লবে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস কারারুদ্ধ হইয়া দিনাজারদিগের কৃপায় জামিনে মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু মুর্শিদাবাদের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি ইতিহাসবিদ্ বিভারিজ সাহেব বলেন যে, কাশিমবাজার অবরোধের সময়ে যে সকল ইংরাজ দুর্গ হইতে পলায়ন করেন, সম্ভবতঃ হেষ্টিংস তাঁহাদেরই একজন। * এ দেশের জনশ্রুতিও সেইরূপ। এই বিপ্লবে হেষ্টিংস ও ডাক্তার ফোর্থ ভিন্ন মুরশিদাবাদ অঞ্চলের সকল ইংরাজই ফল্‌তাভিমুখে পলায়ন করিয়াছিলেন; হেষ্টিংস কাশিমবাজারেই অবস্থান করিতেছিলেন। জগৎশেঠপ্রমুখ পাত্রমিত্রগণ সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য যে সকল ষড়যন্ত্র করিতেছিল, হেষ্টিংস তাঁহাদের দরবারে যাতায়াত ও তথ্য সংগ্রহ করিয়া ফল্‌তায় তৎসংবাদ প্রেরণ করিতেন। হেষ্টিংসের লিখিত এই সকল পত্রের মধ্যে দুই একখানি পত্র এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায়। †

যাহা হউক, এই বিপ্লব সময়েই হেষ্টিংসের প্রথম বিবাহ হইয়াছিল। এ বিষয়ে হেষ্টিংসের বিশেষ সৌভাগ্য ছিল বলিয়াই বোধ হয়। তিনি যে সময়ে ফলতায় পলায়িত ইংরাজ নরনারীর সহিত গোপনে পরামর্শ করিতে আসেন, সেই অবসরে কাপ্তান ক্যাম্পেলের বিধবা বিবির সহিত তাঁহার দর্শনমাত্রেই পরিচয়, প্রণয় ও পরিণয় সুসম্পন্ন হয়। ‡ এই বিবি অল্পদিন পরেই দেহত্যাগ করেন, কাশিমবাজারের ইংরাজ সমাধিক্ষেত্রের একাংশে একটি পুরাতন সমাধিস্তূপের উপর বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ে একটি ক্ষুদ্র মন্দির গঠিত হইয়াছে, ফলকলিপিপাঠে জানা যায়, উহার অভ্যন্তরেই বিবি ক্যাম্পেল ওরফে বিবি হেষ্টিংসের জীর্ণ কঙ্কাল সমাধিনিহিত রহিয়াছে!

পলাশির যুদ্ধাবসানে ইংরাজেরা যখন মুরশিদাবাদে সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া উঠিলেন, সেই সময় হইতেই হেষ্টিংসের পদোন্নতির সূত্রপাত হয়। তখন কর্ণেল ক্লাইব ইংরাজ এবং বাঙ্গালীর একমাত্র অধিনায়ক—তাঁহার মুখের কথাই একমাত্র বেদবাক্য। তিনি হেষ্টিংসের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে

* H. Beveridge Esqr. c.s.—

† Long's Selections from the Records of the Government of India Vol. I.

‡ Trotter's Warren Hastings: a Biography.

কাশিমবাজারে ও ক্রাফটনকে মুরশিদাবাদের নবাবদরবারে সদস্য নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই দেশীয় ভাষায় প্রগাঢ় পণ্ডিত ও নবাবদরবারের পাত্রমিত্রগণের প্রিয়পাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন, এবং তজ্জন্য ক্রাফটনের পদত্যাগের পর হেষ্টিংসকেই নবাবদরবারের সদস্যপদে মনোনীত করা হইয়াছিল।

হেষ্টিংস এইরূপে গুদামসরকার হইতে বঙ্গবিহার উড়িষ্যার সুবাদারের সভায় সদস্যপদে আসীন হইলেন; বৎসরে পঞ্চাশ টাকা বেতনের পরিবর্ত্তে অগণিত ধনরাশি তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল; কাশিমবাজারের ইংরাজকুঠির মালগুদামের পরিবর্ত্তে মুরাদবাগের রাজপ্রাসাদ আবাসগৃহরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল!

এই সময় হইতে হেষ্টিংস্ বাঙ্গলার ইতিহাসে সর্ব্বজনপরিচিত হইয়া উঠিলেন! ইংরাজদরবার তাঁহাকেই নবাবদরবারে ইংরাজপ্রতিনিধিপদে বরণ করায় পাত্রমিত্রগণের নিকটে তাঁহার পদগৌরব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল;—সকলেই তাঁহার শুভদৃষ্টিলাভের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিলেন! *

রাষ্ট্রবিপ্লবের তরঙ্গাভিঘাতে মোগলশাসনশক্তি ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িতেছিল; লোকে আপন গণ্ডা বুঝিয়া লইবার জন্যই লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিল;—তজ্জন্য কত ভাল ভাল লোকের কার্য্যেও কোন পথই কুপথ বলিয়া পরিত্যক্ত হয় নাই। হেষ্টিংসের শিক্ষানবিশী যতই শেষ হইয়া আসিতে লাগিল, তিনি ততই ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন।

নবাব-দরবারে প্রবেশ লাভ করিয়া হেষ্টিংস তাহার অন্তঃসার-শূন্য বাহ্যাড়ম্বরের পরিচয় পাইয়াছিলেন। বাহিরের লোকের পক্ষে তাহা সহজে উপলব্ধি করিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু হেষ্টিংসের কল্যাণে ইংরাজেরা তাহার

* As Resident at Murshidabad, he had to watch over the well-being of the English-party at Cassimbazar; to see that Mir Jafar fulfilled his engagements with the Calcutta Council to keep the peace, if he could, between the new Nawab and his chief officers; to discover and thwart the numerous intrigues, which that time of general disorder, distrust and ferment brought to an easy birth.—Trotter's Warran Hastings, a Biography, 33.

সন্ধান লাভ করিয়া মোগলশাসনছায়াকে সদর্পে পদাঘাত করিবার জন্য সাহসী হইয়া উঠিলেন।

পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হেষ্টিংসের ভাষারও পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল;—তিনি গুদামসরকারের বিনীত ভাষা বিসর্জ্জন দিয়া রাজনীতিজ্ঞ প্রবীণ পণ্ডিতের ভাষায় ক্লাইবকে অসংকোচে কত কথাই লিখিতে লাগিলেন। ক্লাইব কেবল এইমাত্র প্রত্যুত্তর দিলেন—"তুমি সেদিনমাত্র নবাবদরবারে গতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছ; তোমার পক্ষে মুসলমানের কূটনীতির মর্ম্মোদ্ঘাটন করিবার এখনও সময় উপস্থিত হয় নাই।"

এই সময়ে হেষ্টিংসের সহিত নন্দকুমারের পরিচয় হয়। কিন্তু প্রথম পরিচয়েই উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইল। ইহাতে নন্দকুমারের কিছুমাত্র অপরাধ ছিল না।

মীর জাফর ঋণ-শোধের জন্য বর্দ্ধমান হুগলী ও নদীয়ার করসংগ্রহের ভার ইংরাজদিগকে সমর্পণ করেন। তদনুসারে ইংরাজদিগের পক্ষে একজন সুযোগ্য কর-সংগ্রাহক নিয়োগ করা আবশ্যক হইয়া উঠে। হেষ্টিংস নবাব-দরবারের প্রতিনিধি হইয়া মনে করিয়াছিলেন যে এই নূতন পদও তাঁহারই হইবে। ক্লাইব সেরূপ মনে করিতে পারেন নাই। মহারাজ নন্দকুমার এক সময়ে হুগলীর ফৌজদার ছিলেন; বর্দ্ধমান নদীয়া ও হুগলীর রাজস্ববিষয়ক কোন তথ্যই তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। বিপদের দিনে তিনি অন্নদাতা সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশ করিয়াও ইংরাজের কল্যাণসাধন করিয়াছিলেন। সুতরাং ক্লাইব তাঁহাকেই এই নূতন পদ প্রদান করিলেন। ইহাতে হেষ্টিংসের আত্মাভিমান নির্দ্দয়রূপে আহত হইয়া উঠিল; তিনি ক্লাইবের নিকট আবেদন-পত্র প্রেরণ করিলেন। ক্লাইব তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া হেষ্টিংসকে বুঝাইয়া দিলেন যে নন্দকুমার বাঙ্গালী হইলেও কোম্পানীর রাজকর্ম্মচারী।

হেষ্টিংসকে অবশ্যই মাথা হেট করিতে হইল। তিনি লিখিলেন যে, "আমার অক্ষমতা লক্ষ্য করিয়াই যে আপনারা নন্দকুমারকে করসংগ্রাহক নিযুক্ত করিয়াছেন আমার মনে এরূপ ধারণা স্থানলাভ করিবে কেন? তবে লোকে তাহাই ধরিয়া লইয়াছে। আমাকে মুরাদবাগে প্রেরণ করিবার সময়ে সকলেই ভাবিয়াছিল, করসংগ্রহের কার্য্যও আমার হস্তেই ন্যস্ত হইবে। এখন তৎপদে অন্য লোক নিযুক্ত হওয়ায় নানা লোকে নানাকথা রটনা করিতেছে!"

হেষ্টিংস বুঝিলেন যে, নন্দকুমার তাঁহার পদোন্নতির প্রধান কণ্টক। কেবল তাহাই নহে,—ক্লাইবের বিচারে নন্দকুমারের পদগৌরব অক্ষুণ্ণ থাকায় হেষ্টিংসকে বাধ্য হইয়া নন্দকুমারের প্রতি পদোচিত সৌজন্য প্রদর্শন করিতে হইল! ইহাতে হৃদয়নিহিত বিদ্বেষবহ্নি বিদূরিত হইল না; তাহা ধীরে ধীরে প্রধূমিত হইতে লাগিল!

মোগলসাম্রাজ্য স্বপ্নকথায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল; সকলেই বুঝিয়াছিল যে আজি হউক, কালি হউক আর দশ দিন পরেই হউক, তাহার অধঃপতন অনিবার্য্য! তথাপি ক্লাইব এবং হেষ্টিংস একরূপ বুঝেন নাই। হেষ্টিংস্ প্রতিভাশালী তরুণ যুবক,—তিনি বুঝিয়াছিলেন "আর কেন? এখন হইতেই প্রত্যক্ষভাবে বৃটীশশাসনশক্তি প্রয়োগ করা হউক।" ক্লাইব প্রতিভাশালী বর্ষীয়াণ রণপণ্ডিত,—তিনি বুঝিয়াছিলেন "বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি।" ক্লাইব সেই জন্য নবাবের নামের দোহাই দিয়া পাত্রমিত্রগণের সৌহার্দ্য সম্বল করিয়া অলক্ষিতে শনৈঃ শনৈঃ বৃটিশশাসনশক্তি সংস্থাপন করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। এই নীতির অনুসরণ করিতে গিয়া ক্লাইব শত্রুকেও মিত্রের ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করিতেন, উৎকোচগ্রাহী বিশ্বাসঘাতক নন্দকুমারকেও রাজস্ব-বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তৃপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস ইহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে না পারিয়া নন্দকুমারের সহিত শত্রুতায় লিপ্ত হইলেন!

ক্লাইব সূচীবৎ পররাষ্ট্রে প্রবেশলাভ করিয়া কুঠারবৎ বহির্গত হইতে জানিতেন; হেষ্টিংসের সেরূপ শাসনকৌশল ছিল না—তিনি প্রথম হইতেই শাণিত কুঠারহস্তে পররাষ্ট্র-দ্বারে বাহুবল প্রয়োগ করিতে লালায়িত হইতেন। ভারতবর্ষে বৃটীশসাম্রাজ্য-সংস্থাপনের জন্য সূচী ও কুঠার উভয় অস্ত্রেরই প্রয়োজন ছিল। প্রয়োগবিজ্ঞানকুশল ক্লাইব প্রথমে সূচ্যগ্রভাগ চালিত করিয়াছিলেন বলিয়াই উত্তরকালে হেষ্টিংসের কুঠার মোগলশাসনশক্তিকে এত সহজে ভূপাতিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

শিক্ষানবিশীর সময়ে যে সকল কার্য্যে হেষ্টিংস পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার ভবিষ্যত কার্য্যপদ্ধতি স্থিরীকৃত হইয়াছিল। বৃটীশ-সাম্রাজ্যসংস্থাপনে তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ তাঁহাকে এতদূর অন্ধ করিয়া তুলিয়াছিল যে তিনি স্থানাস্থান ও কালাকাল বিচার করিতে প্রস্তুত ছিলেন

না। টাকা চাই—টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে; শত্রুদলন প্রয়োজন—শত্রু-দলনে অগ্রসর হইতে হইবে; সাম্রাজ্য-সংস্থাপনার্থ যুদ্ধকলহের আবশ্যক—রুধিরতরঙ্গে ভারতবর্ষ প্লাবিত করিতে হইবে; এসকল কার্য্যে যে স্থান কাল ও পাত্র বিচার করিয়া ধীরভাবে কার্য্যক্ষেত্রে পদার্পণ করা কর্ত্তব্য, সে কথা হেষ্টিংস স্বীকার করিতেন না। যতদিন শিক্ষানবিশী শেষ হয় নাই ততদিন ইহা কেবল হেষ্টিংসের লিখিত কাগজপত্রেই নিবদ্ধ ছিল; হেষ্টিংস ভারত-ভাগ্যবিধাতা হইলে তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই এই নীতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। এজন্য ইতিহাস তাঁহার নামে যে সকল কলঙ্কলেপন করিয়াছে, আধুনিক লেখকসম্প্রদায়ের চেষ্টায় তাহা অপসারিত হইতেছে না; বরং পুরাতত্ত্ব যতই সর্ব্বজনপরিচিত হইতেছে, ততই হেষ্টিংসের কলঙ্ক দেশ বিদেশে আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে!

ট্রটার যে উদ্দেশ্যে জীবনচরিত রচনা করিয়াছেন, তাহা সফল হয় নাই। তিনি বার্ক, সেরিডান, মিল, থরণটন ও মেকলেকে যে সকল কটুকাটব্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে একশ্রেণীর পাঠকের পক্ষে তাঁহার পুস্তক বিলক্ষণ রসাল হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু ইতিহাস-পাঠকের নিকট এরূপ কটুকাটব্য অপেক্ষা যুক্তি তর্কেরই প্রাধান্য প্রবল!

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

—(০)—

সন্ন্যাসী।

—০—

সন্ন্যাসীর অব্যক্ত কাতর উক্তিতেই তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম। যে নিদারুণ যন্ত্রণা বুকে লইয়া আমি গৃহত্যাগী, সন্ন্যাসীও তাই। বাড়ার ভাগ তাহার কোলে একটি কুসুমকোমল বালক। আমারও এমনি একটি বালিকা ছিল, কিন্তু সে থাকিলে কি আমি এমন করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া বাহির হইতে পারিতাম!

গাড়ীর বেঞ্চে বসিয়া সাত পাঁচ ভাবিতেছি, সন্ন্যাসীর কথা ভাবিতে ভাবিতে আমার নিজের অকূল ভাবনায় আমাকে ডুবাইয়া ফেলিয়াছে। সে

সময়ে আমার ইহাই হইত, অপরের দুঃখের কাহিনী শুনিতে বসিলে আর তাহার শেষ পর্য্যন্ত শুনিতে পারিতাম না, আমার নিজের চিরদুঃখময় জীবনের কোন এক তন্ত্রীতে আঘাত লাগিলেই আমি নিজের মধ্যে ডুবিয়া যাইতাম। একটু ভাল করিয়া ডাকিয়া না ফিরাইলে আমি সেই ভাবেই অনেক সময় কাটাইয়া দিতে পারিতাম। এখনও আমার বন্ধুগণ অনেক সময়ে আমার বিরুদ্ধে এই প্রকার অভিযোগ করিয়া থাকেন; পূর্ব্বের সেই সময় হইতেই আমি কথায় কথায় অন্যমনস্ক হইতে শিখিয়াছিলাম, সে অন্যমনস্কের অর্থ আমার নিজের ভাবনা।

যাহাহউক আজ এই রেলের মধ্যম শ্রেণীর একটি প্রকোষ্ঠে আমি আপন চিন্তায় ডুবিয়া গেলাম, সন্ন্যাসী ও তাঁহার সুন্দর বালকটি ধীরে ধীরে আমার চিন্তার বাহিরে চলিয়া গেল, তাঁহারা যে একই প্রকোষ্ঠে আমার সহিত এক-সনে উপবিষ্ট তাহা পর্য্যন্ত আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

কতক্ষণ এ ভাবে গিয়াছিল তাহা আমি বলিতে পারি না, সন্ন্যাসী মহাশয়ও আমাকে ডাকেন নাই। হঠাৎ একটা ষ্টেসনের একজন কুলী বিকৃতস্বরে সজোরে সেই ষ্টেসনের নাম হাঁকিতেই আমার চমক্ হইল। আমি তাড়াতাড়ি গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিলাম, এবং কেমন একটু অপ্রস্তুত হইয়া সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলাম "য়্যা, কি বল্‌ছিলেন?" তিনি বল্লেন "কৈ, কিছু না।" আমি আরও একটু বেশী অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু যখন আপনা হইতেই কথা আরম্ভ করিয়াছি তখন আর চুপ করিয়া থাকা ভাল দেখায় না, সুতরাং আমি তাঁহাকে দুই চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম; তিনিও যথাযথ জবাব করিলেন। তিনি কলিকাতাবাসী, পিতামাতা কেহই নাই; নিতান্ত আত্মীয়ের মধ্যে একটি ভগিনী আছেন, তিনি সধবা, কলিকাতাতেই কোন এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থের গৃহে তিনি বিবাহিতা। তাঁহার নিজের সম্বল এই অমরনাথ। তাঁহাকে কোলে লইয়া তিনি তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছেন; বিষয় আশয় সমস্তই ভগিনীপতির হাতে দিয়া আসিয়াছেন। সে সম্বন্ধে তাঁহার মোটেই কোন চিন্তা নাই। তাঁহার সমস্ত কথাবার্ত্তার সারোদ্ধার করিলে এই সংবাদ গুলি মোটামুটী পাওয়া যায়। আমি দেখিলাম ভদ্রলোক কথাগুলি উপর উপর শুনাইয়া দিয়া গেল। এ কথাগুলি জানিবার আমার

তেমন আগ্রহও ছিল না। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে লাগিলাম সন্ন্যাসীর হৃদয়ের মধ্যে প্রকাণ্ড এক আগ্নেয় গিরি। পরম প্রিয়তমা প্রণয়িনীর মৃত্যুতে সংসার ত্যাগ অনেক দেখিয়াছি; তাহাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে তাহা বেশ বুঝা যায়; কিন্তু এই দেবোপম সুন্দর যুবক সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসের মধ্যে, প্রণয়িনী-বিয়োগের মধ্যে যেন আরও কিছু আছে, তাহারই প্রবল তাড়নায়, তাহারই অগ্নিময় স্মৃতির মর্ম্মভেদী দংশনে ভদ্রলোক ঘর ছাড়িয়া ছুটিয়া বাহির হইয়াছে। এ ব্যাপার আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। আমার জানিবার ইচ্ছা ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়া গেল, তাঁহার জীবনের কাহিনী শুনিতে না পারিয়া যেন আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। আমি স্পষ্ট বাক্যে তাঁহাকে বলিয়া ফেলিলাম "মহাশয়, মাফ করিবেন, আপনি আমাকে যে সংবাদ কয়েকটি দিলেন আমি তাহা শুনিবার জন্য মোটেই উৎসুক ছিলাম না; যে দুঃখে, যে নিদারুণ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া আপনি গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন তাহারও কথঞ্চিৎ আমি প্রাণে অনুভব করিতে পারিয়াছি; কিন্তু বলিতে কি, আপনার বুকের ভিতরে প্রকাণ্ড এক অগ্নিকুণ্ড আমি স্পষ্ট দেখিতেছি। আমার কাছে গোপন করিবেন না; আমিও আপনার ন্যায় দুঃখী; সমদুঃখীর নিকট নিজের দুঃখ-কাহিনী বলিলে কষ্টের অনেক লাঘব হয় তাহা কি আপনি জানেন না?" আমি আর অধিক বলিতে পারিলাম না, তিনি এমনই কাতর নয়নে আমার দিকে চাহিলেন যে আমার কথা বলিবার শক্তি লোপ হইয়া গেল; আমি আর কিছুই বলিতে পারিলাম না। আমাকে নির্ব্বাক দেখিয়া তিনিই অতি মৃদু মধুরস্বরে বলিলেন "ভাই, তোমাকে আমার হৃদয়ের যন্ত্রণা বলিব, কিন্তু আজ নহে; আমার কি হইয়াছে, আমি মুখে সে কথা সব বলিতে গেলে স্থির থাকিতে পারি না, আমার মাথার ভিতরে কেমন একটা গোল হইয়া যায়, কথা কিছুই বলা হয় না; তোমার ঠিকানা আমাকে বলিয়া যাও; আমি তোমার সঙ্গে দেখা করিব তখন সব শুনিও।" এমনই সুন্দর ভাবে এই কয়টি কথা তিনি বলিলেন যে আমি দ্বিরুক্তি করিতে পারিলাম না।

এমন সময়ে কোন একটা বড় ষ্টেসনে আসিয়া গাড়ী লাগিল, এবং এক জন লালা সাহেব তিন চারিটি সঙ্গী এবং কতকগুলি গাঁটরী লইয়া আমাদের প্রকোষ্ঠে উঠিয়া বসিলেন; আমরা দুইটি প্রাণী একেবারে এক কোণে যাইয়া

পড়িলাম। আমাদের কথোপকথন একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। দিল্লীযাত্রী লালা সাহেবের মামলা মোকদ্দমা, ঘর গৃহস্থালীর কথাবার্ত্তা, ধনের গরিমা, প্রতাপের হুঙ্কারে গাড়ীর প্রকোষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। আমরা দুইটি গৃহহীন শ্মশানবাসী দুঃখী বাঙ্গালী গৃহস্থের এই সংসার-অভিনয় সভয়ে সসঙ্কোচে দেখিতে লাগিলাম! লালাজির দৃষ্টি অবশেষে আমাদের উপরে পতিত হইল, সমস্ত ভারতবর্ষে একটি জিনিষের প্রভাব বড়ই বেশী; তাহার নিকট রাজার উন্নত মস্তকও অবনত হয়, কৃপণের গৃহদ্বারও তাহার নিকটে উন্মুক্ত হয়—সে দ্রব্য আর কিছুই নহে—গৈরিক বসন। আমার সঙ্গী সন্ন্যাসীর গৈরিক বসনের উপর যখনই লালাজির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, তখনই সেই ভারত-বিজয়ী গৈরিক তাহার নিকট হইতে একটি সসম্ভ্রম প্রণাম আদায় করিল। গৈরিকধারী মহামূর্খ হইলেও সেই রঞ্জিত বস্ত্রখণ্ড তাহাকে মহাপণ্ডিত পদবীতে উন্নীত করিয়া দেয়; এবং কত ছাত্র বহু বৎসর গুরুগৃহে বাস করিয়া, কত রাত্রি অধ্যয়নে কাটাইয়াও যে উপাধি লাভ করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া বিষণ্ণমনে গৃহে প্রস্থান করে, এই বস্ত্রখণ্ড নিমেষের মধ্যেই একজন 'ক'-অক্ষর-জ্ঞানবর্জ্জিত ব্যক্তিকে সেই মহাসম্মাননীয় অনারারী উপাধি—"সরস্বতী" দিয়া বসে। গৈরিকের এমনই মাহাত্ম্য। আমার সঙ্গী সন্ন্যাসী কতদূর বিদ্বান তাহা যদিও আমি জানিতে পারি নাই, তবুও এটা বেশ বুঝিয়াছিলাম যে তিনি সরস্বতী নহেন, আমাদেরই মত একটা মানুষ। কিন্তু লালাজি তাঁহাকে একেবারে সরস্বতী বলিয়া সম্বোধন করিয়া নানাপ্রকার স্তুতি মিনতি করিতে লাগিল। তামাক সাজা হইলে সর্ব্বাগ্রেই সন্ন্যাসীকে দিতে গেল, কিন্তু সন্ন্যাসী যখন বলিলেন যে তিনি কোন প্রকার নেশা করেন না, তখন লালাজী অবাক্ হইয়া গেল; তাহার এই ৪৫ বৎসরব্যাপী লালা-জীবনে গঞ্জিকাবিরোধী সাধু সন্ন্যাসী কখনও দেখে নাই; এ সরস্বতী কিনা "ছিলুম ভি নেহি পিতা", হয়ত এই একটি বিষম ত্রুটীতেই সন্ন্যাসী মহাশয়ের সরস্বতী উপাধি অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছিল; তাহার পর আমিও যখন তাহার কলিকাটির সদ্ব্যবহার করিতে অস্বীকার করিলাম তখন সে বড়ই কেমন হইয়া গেল। সন্ন্যাসীও গাঁজা তামাক খায় না, তার চেলাও (আমাকে হয়ত তাহাই ঠিক করিয়াছিল) তাই; এ এক মন্দ ব্যাপার নহে। তাহার পর যতক্ষণ আমরা গাড়ীতে ছিলাম লালাজী

আমাদের সঙ্গে খুব বেশী আগ্রহের সঙ্গে মোটেই কথা বলে নাই।

গাড়ী গাজিয়াবাদ ষ্টেসনে পৌঁছিল; আমাদিগকে এই স্থানে গাড়ী বদল করিতে হইবে। আমরা এই স্থান হইতে নর্থ ওয়েষ্টারন্ রেলওয়ের আরোহী হইব। আমি নারিকেল ও গুড়ের বস্তা লইয়া দ্বিতীয় গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম, সন্ন্যাসীও অমরনাথকে লইয়া আমার গাড়ীতে আসিলেন. তাঁহার সঙ্গে জিনিষ পত্র অতি সামান্য।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল, আমরা এবার আবার একাকী হইলাম, আমাদের গাড়ীতে আর কেহ উঠিল না। সন্ন্যাসীর সঙ্গে নানাপ্রকার গল্প হইতে লাগিল, সে সব কথার সঙ্গে তাঁহার জীবনের অনেক সম্বন্ধ থাকিলেও আমি যে সংবাদ চাহি তাহার কোন কথাই তাহাতে নাই; সুতরাং সে সব কথা পাঠকগণকে জানাইবার বিশেষ কোন দরকার দেখিতেছি না।

সন্ন্যাসীর বরাবর সাহারণপুর পর্য্যন্তই যাইবার কথা, কিন্তু অমরকে ক্ষুধায় কাতর দেখিয়া তিনি মিরট ষ্টেসনে নামিবার অভিপ্রায় করিলেন, আমার সঙ্গে শরের বোঝা না থাকিলে আমিও তাঁহার সঙ্গেই নামিয়া পড়িতাম। মিরটে গাড়ী হইতে নামিবার সময়ে তিনি আমার হাত ধরিয়া অতি দুঃখকাতর স্বরে বলিলেন "ভাই, তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হইবে; তখন আমার জীবনের কথা তুমি শুনিতে পাইবে।" আমি অমরকে কোলে লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিলাম। তাহার সেই কোমল দেহ আমার শরীরে লাগিয়া যেন আমার বুক শীতল হইয়া গেল। তখন মনে হইল যখন আমার সব বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইতেছিল, তখন যদি অন্ততঃ আমার সেই ১৪ দিনের মেয়েটি বাঁচিয়া থাকিত তাহা হইলে আর এমন করিয়া পথে পথে বেড়াইতাম না। গাড়ী ছাড়িবার সময় হইল; সন্ন্যাসী অমরকে লইয়া ধীরে ধীরে নামিলেন এবং ষ্টেসনের বাহিরে চলিয়া গেলেন। আমি একাকী কত কি চিন্তা করিতে লাগিলাম।

গাড়ী সাহারণপুরে আসিল, আমি গুড় ও নারিকেল সহ বন্ধুগৃহে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। আদর অপ্যায়িত যথারীতি হইল সে দিন সেখানেই অবস্থান। পর দিন প্রত্যুষে এক অনিন্দ্যসুন্দর যান—একা আসিয়া হাজির হইল। আমি তাহাতে উঠিয়া বসিলাম; বন্ধুগণের সস্নেহ সম্ভাষণ, প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টির মধ্য হইতে একাপ্রবর নাচিতে নাচিতে বাহির হইয়া গেলেন। বেলা সাড়ে

তৃতীয় প্রহরে তিন ভাগ জীবনী-শক্তি একায় রাখিয়া আমি প্রাণে প্রাণে দেরাদুনের বাসায় পৌঁছিলাম।

দেরাদুনে পৌঁছিয়া প্রতিদিনই সন্ন্যাসী বা তাঁহার সংবাদের জন্য পথ চাহিয়া থাকি। কবে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, কবে অমরনাথকে আবার দেখিব এই চিন্তা সর্ব্বদাই আমার মনে হইত। আর কত দিন নির্জ্জনে বসিয়া নিজের মনেই সন্ন্যাসীর জীবনসম্বন্ধে কত প্রকার কল্পনা করিতাম, সেগুলি লিখিয়া রাখিলে আজকালকার অনেক গল্পজীবিগণের ৫।৭ মাসের হস্তকণ্ডূয়নের উপকরণ জুটিত; কিন্তু সে সময়ে আমার যে প্রকার মনের অবস্থা তাহাতে কালী কলম এক সঙ্গে করিবার ইচ্ছা আমার মোটেই হইত না।

একদিন অপরাহ্ণে, বোধ হয় শুক্রবার হইবে, আমি ভ্রমণ শেষ করিয়া বাজারের নিকট দিয়া আসিতেছি এমন সময়ে চিত্রবিচিত্র বস্ত্রপরিহিত টেলিগ্রাফের পেয়াদা আমার হাতে একখানি লাল রঙ্গের লেফাফা দিল। কালে কস্মিনে, কদাচিৎ এক আধ খানি তারের খবর পাই, আর তাহাতে অশুভ বই শুভ সংবাদ প্রায়ই থাকে না; কাজেই তারের খবর শুনিলেই কেমন যেন বুকের মধ্যে ধড়ফড় করিয়া উঠে। তাড়াতাড়ি পত্রখানি খুলিয়া দেখি, সন্ন্যাসী হরিদ্বার হইতে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন, তাহাতে ঠিক এই কয়েকটি কথা লিখিত ছিল "Amar taken away by sister, alone come to Harkipari." সন্ন্যাসী নিজকে সন্ন্যাসী বলিয়াই সহি করিয়াছে। 'হরকিপাড়ি' কথাটা হয়ত অনেকে না বুঝিতে পারেন। হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাট আছে; সেই ঘাটেই যাত্রিগণ স্নান করে; সেই ঘাটেরই অন্য নাম "হরকিপাড়ি"।

আমি এই সংবাদ পাইয়াই তৎপর দিন হরিদ্বার রওনা হইলাম। দেরাদুন হইতে একখানি একা ভাড়া করিয়া প্রত্যুষেই যাত্রা করিলাম, এবং অপরাহ্ণে প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময়ে হরিদ্বার পৌঁছিলাম। সন্ন্যাসী মনে মনে বেশ বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার সংবাদ পাইবামাত্র আমি একদণ্ডও অপেক্ষা করিব না, তাই তিনি সে দিন আমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি সেখানে একটা ক্ষুদ্র ঘর ভাড়া লইয়া আছেন। আমিও সেই স্থানেই তাঁহার অতিথি হইলাম।

শ্রীজলধর সেন।

বিশ্ব-রচনা।

১। **হরসেলের পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতির্বিদগণের মত।**—দূরবীক্ষণের সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে তারাপুঞ্জ কি ভাবে সাজান আছে এবং জগতের কাঠামই বা কেমন এরূপ প্রশ্নের উত্থাপন হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ তৎকালে সাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে বিশ্ব গোলাকার ভিন্ন অন্য আকারবিশিষ্ট হইতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ড শব্দেই বিশ্বের গোলত্ব ব্যঞ্জিত রহিয়াছে; এবং সিদ্ধান্তশাস্ত্রে এই গোলের পরিমাণ পর্য্যন্ত দেওয়া আছে। ভাস্কর আচার্য্যের কথার ভাবে বোধ হয় যে নিম্নলিখিত ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ছিল না।

কোটিত্রৈনখনন্দষট্কনখভূভৃদ্ভুজঙ্গেন্দুভি (১,৮৭,১২,০৬৯,২০,০০,০০,০০০)
র্জ্যোতিশাস্ত্র বিদোবদন্তি নভসঃ কক্ষামিমাং যোজনৈঃ ॥
তৎব্রহ্মাণ্ডকটাহ সম্পুটতটে কেচিজ্জগুর্বেষ্টনং।
কেচিৎ প্রোচুরদৃশ্যদৃশ্যকগিরিং পৌরাণিকা সূরয়ঃ ॥
করতলকলিতামলকবদমলং সকলং বিদন্তি যে গোলম্।
দিনকরকরনিহততমসো নভসঃ সপরিধিরুদিতস্তৈ ॥
ব্রহ্মাণ্ডমেতন্মিতমস্ত নো বা কল্পে গ্রহঃ ক্রামতি যোজনানি।
যাবন্তি পূর্ব্বৈরিহ তৎপ্রমাণং প্রোক্তং খকক্ষাখ্যমিদং মতং নঃ ॥ ৩।৬৭।৬৮।৬৯।
সি, শি।
প্রমাণশূন্যত্বাৎ প্রয়োজনভাবাচ্চাস্মাভিব্রহ্মাণ্ডমানং ন কথিতামত্যর্থঃ।

পৃথিবী জগতের মধ্যস্থলে আছে। এ মতের সহিত পূর্ব্বোক্ত মতের বিরোধ দৃষ্ট হয়, অথচ ভাস্কর এ বিরোধ-ভঞ্জনপ্রয়াসে কোন কথা বলিলেন না।

কল্‌মবসের সমসাময়িক বিসূটুলাকুলপাবন, নব্যজ্যোতিষের প্রবর্ত্তক কোপর্নিক্‌সও বিশ্ব গোল বলিয়া মানিতেন; এবং বোধহয় তিনি প্রকারান্তরে সূর্য্যকে বিশ্বের কেন্দ্রস্বরূপ স্বীকার করিতেন। ব্রহ্মাণ্ড গোলাকার এ ভাব সাধারণের হৃদয় হইতে তিরোহিত না হইলে, এবং বিশ্বের উপকরণীভূত এই সংখ্যাতীত তারা সকলের মধ্যে সূর্য্য যে এক তারামাত্র, তাহা যতক্ষণ না

লোকে বুঝিতে পারেন, ততক্ষণ বিশ্বের বাস্তব গঠন কেমন তাহা জানিবার উপায় অন্বেষণ বৃথা।

"অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।"

বিশ্ব যে গোল না হইতে পারে, এবং সূর্য্য যে বিশ্বের কেন্দ্র নহে, এ কথা বোধ হয় প্রথমতঃ সেই জগদ্বিখ্যাত কেপ্‌লারের মনে উদয় হইয়াছিল। যাঁহার গ্রহগণের গতিবিষয়ক নিয়মত্রয় জ্যোতিষ-জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি, এবং যিনি টাইকোব্রাহির স্তূপাকার বেধপত্রপরিস্রুত মধুদ্বারা চিরপিপাসিত আচার্য্যগণের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তারাগণের সাপেক্ষিক উজ্জ্বলতার অযথা পরিমাণ গ্রহণ করাতে তিনি এমত নিঃসংশয়ে অবলম্বন করিতে পারেন নাই। কেপ্‌লার যে বিচারপদ্ধতি আশ্রয় করিয়া এ মতে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা এই। তিনি বলেন অন্তরিক্ষে সমভাবে সমান্তরে বিন্যস্ত সমোজ্জ্বল বহুসংখ্যক স্থির তারাগণের মধ্যে যদি সূর্য্যকে এক তারা জ্ঞান করা যায়, তবে পৃথিবীর সন্নিকৃষ্ট এবম্ভূত সূর্য্যসংখ্যা দ্বাদশের অধিক হইতে পারে না। ইহার পর দ্বিগুণ অন্তরে আর এক শ্রেণীর তারা লও, তিন গুণ অন্তরে আর এক শ্রেণীর, এইরূপ পর পর চলুক; কিন্তু দূরত্ব যত বাড়িবে, তারা তত অনুজ্জ্বল দেখাইবে; সুতরাং এরূপ হিসাব করিলে অচিরে এমন সীমায় উপনীত হইতে হইবে, যেখানে আর তারা দেখা যাইবে না। কিন্তু প্রত্যুত যেমন কালপুরুষের কোমরবাঁধে তণ্ডুলকণার ন্যায় তারাস্তূপ দেখা যায় তেমনই গায়ে গায়ে লাগান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারাপুঞ্জ বিস্তর আছে এবং পরিদৃশ্যমান তারাসংখ্যাও হাজার হাজার। অতএব তিনি স্থির করিলেন যে তারাগণের পরস্পরের অন্তর তত অধিক নহে, যত অধিক সূর্য্য হইতে তাহাদের অন্তর। আর আকাশের যে প্রদেশের মধ্যস্থলে সূর্য্য আছেন সে প্রদেশের তারাসংখ্যা কম।

কেপ্‌লার যদি জানিতেন যে প্রথম শ্রেণীর তারার যে উজ্জ্বলতা তাহা ষষ্ঠ শ্রেণীর তারার উজ্জ্বলতার শতগুণ, তাহা হইলে তিনি এরূপ সিদ্ধান্তে কখন উপনীত হইতেন না। তিনি একটু হিসাব করিলেই বুঝিতে পারিতেন যে এখান হইতে সূর্য্যের যে অন্তর তাহাকে যদি এক ধর এবং সেই অন্তরে দ্বাদশ তারার অস্তিত্ব স্বীকার কর, তবে দ্বিগুণ অন্তরে তারাসংখ্যা চতুর্গুণ

হইবে, তিন গুণ অন্তরে তারাসংখ্যা নবগুণ; এবং এই ক্রম অনুসারে দশম মণ্ডলে তারাসংখ্যা চারি হাজারের অধিক হইবে। দশম মণ্ডলে বার শত তারা ধরিলে সে তারাগুলি ষষ্ঠ শ্রেণীর তারা ধরিতে হইবে, এবং একাদিক্রমে গণনা করিলেও প্রায় ১২০০ পাওয়া যায়। অতএব অন্তরিক্ষে তারা সকল যে সমভাবে বিন্যস্ত আছে এ মত প্রত্যক্ষ দর্শনলব্ধ ফলের বিরোধী নহে। সত্য বটে আমাদের সূর্য্য হইতে তারাগণের যে অন্তর, তাহা কালপুরুষের অন্তর্গত অনেক উজ্জ্বল তারাগণের পরস্পরের অন্তর অপেক্ষা অধিক। এরূপ তারা সংকুলতাদ্বারা বোধ হয়, কেপ্‌লার মনে করিতেন যে ব্যাপ্তি সাধারণ সমর্থন করা যাইতে পারে; পরন্তু তাহা নহে, ইহা ব্যতিক্রম মাত্র। আর ইহাও স্বীকর্ত্তব্য যে, এ মত কেপ্‌লার সুসমর্থিত বলিয়া প্রচার করেন নাই; কারণ যে বিষয়ে নিশ্চয়তা দুর্লভ সে বিষয়ে অনুমাণের অধিক আর কি হইতে পারে।

কাণ্টের অভিপ্রায়।—যাঁহারা কাণ্টকে ধ্যানশীল দার্শনিক মাত্র বলিয়া জানেন, তাঁহারা শুনিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইবেন যে, যদিও জ্যোতিষ ক্ষেত্রে তাঁহার কার্য্যবিশেষের পরিচয় পাওয়া যায় না, সুতরাং প্রতিপত্তিও তাদৃশ নাই, তথাপি তিনি স্বীয় চিন্তাশীলতা প্রভাবে নাক্ষত্র জগৎবিষয়ক একটি মতের প্রচার করিয়া গিয়াছেন; এবং এইমত কথঞ্চিৎ রূপান্তরিত ভাবে একাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছিল। তিনি দেখিলেন যে নভোমণ্ডল মন্দাকিনীপরিবেষ্টিত, এবং মন্দাকিনী সুদূরসংস্থিতা, সুতরাং যন্ত্রনেত্রের অগোচর সংখ্যাতীত তারাগণের আলোকমাত্র। অতএব স্থির করিলেন যে নাক্ষত্র জগৎ অন্যান্য দিক্ অপেক্ষা মন্দাকিনীর দিকে অধিক বিস্তৃত অর্থাৎ তাঁহার মনে হইয়াছিল যে তারাগুলি সপাট, এবং অপেক্ষাকৃত পাতলা স্তরে স্তরে সাজান, এবং আমাদের যিনি সূর্য্য তিনি ইহারই মাঝামাঝি পানে আছেন। এই স্তরের এড়ো দিকে নজর দিয়া দেখিলে স্তূপ স্তূপ তারা দেখা যায়, কিন্তু খাড়া দিকে নজর দিয়া দেখিলে অপেক্ষাকৃত কম তারা দৃষ্টিগোচর হয়।

এ অস্থূল তারাস্তরে সৌরজগতের কথঞ্চিৎ সাদৃশ্যের ভাব কাণ্টের হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছিল। সৌরজগতের অঙ্গীভূত গ্রহগণের কক্ষার ক্রান্তিবৃত্তে যে অবনতি তাহার স্বল্পতা প্রযুক্ত উক্ত জগৎ স্তরাকারে বিস্তৃত বলিয়া অনু-

মিত হইতে পারে, কেবল গ্রহসংখ্যা কিছু বেশী করিয়া ধরিলেই সৌরজগৎকে কাণ্টের কল্পিত নাক্ষত্র জগতের হস্তমিত প্রতিকৃতি বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। কাণ্টের সময়ে যদি মাঙ্গল্য, ও বার্হস্পত্য কক্ষার অন্তর্গত ক্ষোদিষ্ঠ গ্রহমেখলার আবিষ্কার হইয়া থাকিত, তাহা হইলে সৌরজগতের সহিত কাণ্টের কল্পিত তারাজগতের সুসমতা দেখিয়া অনেকে সবিস্ময়ে তদীয় মত সমর্থনে অগ্রসর হইতেন। যদি এই ক্ষোদিষ্ঠ গ্রহসংখ্যা পর্য্যাপ্তরূপে অধিক হইত, তাহা হইলে সে গুলি রাশিচক্রপরিতঃ মন্দাকিনীরূপে প্রতিভাত হইত। আমাদের জগৎপরিতঃ এই দ্বিতীয় আকাশগঙ্গা মন্দাকিনীর আলোক দূরবীক্ষণে এক একটি তারা বলিয়া নির্ব্বাচিত হয়, এ গঙ্গার আলোকবিন্দু দূরবীক্ষণে ক্ষোদিষ্ঠ গ্রহরূপে দৃষ্ট হয়। এই উভয়বিধ জ্যোতিষ্কব্যূহের সৌসাদৃশ্য প্রযুক্ত তদ্বয়ের গঠণপ্রণালীর বাস্তব সাম্যতা অনায়াসে অনুমিত হয়।

গ্রহগণ যথানির্দ্দিষ্ট অন্তরে থাকিয়া রবিপরিতঃ নিজ নিজ কক্ষে পরিভ্রমণ করে, এবং সেই ভ্রমণজনিত কেন্দ্রবিমুখ বল কর্ত্তৃক রবিমণ্ডলে বা ঊর্দ্ধ বা অধঃস্থিত গ্রহমণ্ডলে নিপতিত হয় না। এই দেখিয়া কাণ্ট অনুমান করিলেন যে তারাগণও কোন কেন্দ্রপরিতঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। তারাগণের যে নিজের নিজের গতি আছে তাহা তৎকালে প্রায় কেহই জানিতেন না, সুতরাং আপত্তি হইয়া উঠিল যে তারাগণ, যে যেখানকার সে সেই খানেই আছে, তবে তাহারা কেমন করিয়া কোন বস্তুর চতুর্দ্দিকে ঘুরিবে? কাণ্ট ইহার এই উত্তর দিলেন যে তারাগণের ভগণকাল এত দীর্ঘ অর্থাৎ তাহাদিগের কেন্দ্রপরিতঃ একবার পরিভ্রমণ করিতে এত অধিককাল লাগে, এবং তাহাদিগের গতি এত মন্দ, যে তৎকালসুলভ যন্ত্রদ্বারা তাহা অনুমিত হইতে পারে না। উত্তর পুরুষগণ আপনাদিগের পর্য্যবেক্ষণের ফলের সহিত, পূর্ব্ব পুরুষগণের ফলের তুলনা করিলে জানিতে পারিবেন যে, তারাগণের গতি আছে।

কাণ্ট অনুমান করিয়াছিলেন, যে তারাগণের বাস্তব গতি আছে। তাঁহার এ অনুমান পর্য্যাপ্তরূপে সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার মতের পোষকতার জন্য তারাগণের যেরূপ গতির দরকার, সেরূপ গতি তো দেখা যায় না। গ্রহগণ যেমন রাশিচক্রের সমান্তর থাকিয়া পরিভ্রমণ করে, কাণ্টের মতে তারাগণের

মন্দাকিনী সমান্তরে থাকিয়া পরিভ্রমণ করা চাই। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে তারাগণের বাস্তব গতি এক দিকে নহে। এবং তাহারা কোন সাধারণ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে না। কেবল এই মাত্র দেখা যায় যে উত্তর গগণে বিচিত্রবীর্য্য নামক যে উগরাশি আছে, সেই প্রদেশ হইতেই গতির আধিক্য টের পাওয়া যায়; তাহার কারণ এই যে, সেই দিকেই আমাদের রবি গমন করিতেছেন। বিচিত্রবীর্য্যর অভিমুখে তারাগণের গত্যাধিক্য ধরিলেও দেখিবে যে, তারা সকল যার যে দিকে ইচ্ছা সে সেই দিকে ছুটিয়াছে, সুতরাং কাণ্টের দরকার মত নির্দ্দিষ্ট কক্ষায় শৃঙ্খলা পূর্ব্বক তারাগণের গতি দেখিতে পাওয়া যায় না। কাণ্টমতাবলম্বী বলিতে পারেন, যে আমাদের সন্নিকৃষ্ট কতিপয় মাত্র তারার নিজের গতি টের পাওয়া গিয়াছে কিন্তু মন্দাকিনী বারিবৎ স্তূপীকৃত নক্ষত্রনিচয় যথাপদ্ধতি এক দিকেই গমন করিতে পারে! এ মত কতদূর সম্ভব তাহা কিঞ্চিৎ বিলম্বে বিচার করিবার অবকাশ পাওয়া যাইবে।

যেরূপ বর্ণনা করা গেল, তাহা হইতে দেখা যায়, যে সুবৃহৎ তারাস্তর-বিনির্ম্মিত মন্দাকিনী, অন্তরিক্ষে বিকীর্ণ অন্যান্য তারাগণ, এবং যে সকল তারাগুলিকে এক একটি করিয়া দূরবীক্ষণে দেখা যায় এই সমস্ত লইয়া কাণ্টের জগৎ। এ জগৎ বহ্বায়ত হইলেও তিনি এমন মনে করিতেন না যে এইই নিখিল বিশ্ব। তিনি এক এক নীহারিকাকে আমাদের জগৎ সদৃশ এক এক জগৎ মনে করিতেন। এক এক নীহারিকা কোটি কোটি সূর্য্য-সংঘাত হইলেও, দূরত্ব প্রযুক্ত অতি তেজস্বী দূরবীক্ষণে শুভ্র অভ্রবৎ প্রতীভাত হয়। নীহারিকা গুলি যে এক এক সুরদীর্ঘিকার ন্যায় বহুবিধ তারাসংঘাত, এ মত জ্যোতিষিক সাহিত্যলেখকগণের মধ্যে অনেক দিন পর্য্যন্ত, এমন কি বর্ত্তমান খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। পরে বর্ণবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা যখন দেখা গেল যে নীহারিকাগণ প্রধানতঃ জ্বলন্ত গ্যাসরাশি মাত্র, তখন উক্ত কাণ্টীয় মত একেবারে নিরাকৃত হইল। সর উইলিয়ম হরসেলের সময় হইতে এমত হতাদর হইয়াছিল।

লাম্বর্টের জগৎ।—কাণ্টের গ্রন্থ বাহির হইবার কয়েক বৎসর পরে লাম্বর্ট কৃত বহুশ্রমসিদ্ধ এক সৃষ্টিতত্ত্ব প্রকটিত হইল। লাম্বর্টের মত এই

যে বহুবিধ জ্যোতিষ্কবিনির্ম্মিত এক এক বিগ্রহ আছে। সেই বিগ্রহ সকল নানারূপে বিন্যস্ত হইয়া এই নিখিল জগৎ হইয়াছে। উপগ্রহ সহ এক এক গ্রহকে এক এক বিগ্রহ বলা যায়। গ্রহকেন্দ্রস্থিত উপগ্রহ তাহাকে পরিভ্রমণ করে। এবম্ভূত বিগ্রহ অপেক্ষা আমাদের জ্ঞাতসারে ক্ষুদ্রতর বিগ্রহ আর নাই। ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর বিগ্রহ সৌর জগৎ। এ জগৎ উক্ত গ্রহউপগ্রহবিশিষ্ট কতিপয় বিগ্রহ দ্বারা রচিত; এ বিগ্রহ সকল রবিপরিতঃ পরিভ্রমণ করে। এক একটি তারা এক একটি সূর্য্য, এবং প্রত্যেক সূর্য্যের গ্রহ উপগ্রহ রূপ পরিবারবর্গ পরিভ্রমণ করিতেছে। সুতরাং যত তারা তত সৌর জগৎ। পরন্তু এগুলি যথেচ্ছারূপে অবাকীর্ণ নহে। দূরবীক্ষণ সহায়ে আমরা যে সকল নক্ষত্রসংঘাত দর্শন করি সেই গুলি উক্ত জগতের এক একটি সমষ্টি; আবার এই নক্ষত্রসংঘাতের যে সমষ্টি তাহাই মন্দাকিনী। আমাদের দূরবীক্ষণে এই মন্দাকিনী প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্ব বলিয়া প্রতিভাত হয়। এবং বহুসংখ্যক মন্দাকিনীর সমাহারে বিরচিত বৃহত্তর বিশ্ব থাকিতে পারে। এইরূপ উত্তরোত্তর অসংখ্য বিশ্বও থাকিতে পারে। কেবল দূরত্বের আতিশয্যপ্রযুক্ত নয়নগোচর হয় না।

আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত যে ক্ষুদ্রতম বিগ্রহ তাহা, এক প্রধান ও গুরুতর জ্যোতিষ্ক, এবং এক বা একাধিক অল্পকায় জ্যোতিষ্কবিনির্ম্মিত; লঘুতর জ্যোতিষ্কগণ গুরুতরকে পরিভ্রমণ করে। লাম্বর্টের মতে এরূপ বিগ্রহ সৌর জগৎ ভিন্ন অন্যান্য জগতে থাকিতে পারে। উপগ্রহ অপেক্ষা গ্রহ বড়, গ্রহ অপেক্ষা সূর্য্য বড়; অতএব তাঁহার মতে তারাসংঘাতের মধ্যবর্ত্তী পিণ্ড আরও বড় এবং ইহাকেই পরিবেষ্টন করিয়া এক এক সৌর জগৎ ঘূরিতেছে। মধ্যবর্ত্তী পিণ্ড সকল দৃষ্টিগোচর হয় না, তজ্জন্য তিনি বলেন সে গুলি অস্বচ্ছ বা নিষ্প্রভ। ক্ষুদ্রতম জগৎ হইতে বৃহত্তম জগৎ পর্য্যন্ত এক মহাকর্ষণে আবদ্ধ হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে ইহাও তাঁহার অনুমান।

উক্ত নিষ্প্রভ মধ্যবর্ত্তী পিণ্ডের অস্তিত্বসম্বন্ধে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত কিছুমাত্র প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, অতএব বলিতে হইবে লাম্বর্টের মনঃকল্পিত সৃষ্টিবাদের শাস্ত্রীয় মূল নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীমাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের ইংরাজী।

অবনতি,	Inclination.	আকাশ গঙ্গা,	Galaxy.
উপগ্রহ,	Satellite.	কালপুরুষ,	Orion, অগ্রহায়ণ।
কেন্দ্র,	Centre.	কেন্দ্র বিমুখ,	Centrifugal.
কোমর বাঁধ,	Belt.	ক্রান্তিবৃত্ত,	Ecliptic.
ক্ষোদিষ্ঠ,	Smallest.	গ্রহমেখলা,	Asteroids, Planatoids.
নিজের গতি,	Proper motion.	নীহারিকা,	Nebula.
মাঙ্গলা,	Martial. Of mars.	রাশিচক্র,	Zodiac.
বার্হস্পত্য,	Jovial.	বিচিত্রবীর্য্য,	Hercules.
বেধপত্র,	Papers on Observation.	সুরদীর্ঘিকা,	Galaxy.
হস্তমিত,	Miniature.		

—(০)—

নীল।

অন্যান্য অনেক দ্রব্যের ন্যায় নীলেরও প্রাচীন ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। যে নীলতরু অধুনা রঙের নিমিত্ত আবাদ হইতেছে—যাহার প্রসাদে বঙ্গ-বিহারে কত সৌধমালা আকাশে শিরোন্নত করিয়া ইংরাজের বাণিজ্য-বুদ্ধির পরিচয় দিতেছে, যাহার কল্যাণে কত বিদেশীয় বণিক ও তাঁহাদিগের শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারিগণের ধনাগম হইতেছে, যাহার প্রভাবে কত কত স্থানে 'নীলদর্পণের' কোন না কোন অঙ্কের অভিনয় হইয়া গিয়াছে—সেই নীলতরুকে উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিশারদগণ 'ইণ্ডিগোফেরা টিংটোরিয়া' (Indigofera tinctoria) কহেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বপুরুষ

কি জাতি কি নাম ধরে
কোথায় বসতি ক'রে

তাহার সর্ব্ববাদিসম্মত মীমাংসা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। বৈদিক সময়ের কথা জানি না; কিন্তু দুর্গোৎসবে নীল বস্ত্রের ব্যবস্থা দেখিয়াছি; বৈদ্যক শাস্ত্রে "নীলিনী" প্রচলিত আছে। মামী নামক সুরক্ষিত মিসরীয় মৃতদেহ নীল বসনাবৃত দেখা গিয়াছে। খৃষ্টাব্দের চারিশত বৎসর পর্য্যন্ত মামী প্রথা প্রচলিত ছিল; সুতরাং অন্ততঃ ঐ সময় মিসরে নীল রঙ প্রচলিত ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয়। প্লিনী এই রঙকে "ইণ্ডিকাম্" নামে অভিহিত করিয়া কহিয়া

গিয়াছেন যে ইহা সিন্ধুতীরস্থ বারিকাম্ (?) নগর হইতে তাঁহার সময় য়ুরোপে আসিত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মার্কোপলো ত্রিবঙ্কুরে ইহা দেখিয়াছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তেভার্ণিয়ার ইহার প্রস্তুতপ্রণালী বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে সময় যে নীলরঙ প্রচলিত ছিল তাহা বর্ত্তমান নীলতরু হইতে প্রস্তুত কিনা, অথবা এই জাতীয় অন্য কোন উদ্ভিদ্ হইতে,—তাহা বলা কঠিন। ডাক্তার ওয়াট বলেন এতজ্জাতীয় প্রায় চল্লিশটি উদ্ভিদ বর্ত্তমান সময়ে ভারতের নানাস্থানে বিরাজ করিতেছে।

য়ুরোপে পূর্ব্বে ওড (Woad) নামক তরু হইতে নীলরঙ প্রস্তুত হইত। অধুনা তিব্বৎ, আফগানস্থান প্রভৃতি স্থানে ইহার চাষ হয়; কোন কোন স্থানে স্বভাবজাতও হইয়া থাকে; দেখিতে অনেকটা বড় বাঁধা কপির ন্যায়। চীনদেশে ওড হইতেই নীলরঙ প্রস্তুত হয়। প্রাচ্যজগতে এক সময় এই তরু অতি গৌরবের স্থান অধিকার করিয়াছিল। ফ্রান্সের অন্তর্গত ল্যাংগুয়াডোর ধনবান রাজন্যগণের বিপুল সম্পত্তি এই ওডরঙ হইতে। জর্ম্মাণীর যে সকল বণিক এই রঙের ব্যবসায় করিতেন তাঁহারা "ওড-হার্ণ" নামে অভিহিত হইয়া গর্ব্ব করিতেন; সাম্রাজ্যে তাঁহাদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। ভারতবর্ষের নীল সে সময় য়ুরোপে যাইত বটে, কিন্তু অতি অল্প পরিমাণে; তাহা কেবল ওড-রঙ ঘনীভূত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। ষোড়শ শতাব্দীর প্রান্তভাগে প্রাচ্যজগতের তদানিন্তন সর্ব্বোৎকৃষ্ট রঙরাজ ওলন্দাজগণ ভারতীয় রঙের উপকারিতা বিলক্ষণ বুঝিতে পারে। সে সময় এবং তৎপর শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত, ইংলণ্ড বস্ত্রবয়ন করিয়া হলণ্ডের নিকট রঙ করিয়া লইত। ওলন্দাজগণ রঙ-রাজের কার্য্যে পটুতালাভ করিয়া বিশেষ ধনশালী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে সময় ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যে পর্ত্তুগিজগণই অদ্বিতীয়। এই উভয় জাতির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে ১৬০১ খৃষ্টাব্দে 'ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' গঠিত হয়। ইঁহারা এমনই উদ্যমের সহিত বাণিজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন যে, নীল-ব্যবসায় তাঁহাদিগের 'এক চেটিয়া' হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে য়ুরোপে নীলের প্রতিপত্তি হইল। ওড নতশির ও নিষ্প্রভ হইবার উপক্রম হইতেছে দেখিয়া ফ্রান্স জর্ম্মাণী ও পর্টুগাল চিন্তান্বিত হইল। ফ্রান্সের চতুর্থ

হেন্‌রী অনুজ্ঞা প্রচার করিলেন যে তাঁহার রাজ্যে কেহ নীলরঙ ব্যবহার করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে! জর্ম্মাণী ও পর্টুগালও ইহার ব্যবহার বন্ধ করিয়া দিলেন। নীল বিষাক্ত ঘোষিত হইয়া ইংলণ্ডেও ইহার প্রচলন রহিত হইল। কিন্তু ইংলণ্ডের এ কার্য্য ওডরক্ষার্থ নহে। ইহার অন্য কারণ ছিল। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে এক ব্যক্তি নীলরঙ-রাজের প্রণালী শিক্ষা করিলে সম্রাট অনুকম্পা করিয়া তাঁহাকে রঞ্জনকার্য্যে এক চেটীয়া প্রদান করেন, ও হলাণ্ডে বসনপ্রেরণ নিষেধ করিয়া দেন। এই চেটীয়াদারের জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া বস্ত্রব্যবসায়িগণ ধুয়া তুলিল যে নীল বড় বিষাক্ত। কথাটা খাটিল ভাল। জনসাধারণের মন বিগড়াইয়া গেল। এই নীল-নিষেধাজ্ঞা ইংলণ্ডে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। ইতিপূর্ব্বে 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারতে বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছেন, এবং নীলব্যবসায়ে হস্তার্পণ করিতে না পাইয়া আপনাদিগকে বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত বিবেচনা করিতেছেন। দ্বিতীয় চার্লস নীলের আইন রহিত করিয়া কোম্পানীর লভ্যের নূতন উৎস খুলিয়া দিলেন। বেলজিয়ম হইতে রঙ-রাজ আনাইয়া ইংরাজ পুনরায় নীলরঞ্জন শিক্ষা করিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বোম্বাই, সুরাট, আগ্রা, লাহোর ও আহম্মদাবাদ হইতে নীল ক্রয় করিয়া বিলাতে রপ্তানী করিতে লাগিলেন। সে সময় বঙ্গবিহারে নীল রঙ প্রস্তুত হইত না।

দুইশত বৎসরের মধ্যে নীল রঙ য়ুরোপে এতই প্রতিপত্তি লাভ করিল যে ক্রমে ক্রমে উহা প্রাচ্য দেশের সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতে লাগিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রান্স ও পর্টুগালে ইহার বিরুদ্ধ আইন রহিত হইয়া গেল।

এতকাল নীল রঙ ভারতবাসিগণই প্রস্তুত করিতেছিলেন। অধিকতর লাভের আশায় বিমুগ্ধ হইয়া য়ুরোপীয় বণিক উহার কৃষি ও প্রস্তুতকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ বলেন যে বিদেশীয়গণের মধ্যে ফরাসীরাই সর্ব্ব প্রথম চন্দননগরের সন্নিকটে এক নীলকুঠি নির্ম্মাণ করেন, কিছুকাল পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও প্রতিবাসীর অনুসরণ করিলেন। এবং আমেরিকা হইতে কৃষিকুশল কর্ম্মচারী আনাইয়া স্থানে স্থানে নীল-কুঠি খুলিলেন, নীলব্যবসায় করিবার জন্য আপন কর্ম্মচারিগণকেও অনুমতি দিলেন। ঠিক যে সময় ভারতের নীল জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিল সেই সময়

ইহার প্রস্তুতকার্য্য ভারতীয়দিগের নিকট হইতে যাইয়া বিলাতি বণিকের গৃহে লক্ষ্মীরূপে অধিষ্ঠিত হইল। ভারতীয় নীল য়ুরোপীয় ওডকে পরাস্ত করিল বটে, কিন্তু ভারতীয়গণ কর্ম্মদোষে তাহার ফলভোগের অধিকারী হইল না।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্বয়ং অধিক দিবস নীলোৎপাদনে ব্রতী ছিলেন না। অপর সাহেবে নীলকুঠি খুলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কোম্পানী তাঁহাদিগকে ভূমি দিয়া, টাকা দিয়া, রঙ বিক্রয়ের কণ্ট্রাক্ট দিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় ২২ বৎসর কাটিল। নীলকুঠি সকল সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী টাকা দাদন বন্ধ করিয়া দিলেন। যাহাতে বঙ্গবাসী নীলকুঠি করিয়া বাণিজ্যের সাহায্য করে ও উপযুক্ত জামিন দিয়া আবশ্যক হইলে টাকা দাদন গ্রহণ করে তদর্থে ১৮১১ সালের এপ্রিল মাসে কোম্পানীর বিলাতস্থ ডিরেক্টরগণ ভারতে এক মন্তব্য প্রেরণ করেন। কিন্তু যাঁহাদিগের জামিন দিবার সামর্থ্য ছিল, তাঁহারা নানা কারণে দাদন লইতে পারিলেন না; বঙ্গদেশে করসংগ্রাহকগণ ভূস্বামী সাজিয়া তখনও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আবর্ত্তে হাবু ডুবু খাইতেছিলেন। বোধ হয়, সরকারের দাদন-গ্রহণ সময় সময় যে কি ঝকমারি,—তাহাও কেহ কেহ বুঝিয়াছিলেন। যে অত্যল্প সংখ্যক বাঙ্গালী কুঠি খুলিলেন তাঁহারা ভাল করিয়া উহা চালাইতে পারিলেন না। পার্শ্ববর্ত্তী বিদেশীয় কুঠিয়ালগণের সহিত অনিবার্য্য 'জীবন সংগ্রামে' পরাস্ত হইয়া স্বভাবশাসনে তাঁহারা একে একে সমরপ্রাঙ্গণ হইতে বিদায় লইলেন।

বিদেশীয় কুঠিয়ালগণ দেশীয় কৃষকদ্বারা নীল চাষ করাইতে লাগিলেন; অনেকে দেশীয় জমিদারের জমিদারী ক্রয় করিলেন বা ইজারা লইলেন। সাহেবের দাদন লইয়া কৃষক নীল চাষ করিতে লাগিল, ও কুঠিয়ালের ইচ্ছানুরূপ "নীল পাতিয়" মূল্য পাইতে লাগিল। সুযোগ পাইলে কৃষক কুঠিয়ালকেও ঠকাইতে ছাড়িত না। ১৮৩০ সালে আইন হইল যে, দাদন লইয়া নীল চাষ না করিলে কৃষকের কারাদণ্ড হইবে। সে আইনের কঠোরতা ১৮৩৫ সালে কথঞ্চিৎ হ্রাস হইল বটে; কিন্তু এখনও কৃষাণ সম্পূর্ণরূপে কুঠিয়ালের করায়ত্ত রহিল। সোণার কাটী ও রূপার কাটী হাতে লইয়া কুঠিয়ালগণ সতেজে নীল উৎপাদন করিতে লাগিলেন। কৃষক কুঠিয়ালকে

ফাঁকি দিতে যায়, কিন্তু ধরা পড়িয়া বিবিধ বিধানে নিষ্পেশিত হয়। এইরূপে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোর মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়া বাণিজ্যের ও দেশের বিশেষ অনিষ্ট হইতে লাগিল। অবিরল দাঙ্গা হাঙ্গামা ও মামলা মোকদ্দমা কয়েক বৎসর চলিতে চলিতে, অবশেষে, ১৮৬০ সাল হইতে সপ্তবর্ষব্যাপী 'নীল-বিদ্রোহ' উপস্থিত হইল। সে দুর্দ্দিনের কথা আর বিস্তারিত বর্ণনা করিব না। সকলেই জানেন—

"নীল বানর সোণার বাঙ্গলা কল্লে এবার ছারে খার।
অসময়ে হরিশ মলো লংয়ের হলো কারাগার॥
প্রজার আর প্রাণ বাঁচান ভার।"

"হে নিদয় নীলকরগণ।
আর সহেনা প্রাণে এ নীলদহন
কৃষকের ধনে প্রাণে, দহিলে নীল-আগুণে।
গুণরাশি কি কুদিনে, কল্লে হেতা পদার্পণ।
দাদনের সুকৌশলে, শ্বেত সমাজের বলে,
লুঠেছ সকল তো হে কি আর আছে এখন॥"

"বিদ্যাভূনী" কৃত এই সকল অতিরঞ্জিত গান "নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর প্রজানিকর-ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীতং" নাটকের পর হইতে একাল পর্য্যন্ত প্রান্তরে প্রান্তরে পাঁচনিপাণী গোপালিকার কিশোর কণ্ঠ কম্পিত করিয়া দূর সমীরে উদাস ভাবে মিশিয়া যাইতেছে!

১৮৬৮ সালের ৮ আইন দ্বারা নীলদাদনপ্রথা প্রশমিত হইল। এই সময় ছোটলাট লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন——

"Setting aside individual cases having no connection, or at least no necessary connection, with the indigo system, that system is fairly chargable with a very notable portion of those classes of offences, the pecular prevelence of which in Bengal has been [illegible] the first a blot in our administration. In my opinion it is rather the system than the planters individually who are to be blamed."

ভাবার্থঃ——নীলের প্রচলিত প্রথাই যত দোষের মূল, ইহাতে কোন নীলকরের ব্যক্তিগত দোষ নাই। এই প্রথার প্রচলননিবন্ধন যে কয়েক প্রকার অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা আমাদিগের শাসনে কালিমা লেপন করিয়াছে।

নীলবিদ্রোহের সময় কৃষককুলই যে কেবল ধনে প্রাণে মরিয়াছিল, তাহা নহে; কুঠিয়ালগণকেও বহুবিধ লাঞ্ছনা, ক্লেশভোগ ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ে ১৮৩০ সালে সংশোধিত ১৮২৩ সালের ৬ কানন, এবং ১৮৩৬ সালের দশ আইন নীলকার্য্যসৌকর্য্যার্থ প্রচলিত আছে। ইহার অনুশাসনে——

(১) দাদন গ্রহিতা কৃষক নীল আবাদ করিতে বাধ্য; নতুবা ফৌজদারি সোপর্দ্দ হইতে পারে।

(২) চুক্তির মেয়াদ গত হইলে কৃষক পুনরায় দাদন লইতে বাধ্য নহে। মেয়াদমধ্যে আদালত হইতে স্থিরীকৃত খেসারৎ-প্রদানে কৃষক চুক্তি হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে।

(৩) চুক্তিভঙ্গের দোষে কৃষক জোত হইতে উচ্ছেদ হইতে পারে না।

এই প্রকার আইন প্রচলন সত্ত্বেও ১৮৭৬-৭৭ সালে বিহার অঞ্চলে গোলযোগ উপস্থিত হয়। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গভর্ণমেণ্ট যত্নবান হন। কিন্তু তৎসময়ে দুর্ভিক্ষে কুঠিয়ালগণ কৃষককুলকে সাহায্য করায় সকল গোলযোগ মিটিয়া যায়; এবং গভর্ণমেণ্টকে আর কোন প্রকার চেষ্টা করিতে হয় নাই। ১৮৮৬ সালের ৮ আইনের দশম অধ্যায় অনেক প্রকারে কৃষাণগণকে (রায়ৎ) বিনাশের হস্ত হইতে রক্ষা করিতেছে। সম্প্রতি এই অধ্যায়ের সংশোধনমানসে আইনসভায় পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হইয়াছে।

প্রাগুক্ত সপ্তবর্ষব্যাপী নীলবিদ্রোহের পর হইতে বঙ্গদেশে নীলকুঠির সংখ্যা হ্রাস ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা এবং মান্দ্রাজে উহার বৃদ্ধি হইয়াছে। নীলের মূল্য কমিয়া যাওয়ায় অনেক বণিককে নীল ব্যবসায় সংক্ষোচ করিতে হইয়াছে।

ভারতীয় নীল য়ুরোপীয় ওডকে কিরূপে নির্ম্মূল করিয়াছে তাহা ইতি-পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। কিন্তু বুঝি বা, য়ুরোপ এত দিনে তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে। জর্ম্মাণীর রসায়নাগারে আলকাতরা হইতে নীলানুরূপ রঙ বাহির হইয়াছে। কয়েক বৎসরের পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের ফলে যাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার বহুল প্রচলনকল্পে জর্ম্মাণগণ যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ন করিতেছেন। এই বিশ্লেষণ ব্যাপারে দুই রঙ পাওয়া গিয়াছে; একটি নীল রঙ অপেক্ষা ভাল, অপরটি তদপেক্ষা নিকৃষ্ট। যদি এই রঙ অপেক্ষাকৃত স্বল্প ব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া নীল অপেক্ষা সুলভতর মূল্যে বিক্রয় করা যাইতে পারে, তাহা হইলে নীলের অন্তিমকাল সমাগত বলিতে হইবে। নীল কংসকে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত জর্ম্মাণ নন্দালয়ে নবঘনশ্যাম দিন দিন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে; তাহার বিনোদ বাঁশীর-রব শ্রুত হইতেছে। কালে তাহা নীলের স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবেশন করিবে। এত দূর ভরসার হেতু এই যে নীলকে এমন সকল নৈসর্গিক ব্যাপারের উপর নির্ভর করিতে হয় যে, তাহাদিগের উপর মানবের বর্ত্তমান সামান্য জ্ঞান আধিপত্য লাভ করিতে পারে নাই; অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি শিলাবৃষ্টি, প্রভঞ্জন ইত্যাদির উপর আমাদের কোন শাসন নাই; কীট পতঙ্গগণ প্রাদুর্ভূত হইলে তাহাদিগকে বিদূরিত করিবার আমাদিগের তাদৃশ শক্তি নাই। নীলজলমন্থনকার্য্যে সকল সময় আমাদিগের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য হওয়া অসম্ভব হয়। কিন্তু এই সকল গুলির উপরই নীলের উৎকর্ষতানুৎকর্ষতা নির্ভর করে। কিন্তু আলকাতরা-গর্ভসম্ভূত নীলরঙ কেবল রাসায়নিক ক্রিয়ায় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। কেমিকেল বিশ্লেষণের কল ও দক্ষ মানুষ হইলেই উহার কার্য্য চলিবে। আলকাতরা ভূগর্ভস্থ পাথরিয়া কয়লা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কয়লা বর্ষাকালে খনি হইতে যদিও অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে উত্থিত হয়, যদিও কুলিগণ সময় সময় ধর্ম্মঘট করিয়া ইহার উত্তোলন বন্ধ করে, তথাপি কয়লা সুসময়ে সঞ্চয় করিয়া রাখিবার সুবিধাহেতু বর্ষা ও ধর্ম্ম-ঘট ইহার বিশেষ বিপক্ষতাচরণ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। নীলপ্রস্তুত বৎসরের কেবল কয়েক মাস চলে কিন্তু আলকাতরা লইয়া বিশ্লেষণ ব্যাপার সারা বৎসর চলিবে। প্রত্যক্ষ নীলকার্য্যে যত লোক

প্রয়োজন হয় টন হিসাবে রাসায়নিক রঙে তদপেক্ষা কম লোক আবশ্যক এবং তজ্জন্য পর্য্যবেক্ষণের ব্যয়ও ইহাতে স্বল্প পড়িবে। তবে এক কথা ইহাতে শিক্ষিত শ্রমজীবী নীল অপেক্ষা অধিক লাগিবে।

আলকাতরা হইতে সমুৎপন্ন ম্যাজেণ্টা প্রভৃতি এনিলাইন রঙ ভারতের লাক্ষাকে পরাভূত করিয়াছে; এক্ষণে নীল যাইবার উপক্রম। দেশীয়গণ-পরিচালিত লাক্ষার ব্যবসায় যত শীঘ্র মুমূর্ষুদশাপন্ন হইয়াছে, কৌশল-কুশল বণিক চূড়ামণিগণের হস্তে থাকিয়া নীল তত শীঘ্র আত্মসমর্পণ করিবে না। রাজ-শক্তি ,আইন করিয়াও ইহাকে কিছুদিন রক্ষা করিতে পারিবেন। কিন্তু যখন জর্ম্মাণ রঙ কমমূল্যে বিক্রীত হইতে থাকিবে, তখন এ সকল বালির বাঁধ কোথায় ভাসিয়া যাইবে! অহর্নিশি যে "জীবন সংগ্রাম" জীবজগতে চলিতেছে, তাহাতে যাহাতে পদপ্রমাণ পরাভূত না হইতে হয়, তজ্জন্য কি পশু-পক্ষী-মীন-মকর, কি শঙ্খ-কূর্ম্ম-কীট পতঙ্গ, কি পলিপ-পুরুভুজ-পলিজোয়া-মনাত, কি ওষধি-তরু-লতা-গুল্ম,—নিরন্তর ছল-বল কৌশলপ্রকাশে বিবিধ বিধানে যত্ন করিতেছে। ইহাদিগের যেমন জাতিতে জাতিতে, দলে দলে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে অবিরাম ঘোর রণ বাধিয়া আছে, সেই-রূপ আবার প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের, এবং প্রত্যেকের প্রতি কণার সহিত প্রতি কণার অবিশ্রান্ত সংগ্রাম নীরবে চলিতেছে। ঠিক সেই প্রকার বাণিজ্যজগতে একটি ব্যবসায়ের নিরন্তর মহারণ চলিতেছে। মানবের চিন্তা ও উদ্ভাবনী শক্তি সে রণরঙ্গ কথঞ্চিৎ অপ্রকাশমান রাখিতে পারে বটে, সমার্থপর বণিকদল সম্রাট-শক্তির সাহায্য পাইলে প্রতিদ্বন্দী পণ্যের কিছুকাল সামঞ্জস্য রাখিতে সমর্থ হয় বটে; কিন্তু ভীমকাল-চক্রের আবর্ত্তে ঘটনা-পরম্পরার বৈচিত্র্যে সে সামঞ্জস্য অচিরে নষ্ট হইয়া যায়। জীব-জগতে যেমন প্রত্যেকে পদস্থ থাকিবার জন্য চেষ্টা করে, সেইরূপ বাণিজ্য-জগতেরও পণ্যদ্রব্যকে সর্ব্বদা "পরিবেশ্যমান জগতের" (Environment) উপযোগী করিতে বণিককে যথাশক্তি চেষ্টা করিতে হয়। উপযোগী না করিতে পারিলে সেই পণ্যের স্থান প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে সংসারক্ষেত্র হইতে বিলুপ্ত হইয়া পড়ে।

শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস।

রাজা রামানন্দ রায়।

রামানন্দ রায় বাঙ্গালা বা সংস্কৃতসাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন না হইলেও, উপন্যাসকার বা কবির উর্ব্বরা কল্পনা তাঁহার প্রসূতি নহে। এদেশের প্রকৃত ইতিহাস এখনও রচিত হয় নাই। যখন বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস রচিত হইবে, যখন মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দক্ষিণাপথের ধর্ম্মপ্রচার-কাহিনী সেই ইতিহাসের একটি অধ্যায়ে সঙ্কলিত হইবে, তখন রাজা রামানন্দ রায়ের প্রকৃত ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ইতিহাস-পাঠক উপলব্ধ করিবেন। নদীয়ার ব্রাহ্মণসন্তান বিশ্বম্ভর যেমন একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, উড়িষ্যার গজপতি প্রতাপরুদ্রদেব যেমন কল্পনাপ্রসূত নহেন, সেইরূপ রাজা রামানন্দ রায়ও একজন প্রকৃত ঐতিহাসিক পুরুষ। চৈতন্যদেবের ধর্ম্মপ্রচার ও প্রতাপরুদ্রের রাজ্যশাসনের ইতিহাসে রাজা রামানন্দের নাম অবশ্যই উল্লিখিত হইবে।

গোবিন্দদাসের করচার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। সুকুমার শিল্পচাতুর্য্যহীন লৌহকার গোবিন্দের কঠিন অঙ্গুলীর অগ্রভাগে কোমল কল্পনা অগ্রসর হইতে সাহসী না হওয়ায়, করচার ঐতিহাসিকতা রক্ষিত হইয়াছে, ইহা আজকাল অনেকেই বিশ্বাস করেন (১)। এই গোবিন্দদাসের করচাতেও রামানন্দের উল্লেখ আছে। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন এবং তথায় কিছুকাল থাকিয়া দক্ষিণাপথ যাত্রা করেন। দক্ষিণ-যাত্রাকালে পথিমধ্যে গোদাবরী তীরে রামানন্দের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

১৪০৭ শকাব্দে চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হন এবং চতুর্বিংশ বর্ষে অর্থাৎ ১৪৩১ শকাব্দায় মাঘমাসে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ১৪৩২ শকাব্দার ৭ই বৈশাখে মহাপ্রভু দক্ষিণযাত্রা করেন (২) এবং সম্ভবতঃ এই বৈশাখ মাসের মধ্য-

(১) দীনেশ বাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।"

(২) "তার পর বৈশাখের সপ্তম দিবসে।
দক্ষিণে করিলা যাত্রা ভাসি প্রেম রসে॥" গোবিন্দদাসের করচা।

ভাগেই মহাপ্রভুর সহিত রামানন্দের সাক্ষাৎ হয়। বেদান্তাদিশাস্ত্রপারদর্শী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পরিচয়ে—

"রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী তীরে। পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস দুহেঁর তিহোঁ সীমা।(১)
অধিকারী হয়েন তিহোঁ বিদ্যানগরে॥ আর—
শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে উপেক্ষা না করিবে। "রসজ্ঞ ভক্তের শ্রেষ্ঠ রামনন্দ রায়।
আমার বচনে তারে অবশ্য মিলিবে॥ কৃষ্ণ নামে সদা সিক্ত নয়নধারায়॥
তোমার সঙ্গের যোগ্য তিহোঁ একজন। বিশুদ্ধ আনন্দ ভোগ রাম রায় করে।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তার সম॥ হরিনামে হয় তাঁর আনন্দ অন্তরে॥ (২)

চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ অর্থাৎ ১৪৩২ শকাব্দার পূর্ব্বেই যে রামানন্দ রায়ের পাণ্ডিত্য ও ভক্তিমত্তার কথা দিগ্‌দিগন্তরে প্রচারিত হইয়াছিল, ইহা তৎকালীন প্রথিতযশা অধ্যাপকপ্রবর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বাক্যে নিঃসংশয়িত রূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রাচীন বৈষ্ণবকবিগণ কর্ত্তৃক স্বয়ং গীষ্পতি বৈকুণ্ঠনাথ রূপে বর্ণিত। সাধারণ বিশ্বাসমতে তিনি নানা শাস্ত্রপারদর্শী হইয়াছিলেন। কিন্তু এহেন মহাপ্রভুকে রামানন্দ রায়ের সহিত সাধ্যনির্ণয় প্রসঙ্গালোচনাকালে অল্পভাষী তত্ত্বজিজ্ঞাসুভাবে উপবিষ্ট দেখা যায়। আবার মহাপ্রভু যখন দক্ষিণভ্রমণানন্তর বিদ্যানগরে আসিয়া সাক্ষাৎ করেন, তখন তিনি তীর্থযাত্রার বৃত্তান্ত কথনান্তে রামানন্দ রায়কে "কর্ণামৃত" ও "ব্রহ্ম-সংহিতা" নামক দুই খানি পুথি দিয়া কহিলেন,—

"——তুমি যে প্রেম সিদ্ধান্ত কহিলে।
এই দুই পুস্তকে সেই রস সাক্ষী দিলে॥" (৩)

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুতে ভগবদ্বুদ্ধি না করিয়া তাঁহাকে অসাধারণ প্রতিভাশালী অথচ অতুলনীয় মানসিক, নৈতিক ও ধর্ম্মবলসম্পন্ন একজন সহজ মানুষ মনে করেন, তাঁহারা এইরূপ বর্ণনা হইতে স্বতঃই এই নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত করিবেন যে, রামানন্দ রায় কি শাস্ত্রার্থদর্শনে, কি প্রেমরসজ্ঞতায় শ্রীম-

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ।
(২) গোবিন্দ দাসের করচা।
(৩) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদ।

মহাপ্রভু হইতে ন্যূন ছিলেন না; এবং সেই কারণে তিনি শূদ্র হইয়াও মহাপ্রভুর নিকট শ্রদ্ধেয় ও সম্মানার্হ হইতে পারিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু গোদাবরী উত্তীর্ণ হইয়া যখন স্নানাদি সমাপনান্তে শ্রীশ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময়ে

"——দোলায় চড়ি রামানন্দ রায়।
স্নান করিবারে আইলা বাজনা বাজায়॥
তার সঙ্গে বহু আইলা বৈদিক ব্রাহ্মণ।" (১)

"বিদ্যানগর-অধিকারী" রামানন্দ রায়ের তদানীন্তন মানসম্ভ্রম, পদগৌরব ও বিত্তবিভব কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই সংক্ষিপ্ত ত্রৈপাংক্তিক বিবরণ হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বিবিধ বাদ্যভাণ্ড যাঁহার স্নানযাত্রা ঘোষণা করে এবং বহুসংখ্যক বিদ্বান বৈদিক ব্রাহ্মণ যাঁহার সতত সহচর থাকিতেন, তাঁহার আসন যে স্বাধীন রাজার সিংহাসন হইতে অধিক দূরে পাতিত হইত—এরূপ অনুমান করিতে পারা যায় না।

দক্ষিণাপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে "একা না যাইব পুরী ফেলি রাম রায়ে" ভাবিয়া মহাপ্রভু একেবারে শ্রীক্ষেত্রে না গিয়া বিদ্যানগরে গমন করেন এবং তাঁহার সহিত একত্রে শ্রীক্ষেত্র যাইবার জন্য রামানন্দ রায়কে অনুরোধ করেন। ইহাতে রামানন্দ বলিলেন—

"——প্রভু আগে চল নীলাচলে।
মোর সঙ্গে হাতী ঘোড়া সৈন্য কোলাহলে॥
দিন দশ ইহা সবার করি সমাধান।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব প্রয়াণ॥" (২)

রামানন্দের হস্তে এই সময়ে অর্থাৎ মহাপ্রভুর দক্ষিণাপথ ভ্রমণকালে (১৪৩২—১৪৩৪ শকাব্দায়) কিরূপ কার্য্যভার ছিল, চৈতন্যচরিতামৃতের উক্ত পংক্তিচতুষ্টয় হইতে সহজেই অনুমিত হইবে।

খৃষ্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে উড়িষ্যা ভারতবর্ষের মধ্যে একটি গণনীয় পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল। প্রতিবেশী রাজগণ অনেক সময়েই উৎকলরাজগণের

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, ৮ম পরিচ্ছেদ, মধ্যলীলা।
(২) মধ্যলীলা, ৯ম পরিচ্ছেদ, চৈতন্যচরিতামৃত।

সহিত মৈত্রী রক্ষার জন্য সচেষ্ট থাকিতেন। উত্তরে ভাগীরথী ও দক্ষিণে সেতুবন্ধ উৎকলভূপতিগণের রাজ্যসীমা নির্দ্দেশ করিত। রাজা প্রতাপরুদ্রের সময় উৎকলরাজগণের চিরার্জ্জিত প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ছিল। দক্ষিণাপথের মুসলমান ভূপতিগণের সহিত অস্ত্রপরীক্ষায় তিনি সফলতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং সুপ্রসিদ্ধ বিজয়নগর রাজ্য এক সময়ে ইঁহা কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। প্রতাপী প্রতাপরুদ্রের সময়ে রামানন্দ গোদাবরীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ভূভাগ শাসনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সেই সময়েই মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। চৈতন্যদেবের দক্ষিণাপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি তাঁহার সহগামী হইয়া শ্রীক্ষেত্রে যাইতে সক্ষম হন নাই। হস্ত্যশ্ব সৈনিক কোলাহল দশ দিবসের কমে নিবারণ করিয়া যাওয়া একজন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পক্ষে সম্ভবও ছিল না।

এই পর্য্যন্ত যাহা আলোচনা করা হইল, তাহাতে স্থিরীকৃত হইল যে ১৪৩২ শকাব্দায় রামানন্দের পাণ্ডিত্য দূরবিশ্রুত, প্রেমরসজ্ঞতা চৈতন্যদেবেরও বিস্ময়বর্দ্ধিনী, এবং শাস্ত্রার্থজ্ঞান পণ্ডিতসমাজেরও স্বীকৃত ছিল। মহাপ্রভু তাঁহাকে

"কৃষ্ণভক্ত রামানন্দ হয় পূজনীয়।
রামানন্দ রায় মোর প্রাণ হৈতে প্রিয়॥" (১)

বলিয়া ভাবিতেন এবং একখানি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অধিবাসিগণ তাঁহাকে রাজপ্রতিনিধির সম্মান প্রদান করিত। এখন জিজ্ঞাস্য যে এই সময়ে রামানন্দের বয়োক্রম কত হইয়াছিল? যাহা আলোচনা করা হইয়াছে, রামানন্দের বয়োনিরূপণে তদধিক আলোচনার আর আবশ্যকতা বোধ হয় কেহ স্বীকার করিবেন না! সেই সময়ে রামানন্দের বয়স যে পরিণত হইয়াছিল, রামানন্দ যে এই সময়ে অন্ততঃ চত্বারিংশ বর্ষ বয়স্ক ছিলেন, তাহা স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। আমরা সুবিধার অনুরোধে এই স্থলে রামানন্দের জন্ম শক ১৪৩২—৪০=১৩৯২ অথবা ১৩৯২+৭৮=১৪৭০ খৃষ্টাব্দ ধরিয়া লইলাম। এই হিসাবে রামানন্দ রায় চৈতন্যদেবের ১৫ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে উড়িষ্যার সিংহাসনে প্রবলপরাক্রান্ত স্বনামপ্রসিদ্ধ কপিলেন্দ্রদেব, বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তৃপদে হাবসীনেতা বারবক শাহ এবং দিল্লীর বাদশাহতক্তে বেলোলী লোদী অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শ্রীরাধেশচন্দ্র শেঠ।

(১) গোবিন্দ দাসের করচা।

কবিতাকুঞ্জ।

অর্দ্ধস্ফুট ফুল।

বিকচ কুসুমদাম বিতরে সৌরভ,
মধুকর গুণ গানে বাড়ায় গৌরব!
সমীর-আদরে আর মধুকর-গানে
মুকুল ফুটিতে চায় উৎসুক প্রাণে!
আধ আঁখি মেলি আর না চায় মেলিতে
(পাছে) ফুটিলে ঝরিতে হয় ঝরিলে মরিতে!

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

আদর।

হাসরে সোণার খোঁকা হাস একবার
তোর ওই সুধাহাসি, আমি বড় ভালবাসি
ও হাসিতে হয় প্রাণে কৌমুদীসঞ্চার,
হাসরে সোণার যাদু হাস একবার।
সরল তরল হাসি মাখিয়া অধরে
কচিমুখে ফুল্ল হাস, কি অমিয় পরকাশ—
হাসরে মধুর হাসি দেখি প্রাণ ভরে'
ভূলোক দ্যুলোক দুই বাঁধি এক ডোরে।
কোন স্বর্গে ছিলি যাদু শান্তির ছায়ায়
সে স্থান কি মনোহর, যেথায় মন্দার থর
সৌরভ-গৌরবে প্রাণ পুলকে মাতায়—
তেয়াগি সে কেন এলে দুখের ধরায়?
এ ধরা যে শান্তিহীনা ওরে যাদুমণি

তা কিরে জান না তুমি, জানিলে কি দেবভূমি
ছাড়িয়া আসিতে এই দুখের আগার,
তুই ত্রিদিবের শিশু শান্তির আধার।
এসেছ খেলিতে যদি এ ছার ধরায়
এই ত খেলার বেলা, খেলাও সুখের খেলা
বিষাদ কালিমা যেন না ঘেরে তোমায়
কাটে যেন চিরদিন, হাসি ও খেলায়!
হাসুরে প্রাণের যাদু হৃদয়রতন
শরতের পূর্ণ রাকা, বাসন্তী কৌমুদী মাখা
ধরায় ত্রিদিবশোভা নন্দনকানন
দেখারে সোণার যাদু জুড়াক্ জীবন।

শ্রীরাইকিশোরী দেবী।

যুগল রবি।

রবি শর্ম্মা, রবি বর্ম্মা—দুই দীপ্ত রবি—
হরিতে তিমিররাশি হয়েছে উদয়;
পূরব পশ্চিম ঘাটে হের চারুচ্ছবি,
জ্বলিছে প্রতিভাপুঞ্জ দিক্‌দেশময়!
একের "মানসী" বধূ স্বর্গীয় সুন্দর,
"সোণার তরীতে" রাখি চরণ দু'খান,
কহে ত্রিদিবের বার্ত্তা, প্রফুল্লঅন্তর,
বিভোর জগতবাসী করে সুধাপান।
অপরের "তিলোত্তমা" নগ্ন সুষমার
কেমন মোহন মূর্ত্তি—পূত, অনাবিল!
"মালতী" লইয়ে করে কুসুম সম্ভার
মোহিত করিছে ওই নিখিল অখিল!
কে বলে ভারত রবে অন্ধকারময়
দুই কবি রবি যদি একদা উদয়?

শ্রীমনোমোহন সেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

পূর্ণিমা।

ঐতিহাসিক চরিত্রচিত্রাঙ্কণে কবিকল্পনা সর্ব্বথা নিরঙ্কুশ কি না? সম্প্রতি সাময়িকপত্রে এতদ্বিষয়ের সমালোচনার সূচনা হইয়াছে। যখন কথা উঠিয়াছে তখন অবশ্যই হাঁ না একটা মীমাংসা হওয়া সম্ভব। কিন্তু মীমাংসা বুঝি এখনও বহুদূরে—কারণ, এখনও ধীর গম্ভীরভাবে তত্ত্বালোচনার পরিবর্ত্তে কটু কাট-ব্যেরই ছড়াছড়ি হইতেছে। যাঁহারা কবিজনসুলভ কল্পনার বিহারক্ষেত্রের সীমানির্দ্দেশ করিতে চান, "পূর্ণিমার" জনৈক সুযোগ্য লেখক আত্মপরিচয় গোপন রাখিয়া তাঁহাদের উদ্দেশে প্রচুর গালিবর্ষণ করিয়া অবশেষে হাতে পাইলে প্রহার করিবারও ভয় দেখাইয়াছেন! তাঁহাকে সংযত করিবার আশায় "ভারতীর" সুধীর সম্পাদক মহাশয় মীমাংসকের আসন গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন—"ইতিহাসের সংশ্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রসসঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোন খাতির নাই।" এইটুকু পড়িয়া মনে হয় বুঝি মীমাংসক মহাশয়ের মতে রসসঞ্চারই সর্ব্বস্ব, তাহাতে কৃতকার্য্য হইলে সত্যলঙ্ঘনজনিত ত্রুটি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে।

রাম লক্ষ্মণ সীতা,—যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন ভীষ্মদেব, সমগ্র ভারতবর্ষের পৌরাণিক যুগের ঐতিহাসিক চরিত্র। পৃথ্বীরাজ সমরসিংহ মহারাণা প্রতাপ—রাজস্থানের ঐতিহাসিক যুগের আদর্শ বীরসন্তান। ইঁহাদের প্রত্যেকে চরিত্রগত রসসঞ্চার করিয়া আমাদের কাব্য ও উপন্যাসকে নিরতিশয় রসসিক্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

ইঁহাদের সম্বন্ধে কবিকল্পনার কোন সীমা নির্দ্দেশ করা আবশ্যক কিনা? রামকে রাবণ করিয়া, লক্ষ্মণকে পরসাম্রাজ্যলিপ্সু কাপুরুষ কালনেমী সাজাইয়া, সীতাচরিত্রের উপর পুংশ্চলী সূর্পনখার মুখস আঁটিয়া দিয়া,—যুধিষ্ঠিরকে দুর্য্যোধন, ভীমার্জ্জুনকে শকুনি, ভীষ্মদেবকে কীচক, পৃথ্বীরাজ সমরসিংহ ও অমরকীর্ত্তি প্রতাপসিংহকে স্বদেশদ্রোহী বলিয়া উপন্যাসে রসসঞ্চার করিতে পারিলে, তাহা কর্ত্তব্য কিনা—সে কথার একটা মীমাংসা হইলে ভাল হয়।

ঐতিহাসিক চরিত্রমাত্রেই একটি না একটি বিশেষ রস বর্ত্তমান থাকে। কোন চরিত্র দয়া ধর্ম্মের আদর্শ, কোন চরিত্র আত্মত্যাগমহিমায় মহিমান্বিত, কোন চরিত্র লোকহিতকামনায় দ্রবীভূত—এই সকল চরিত্রগত বিশেষত্বই তত্তৎ-চরিত্রের বিশেষ রস। সে রস সত্যের উপর, চরিত্রগত আচরণের উপর ঘনীভূত হইয়া তাহাদিগকে রসময় করিয়া রাখিয়াছে। ঔদরিকের ন্যায় লোভী ঔপন্যাসিক রসাহরণ করিয়া তাহাকে উপন্যাসে সঞ্চার করিবার সময়ে যে চরিত্রের যে রস তাহা অবিকৃত রাখিতেই বাধ্য, না ইচ্ছামত কল্পনাবলে দয়ার আধারকে নিষ্ঠুর রূপে, আত্মত্যাগের অবতারকে স্বার্থান্ধরূপে প্রচার করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত?

ভারতী সম্পাদক মহাশয় উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধিসংস্থাপনের চেষ্টায় লেখককে বাবুর্চি কল্পনা করিয়া লিখিয়াছেন—"মসলা আস্ত রাখিয়া যিনি ব্যঞ্জনে স্বাদ দিতে পারেন তিনি দিন, যিনি বাঁটিয়া ঘাঁটিয়া একাকার করিয়া স্বাদ দিয়া থাকেন তাঁহার সঙ্গেও আমার কোন বিবাদ নাই, কারণ স্বাদই এস্থলে লক্ষ্য, মসলা উপলক্ষ্য মাত্র।" কথাটা খুব বিজ্ঞজনোচিত হইলেও এস্থলে উদাহরণের সার্থকতা কোথায়? যতক্ষণ উভয় বাবুর্চি ব্যঞ্জনে তুল্য স্বাদ দিবেন, ততক্ষণ মসলা আস্তই থাক আর গলিয়া জল হইয়াই যাক, দুই সমান কথা। কথাটা তাহা লইয়া নহে। ইতিহাসে যাহার মিষ্টস্বাদ উপন্যাস তাহাকে তিক্ত স্বাদ দিতে পারে কি না তাহা লইয়াই তর্ক। যিনি ইতিহাসে মহাবীর, উপন্যাস তাঁহাকে কাপুরুষ সাজাইতে অধিকারী কিনা তাহা লইয়াই বিচারণা। তাহার মীমাংসা কোথায়?

কাব্যের উদ্দেশ্য কি কেবল সৌন্দর্য্যবিস্তার পর্য্যন্তই? সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া লোকশিক্ষার আদর্শ সৃষ্টি করা কি লক্ষ্য মধ্যে পরিগণিত নহে? সুন্দরকে কুৎসিৎ, বীরকে কাপুরুষ, পরোপকারীকে পরপীড়ক সাজাইলে কি লোকশিক্ষার সার্থকতা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে? কখন কখন কেবল সৌন্দর্য্যও কাব্যের উদ্দেশ্য হইতে পারে বটে কিন্তু যে সৌন্দর্য্য লোকশিক্ষার ব্যাঘাত জন্মায় তাহা কখনও উৎকৃষ্ট কাব্যের লক্ষ্য হইতে পারে না।

কবিকল্পনা ইতিহাস হইতে রসাহরণ করিতে অধিকারী; কিন্তু নিশ্চয়ই সে অধিকারের কোথায়ও একটা সীমা টানিয়া লওয়া প্রয়োজন। কবিকল্পনা 'সৃষ্টি' করিতে অধিকারী, যাহা আছে তাহাকে ধ্বংস' করাও কি তাহার অধিকারভুক্ত?

ঐতিহাসিক চরিত্র লইয়া উপন্যাস রচনা করিতে হইলে তাহার ঐতিহাসিক সত্যটুকুই সার করিতে হইবে, কল্পনা তাহাতে একখানি অলঙ্কার সংযোগ করিতে পারিবে না—তাহা নহে। কল্পনা ঐতিহাসিক চরিত্রের আপাদমস্তক সৌন্দর্য্যের আবরণে ঢাকিয়া দিতে পারিবেক, কিন্তু সে আবরণ এরূপ সূক্ষ্ম হইবে যেন তাহার ভিতর দিয়া ঐতিহাসিক চরিত্রের মূল প্রকৃতি আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তৎপরিবর্ত্তে কবিকল্পনা যদি কালিমা ঢালিয়া দিয়া সুন্দরকে কুৎসিতের আবরণে ঢাকিয়া ফেলিতে চায়, তবে তেমন কল্পনাকেও কি সংযত করিতে হইবে না? উপন্যাস সরস হইল কি না তাহা আর এক দিক দিয়াও দেখিবার প্রয়োজন—বীরের অবমাননা আর সৌন্দর্য্যের মস্তকে পদাঘাত কি এক কথা নহে? সৌন্দর্য্যকে নষ্ট করিয়া সৌন্দর্য্যবিস্তার, রসকে নষ্ট করিয়া রসসঞ্চার, ভালকে মন্দ সাজাইয়া কল্পনার বাহাদুরী প্রশ্রয় লাভ করিলে তাহাকে সুরুচি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় কি? এবং সে কল্পনার বাহাদুরীতে ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের সৌন্দর্য্যবোধ বা আনন্দ হয় কি?

তাজমহল বিচিত্র সূক্ষ্ম শিল্পের গঠনগৌরবে গৌরবান্বিত, দাম্পত্যপ্রেমের সমাধিক্ষেত্র বলিয়া সর্ব্বজনসম্মানার্হ,—সুন্দরে গম্ভীরে কেমন অপূর্ব্ব সম্মিলন! যেন তাহার প্রত্যেক মর্ম্মরলতার পত্রপুষ্পের ভিতর দিয়া সুরুচির সহিত সৌন্দর্য্য উথলিয়া পড়িতেছে! তুমি যদি তাহাতে লৌহদণ্ডাঘাত করিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহার মাল মসলা লইয়া বাইজীর নাচঘর গাঁথিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিতে চাও "দেখ দেখি কেমন সুন্দর",—তোমাকে আর তবে কি বলিব? তুমি যে আমারই স্বদেশীয় সে কথা যখনই মনে হইবে তখনই লজ্জায় মরিয়া যাইতে হইবে!

অপরাধ স্বীকার।

(গীদেমোপাসাঁ।)

——(:০:)——

মারগারেট মৃত্যুশয্যায় শয়ানা। তাঁহার বয়স ছাপ্পান্ন বৎসর, কিন্তু দেখিলে বোধহয় যেন তিনি পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধা। তিনি কষ্টে শ্বাস টানিতেছেন, তাঁহার নয়ন জ্যোতিঃহীন; মুখমণ্ডল শয্যার আচ্ছাদনবস্ত্র অপেক্ষাও পাণ্ডুবর্ণ। যেন তিনি কোন অপার্থিব ভীষণ দৃশ্য দেখিয়াছেন!

তাঁহার ছয় বৎসরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী সুসান সেই শয্যার পার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। মৃত্যুশয্যার পার্শ্বেই একটি বস্ত্রমণ্ডিত ক্ষুদ্রায়তন টেবিলে দুইটি বাতি জলিতেছে। মৃত্যুকালীন কার্য্য সকল সম্পাদনের জন্য সকলে ধর্ম্মযাজকের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

যে গৃহের অধিবাসী মৃত্যুশয্যায় শায়িত, যে গৃহের অধিবাসীর জগতের নিকট বিদায় লইবার সময় উপস্থিত—সে গৃহ যেমন দেখায় এ গৃহ তেমনই দেখাইতেছে। গৃহের সকল আস্‌বাবের উপর ঔষধের শিশি বিশৃঙ্খল অবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত;—কক্ষের কোণে কোণে বস্ত্রখণ্ড স্তূপাকারে পতিত, বিশৃঙ্খল অবস্থায় বিক্ষিপ্ত চেয়ারগুলি দেখিলে বোধহয় যেন তাহারাও ভীত হইয়া পড়িয়াছে। ভয়াবহ মৃত্যু স্বয়ং সে গৃহে লুক্কাইত ভাবে অবস্থান করিতেছে।

এই দুই ভগিনীর বৃত্তান্ত বড়ই শোকোদ্দীপক। অনেকে সে বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়াছে এবং সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অনেকে অশ্রু সংবরণ করিতে পারে নাই।

জ্যেষ্ঠা ভগিনী সুসান পূর্ব্বে একজন যুবককে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। যুবকও তাঁহাকে ভালবাসিতেন। তাঁহাদিগের বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছিল। উভয়েই বিবাহদিনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন; এমন সময় সহসা হেন্‌রীর মৃত্যু হইল।

এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে অভাগিনী বালিকা যে কিরূপ ব্যথিতা হইল তাহা বর্ণনা করা সম্ভব নহে। সেই দিন সে প্রতিজ্ঞা করিল যে, সে আর বিবাহ করিবে না। সুসান আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন; তিনি সেই দিন যে বিধবার বেশ পরিধান করিয়াছিলেন তাহা আর কখন পরিত্যাগ করেন নাই।

কনিষ্ঠা ভগিনী মারগারেটের বয়স তখন দ্বাদশ বৎসরমাত্র। সে একদিন প্রভাতে আসিয়া জ্যেষ্ঠাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল "দিদি, আমার ইচ্ছা নহে যে, তুমি অসুখী হও; আমার ইচ্ছা নহে যে তুমি কাঁদিয়া সমস্ত জীবন যাপন কর। আমি কখন তোমাকে পরিত্যাগ করিব না; আমিও কখন বিবাহ করিব না। আমরা দুইজন সর্ব্বদা একত্রে থাকিব।"

সুসান বালিকার এই সহৃদয় ব্যবহারে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ভগিনীর মুখ চুম্বন করিলেন। কিন্তু তখন তিনি তাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই।

কনিষ্ঠাও আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন। পিতা মাতার অনুরোধ ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর অনুনয় সত্ত্বেও তিনি বিবাহ করেন নাই। তিনি অত্যন্ত রূপসী ছিলেন—অনেক যুবক সত্যসত্যই তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু তিনি কাহাকেও বিবাহ করেন নাই। কনিষ্ঠা কখন জ্যেষ্ঠাকে ছাড়িয়া কোথাও গমন করেন নাই।

তাঁহারা উভয়ে সারাজীবন একত্রে বাস করিয়াছিলেন—একবারও কেহ কাহাকে ছাড়িয়া গমন করেন নাই। যেন কোন অচ্ছেদ্য বন্ধনবদ্ধা হইয়া উভয়ে সারাজীবন একত্রে ছিলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠা অপেক্ষা কনিষ্ঠাকে সর্ব্বদাই বিষাদিতা, কাতরা ও দুঃখিতা দেখাইত; যেন তাঁহার অলৌকিক স্বার্থত্যাগ তাঁহার হৃদয় হইতে আনন্দালোক অপসারিত করিয়াছিল। জ্যেষ্ঠা অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক বয়স্কা বলিয়া বোধ হইত। ত্রিশ বৎসর বয়সেই তাঁহার কেশজাল শ্বেত হইয়া গিয়াছিল। বোধ হইত যেন তিনি কোন গোপনীয় ক্ষয়কারী ভীষণ বেদনায় ব্যথিতা।

এখনও দুইজনের মধ্যে তিনিই প্রথমে মৃত্যুশয্যায় শয়ানা।

পূর্ব্ব দিবস হইতেই তিনি আর বড় কথা কহিতে সমর্থ হয়েন নাই। কেবল

প্রভাতে যখন প্রাতঃসূর্য্যের কিরণ প্রথমে [illegible]াপরে পড়িতেছিল, তখন একবার বলিয়াছিলেন "যাও, ধর্ম্মযাজককে ড[illegible] [illegible]সময় হইয়া আসিয়াছে।"

তখন হইতেই তিনি চিৎ হইয়া শুইয়া আছেন। আর তাঁহার ওষ্ঠাধর ভীষণ আবেগে কম্পিত হইতেছে—যেন তাঁহার হৃদয় হইতে কোন ভীষণ কথা ওষ্ঠাগ্রে আসিয়া বাহির হইতে পারিতেছে না। দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন তিনি ভয়ে উন্মত্তাপ্রায় হইয়াছেন। সে দৃশ্য দেখিলে দর্শকের মনে ভয় হয়।

তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী সুসান শোকে কাতরা হইয়া শয্যাপ্রান্তে মস্তক [illegible]াপন করিয়া আকুল ভাবে রোদন করিতেছেন; আর বলিতেছেন "মার্গট! [illegible]গিনী মার্গট আমার! ছোট বোন!"

তিনি বাল্যকাল হইতেই ভগিনীকে "ছোট বোন" বলিতেন। কনিষ্ঠা জ্যেষ্ঠাকে "দিদি" বলিতেন।

সোপানে পদশব্দ শ্রুত হইল। কক্ষদ্বার মুক্ত হইল। ধর্ম্মযাজকের সঙ্গী ও তাঁহার পশ্চাতে বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজক স্বয়ং কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবা-মাত্র রোগীর শরীর কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে ওষ্ঠাধর মুক্ত করিয়া অস্পষ্ট স্বরে দুই তিনটি কথা উচ্চারণ করিলেন। তিনি নখ দিয়া শয্যার আস্তরণ আঁচড়াইতে লাগিলেন,—যেন তিনি তাহাতে একটি ছিদ্র করিতে চাহেন।

ধর্ম্মযাজক শয্যাপার্শ্বে যাইয়া আপন হস্তে রোগীর হস্ত ধরিয়া তাঁহার কপাল চুম্বন করিয়া বলিলেন "দুহিতা, ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করুন। ভীতি ত্যাগ কর। সময় হইয়া আসিয়াছে—যাহা বলিবার আছে বল।"

মারগারেটের সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তাঁহার দেহকম্পনে শয্যাও কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন "দিদি, উঠিয়া বসিয়া শুন।"

ধর্ম্মযাজক সুসানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তিনি তখনও শয্যামূলে পতিতা। ধর্ম্মযাজক তাঁহাকে তুলিয়া এক খানি চেয়ারে বসাইলেন এবং আপনার দুই হস্তে দুই ভগিনীর হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন—"হে ঈশ্বর ইহাদিগকে বল দাও। ইহাদিগের উপর তোমার করুণা বর্ষণ কর।"

মারগারেট বলিতে আরম্ভ করিলেন। কথাগুলি একটি একটি করিয়া

নির্গত হইতে লাগিল। প্রতি বাক্য অতিকষ্টে উচ্চারিত—কণ্ঠস্বর বড়ই ক্ষীণ।

"দিদি, আমাকে ক্ষমা কর—ক্ষমা কর। তুমি জান না এই মুহূর্ত্তের জন্য আমি সারাজীবন কত ভীত হইয়াছি!——"

সুসানের নয়ন হইতে তখনও অশ্রু পড়িতেছিল, তিনি বলিলেন—"ছোট বোন, তোমাকে ক্ষমা করিব! তুমি আমাকে সর্ব্বস্ব দিয়াছ; আমার জন্য সব ত্যাগ করিয়াছ—তুমি দেবী।"

মারগারেট তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন "চুপ কর—চুপ কর। আমার যাহা বলিবার আছে, বলিতে দাও। আমাকে নিবারণ করিও না। সে বড় ভীষণ—আমাকে সব বলিতে দাও। আমি শেষ পর্য্যন্ত সব কথা বলিয়া যাই। তোমার অবশ্য হেন্‌রীকে মনে আছে।"

সুসান শিহরিয়া উঠিলেন—ভগিনীর দিকে চাহিলেন। মারগারেট বলিতে লাগিলেন—"তুমি সব শুন, নহিলে বুঝিতে পারিবে না। তখন আমার বয়স বার বৎসরমাত্র। তোমার অবশ্য মনে আছে, আমি "মাটী" হইয়া গিয়াছিলাম। আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতাম। সকলে আদর দিয়া আমার "মাথা খাইয়াছিল"—সে সব তুমি জান। হেন্‌রী যে দিন প্রথম আমাদের গৃহে আসিয়াছিলেন, সে দিন তাঁহার পায় বার্ণিশ জুতা ছিল। তিনি আমাদের গৃহের বৃহৎ সোপানশ্রেণীর নিকটে আসিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং আপনার বেশের জন্য লজ্জিত হইয়া ক্ষমা চাহিলেন। সে দিন তিনি পিতাকে কি সংবাদ দিতে আসিয়াছিলেন। তোমার তাহা স্মরণ আছে? কিছু বলিও না, শুন। যখন প্রথম তাঁহাকে দেখিলাম তখনই হৃদয় হারাইলাম। আমার মনে হইতে লাগিল—তিনি বড়ই সুন্দর! তিনি যতক্ষণ কথা কহিতেছিলেন আমি এক কোণে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ লোচনে তাঁহাকে দেখিতেছিলাম। অল্পবয়স্কারা বড়ই অদ্ভুত এবং বড়ই ভীষণ। হাঁ—আমি সে সকল স্বপ্ন দেখিয়াছি।

"তাহার পর তিনি কয়বার আসিলেন। আমি এক দৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিতাম; কেবল আমার নয়ন নহে—আমার আত্মাও বুঝি মুগ্ধ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিত! আমার বয়সের পরিমাণে আমি অনেক বড় ছিলাম এবং তোমরা আমি যতটা বুঝি ভাবিতে তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক বুঝিতাম। তিনি বারবার আসিতে লাগিলেন। আমি কেবল তাঁহার

কথাই ভাবিতাম—অনেক সময় আমি আনমনে মৃদুস্বরে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতাম।

"সকলে বলাবলি করিতে লাগিল যে, তিনি তোমাকে বিবাহ করিবেন। সে সংবাদে আমি দুঃখিতা হইলাম; সত্যসত্যই সে সংবাদ আমার পক্ষে দুঃখের কারণ হইল। আমি তিনরাত্রি বিনিদ্র হইয়া রোদন করিলাম। তিনি প্রত্যহ অপরাহ্ণে আসিতে আরম্ভ করিলেন। কেমন? কিছু বলিওনা—শুন।—তিনি যে পিষ্টক ভক্ষণ করিতে ভালবাসিতেন তুমি শস্যচূর্ণ, দুগ্ধ ও মাখন দিয়া তাহা প্রস্তুত করিয়া দিতে। কেমন করিয়া তাহা প্রস্তুত করিতে তাহা আমি জানিতাম। আবশ্যক হইলে আমি এখনও তাহা প্রস্তুত করিতে পারি। তিনি তাহা খাইতেন; তাহার পর এক গ্লাস মদ্যপান করিয়া বলিতেন 'কি চমৎকার!' তিনি কেমন করিয়া বলিতেন তাহা তোমার মনে আছে।

"আমার ঈর্ষ্যা হইল; সত্যসত্যই আমার ঈর্ষ্যা হইল। তোমাদের বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল—আর দুই সপ্তাহমাত্র রহিল। আমি উন্মত্তাবৎ হইয়া উঠিলাম। আমি মনে মনে বলিলাম 'তিনি সুসানকে বিবাহ করিতে পাইবেন না। না—আমি তাহা সহ্য করিব না। আমি বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তিনি আমাকেই বিবাহ করিবেন। আমি আর কাঁহাকেও এত ভালবাসিতে পারিব না। কিন্তু তোমাদের বিবাহদিবসের দশ দিন পূর্ব্বে একদিন রাত্রিকালে তোমরা দুইজন গৃহের সম্মুখে বেড়াইতে গিয়াছিলে। তখন আকাশ চন্দ্রকরোজ্জ্বল। সেখানে সেই বৃহৎ ফার বৃক্ষ তলে তোমাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া তিনি তোমার মুখচুম্বন করিলেন। তোমার তাহা স্মরণ আছে। বোধহয় সেই তাঁহার প্রথম চুম্বন; হাঁ—যখন তুমি গৃহে ফিরিয়া আসিলে, তখন তোমাকে এমন পাণ্ডুবর্ণ দেখাইতেছিল!

"আমি তোমাদিগকে দেখিতে পাইয়াছিলাম। আমি নিকটেই একটি ঝোপের আড়ালে লুকাইয়াছিলাম। আমি রাগান্ধ হইলাম। সাধ্য থাকিলে আমি তখনই তোমাদের উভয়কে হত্যা করিতাম।

"আমি আপনাআপনি বলিলাম—তিনি কখনই সুসানকে বিবাহ করিতে পাইবেন না; তিনি কাহাকেও বিবাহ করিতে পাইবেন না। আমি অসুখী হইব। আমি সেই সময় হইতে সহসা তাঁহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিলাম।

"তাহার পর আমি কি করিলাম জান ? আমি দেখিয়াছিলাম মালী কুকুর মারিবার জন্য এক প্রকার বড়ী প্রস্তুত করিত। সে একখানা পাথরের আঘাতে একটা শিশি গুঁড়া করিত, তাহার পর মাংসের বড়ী প্রস্তুত করিয়া সেই কাচচূর্ণ তাহার মধ্যে দিত।

"মার একটা ঔষধের শিশি ছিল। আমি সেইটা লইয়া চূর্ণ করিলাম। সেই কাচচূর্ণ আমি পকেটে লুকাইয়া রাখিলাম। সে চূর্ণ অত্যন্ত উজ্জ্বল। পর দিবস তুমি যখন পিষ্টক প্রস্তুত করিলে তখনই আমি একখানা ছুরিকা লইয়া সে গুলা কাটিয়া—সে গুলির মধ্যে কাচচূর্ণ পূরিয়া রাখিলাম। তিনি তিনখানি পিষ্টক খাইয়াছিলেন—আমি—আমিও একখানি খাইয়াছিলাম। অবশিষ্ট দুইখানি আমি সরোবরে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। তিন দিবস পরে দুইটি রাজহংস মরিয়া গিয়াছিল। তোমার মনে আছে কি ? কোন কথা বলিও না। কেবল আমি মরি নাই ; কিন্তু আমি সারাজীবন রোগকাতর ছিলাম। তাঁহার মৃত্যু হইল। তুমি তাহা অবগত আছ ; কিন্তু সে কিছুই নহে। তাহার পরে যাহা হইয়াছে, তাহাই বড় ভীষণ——

"আমার সারাজীবন কি যন্ত্রণায় কাটিয়াছে ! আমি আপনি স্থির করিয়াছিলাম যে, আমি কখন আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইব না এবং মৃত্যুকালে তাঁহাকে সকল কথা বলিয়া মরিব। উঃ সেই সময় হইতে আমি কেবল যখন সকল কথা বলিব সেই সময়ের কথা ভাবিয়াছি। এখন সেই সময় আসিয়াছে। কি অসহ্য যন্ত্রণা ! হায়—দিদি !

"আমি প্রভাতে, সন্ধ্যায়, দিবালোকে, নৈশ অন্ধকারে—কেবলই ভাবিয়াছি যে, একদিন আমি তোমাকে সকল কথা বলিব। আমি অপেক্ষা করিয়াছি। উঃ কি যন্ত্রণা! আর সময় নাই—তুমি কিছু বলিও না। আমি এখন বড় ভীত হইয়া পড়িয়াছি ; সত্যসত্যই আমি বড় ভীত হইয়াছি। যদি মৃত্যুর পরে সত্বর তাঁহার সহিত আমার আবার সাক্ষাৎ হয় ? একবার ভাবিয়া দেখ—যদি প্রথমে—তোমার পূর্ব্বে—তাহার সহিত আমার দেখা হয় ? আমার সাহস হইবে না। আমি মরিতেছি। আমি কেবল এই চাহি যে, তুমি আমাকে ক্ষমা কর ; আমি কেবল ইহাই চাহি। তুমি ক্ষমা না করিলে আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে পারিব না ! ধর্ম্মযাজক মহাশয়, আমাকে ক্ষমা করিতে বলুন—আমি কাতর ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, ক্ষমা না চাহিলে আমি মরিতে পারিব না।"

মারগারেট নীরব হইলেন। তিনি হাঁপাইতে লাগিলেন এবং শুষ্ক নখ দিয়া কেবল শয্যার আস্তরণ আঁচড়াইতে লাগিলেন।

সুসান দুই করে আনন আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন। ভগিনীর কথা শুনিয়া তিনি একটুও নড়িলেন না। তিনি এত দিন হয়ত যাঁহাকে ভালবাসিতে পারিতেন, তাঁহারই কথা ভাবিতে লাগিলেন। তাহা হইলে তাঁহারা কি সুখে জীবন যাপন করিতে পারিতেন ! সেই দূর অতীতের কথা ভাবিয়া তিনি মানসচক্ষে আবার তাঁহার মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। আমরা যাহাদের ভালবাসি, তাহারা মৃত্যুর পর আমাদের কি ভীষণ যন্ত্রণা দান করে ! সেই চুম্বন ! সেই তাঁহার প্রথম ও শেষ চুম্বন ! তিনি হৃদয়াভ্যন্তরে তাহা লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার পর জীবনে আর কিছুই ঘটে নাই।

সহসা ধর্ম্মযাজক দণ্ডায়মান হইয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন "মাদামোয়েল সুসান, তোমার ভগিনী মরিতেছেন।"

সুসান আনন হইতে কর অপসারিত করিলেন। সমস্ত আনন অশ্রুসিক্ত ! ভগিনীর দেহের উপর পতিত হইয়া তিনি তাঁহাকে চুম্বন করিলেন এবং স্পষ্টস্বরে বলিলেন—"ছোট বোন, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম ;—আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম।"

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

———(০)———

বৈজ্ঞানিক অনুমান।

———*———

প্রবন্ধের আখ্যাটি দেখিয়া হয় ত পাঠক মনে করিবেন,—বিজ্ঞানে আবার অনুমান কি ? কথাটি অতীব সত্য ; অপর শাস্ত্রমাত্রেই অনুমান অবলম্বন করিয়া পণ্ডিতগণ নানা কল্পনার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন ; আবার এই অনুমানমূলক আকাশদুর্গের অস্তিত্ব প্রতিপাদনে প্রতিনিয়তই

যে কত বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডা, বিরোধিতা ও দুর্ব্বলের শোণিতপাত হইতেছে,—নানা মানবশাস্ত্রের ইতিহাস তাহার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য। জড়তত্ত্ববিদ্‌গণের সুমহান্ কার্য্যক্ষেত্রে, এই পণ্ডিতসুলভ অনুমানের স্থান নাই;—যাহা প্রত্যক্ষ সত্য এবং প্রত্যক্ষ প্রতিপাদ্য, বিজ্ঞানবিদ্‌গণ কোটী কোটী নরনারীর কাতর উক্তি এবং সহস্র ধর্ম্মোপদেষ্টার কঠোর শাসনবাক্য উপেক্ষা করিয়া, তাহাই সাদরে গ্রহণ করেন। এই কারণেই খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধবাদী বিবর্ত্তনবাদ (Theory of Evolution) খৃষ্ট শিষ্যগণের গুরু অভিশাপ বহন করিয়া, ইহার সত্যের মহিমা ঘোষণা করিতেছে,—এবং এই জন্যই নষ্টগৌরব অধঃপতিত ভারতের সুসন্তান অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র পাশ্চাত্য বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর বহু অযাচিত সাধুবাদ প্রাপ্ত হইতেছেন। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে অনুমানের স্থান নাই সত্য—কিন্তু তথাপি বিজ্ঞান-বিদ্‌গণ জনসাধারণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য, সময়ে সময়ে অনুমানের আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন। ভূস্তরগঠনের কালনিরূপণ, জীবসংস্থানের সময়নির্দ্দেশ, এবং সৃষ্টির কালনির্দ্ধারণ প্রভৃতি কঠিন তত্ত্বের মীমাংসায়, অনুমানই পণ্ডিতগণের প্রধান অবলম্বন। এখন নিউটন বা কেপ্‌লারের ন্যায় কোন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া, রহস্যময়ী প্রকৃতির নানা ভূত-ভবিষ্য কার্য্যের ইতিহাস, অসাধারণ সূক্ষ্মদর্শন সাহায্যে আবিষ্কার না করিলে, দার্শনিকগণ চিরকালই প্রকৃতিদেবীর মহিমাময় রত্নসিংহাসনের বহুদূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া, কেবল অনুমানদ্বারা উক্ত তত্ত্বগুলির মীমাংসা করিতে থাকিবেন। উপস্থিত প্রবন্ধে, এই শ্রেণীর কয়েকটি লোকপ্রসিদ্ধ আনুমানিক সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইবে।

আধুনিক বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি দেখিয়া, সদুত্তরপ্রাপ্তির আশায় অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন,—কোন্ সময়ে পৃথিবী ও জীবের সৃষ্টি হইয়াছিল? আর কত কালই বা এই সৃষ্টি অক্ষত থাকিবে?—প্রশ্ন কয়েকটি শুনিতে অতি সহজ, কিন্তু নানা সময়ে বিখ্যাত পণ্ডিতগণ বহু গবেষণা করিয়াও অদ্যাপি এতদ্ সম্বন্ধে কোনও সর্ব্ববাদিসম্মত স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। আপ্ত বাক্যের প্রভাব সকল দেশে, এবং সকল শাস্ত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে দেখা যায়, এইজন্য উক্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে যে মতবাদ অধিকাংশ খ্যাতনামা পণ্ডিত সত্য বলিয়া প্রচার করিতেছেন,—অনন্যোপায় জনসাধারণ এখন তাহাই

সম্ভাব্য কারণ বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। পৃথিবীর উৎপত্তিকাল নিরূপণ করিতে হইলে, সৃষ্টিতত্ত্বের কথাটা কিঞ্চিৎ জানা আবশ্যক;—আধুনিক দার্শনিকদিগের মতে, সৃষ্টির প্রারম্ভে সমগ্র সৌরজগৎটা একাকারে ছিল, মনঃ-বুদ্ধির অগোচর কোন এক মহতী শক্তির প্রভাবে, জ্বলন্ত অণুপুঞ্জময় সৌরজগতের উপাদান অনন্ত অনন্ত আকাশের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ অধিকার করিয়া ভ্রাম্যমাণ ছিল। তাহার পর জ্বলন্ত অণুরাশি কালসহকারে শীতল হইয়া আসিলে, সেগুলি ক্রমে একত্রীভূত হইয়া রবিশুক্রচন্দ্রমা প্রভৃতি নানা গ্রহউপগ্রহাদিতে অভিব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। জ্বলন্ত বাষ্প শীতল হইতে আরম্ভ করিলে, ইহা এককালীন কঠিনাবস্থা প্রাপ্ত হয় না,—ক্রমিক তাপক্ষয়ে বাষ্পরাশি প্রথমে তরল, পরে কর্দ্দমবৎ এবং শেষে কঠিন হইয়া পড়ে। গ্রহরাজ সূর্য্য অদ্যাপি সেই প্রাথমিক বাষ্পীয় অবস্থা উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই,—সৌরমণ্ডলে স্পষ্ট জ্বলন্ত বাষ্পের চিহ্ন এখনও দেখা যায়; এতদ্ব্যতীত বৃহস্পতি-মণ্ডল পরীক্ষা করিলেও ইহাতে শীতলতার চিহ্ন বিশেষ কিছুই দৃষ্ট হয় না; জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলেন, পৃথিবীর ন্যায় কেবল বুধ শুক্র ও মঙ্গল প্রভৃতি কয়েকটি গ্রহ ক্রমে তরল ও কর্দ্দমবৎ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অধুনাতন যুগে কঠিনাবরণ প্রাপ্ত হইয়াছে।

গ্রহাদি সম্বন্ধে প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের অনেক "আজ্‌গবী" বিশ্বাস ছিল; কিন্তু আজ কাল জ্যোতিষ্কপর্য্যবেক্ষণের অনুকূল নানা যন্ত্রাদির উদ্ভাবনে, নিয়তই গ্রহনক্ষত্রাদি সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য প্রচারিত হইতেছে। পূর্ব্বতন যুগের দার্শনিক্‌গণ সূর্য্যের গুরুত্বপরিমাণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতবর্গ উন্নত যন্ত্রাদির সাহায্যে এখন ইহার গঠনোপাদান এবং সৃষ্টিকালে বাষ্পময় সৌরগোলকে কত তাপ ছিল, এই সকল গূঢ় তত্ত্বও একে একে আবিষ্কার করিতেছেন। শেষোক্ত তথ্যটির সাহায্যে এবং বর্ত্তমান অবস্থায় সৌরগোলকে কত তাপ সঞ্চিত আছে ও বাৎসরিক তাপক্ষয়ের পরিমাণই বা কি,—এই সকল বিষয়ের স্থূল গণনা করিয়া পণ্ডিতগণ দেখিয়াছেন,—সার্দ্ধ দুই কোটি হইতে চারি কোটি বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে, সূর্য্য সৌরপরিবারসহ অকাশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং ইহাই পৃথিবীর জন্মকাল।

আবির্ভাবের কাল স্থির থাকিলে, তিরোভাবের সময়নির্দ্ধারণ বড় কঠিন নয়। প্রতি বৎসর কত তাপ সৌরমণ্ডল হইতে বিকীরিত হইতেছে, এবং এই অপচয়ে সূর্য্যের পরিমিত তাপভাণ্ডার কতকালে শূন্য হইবে, এই গণনাই সৃষ্টির মৃত্যুকালনির্দ্ধারণের প্রধান অবলম্বন। এই প্রকারে হিসাব করিয়া পণ্ডিতগণ বলেন,—সম্ভবতঃ এক কোটি বৎসর পরে প্রভাকর সূর্য্য হীনজ্যোতিঃ হইয়া শীতল হইয়া পড়িবেন। সুতরাং নানা বাধাবিঘ্ন ও দৈব-উৎপাত সহ্য করিয়া সৃষ্টি অক্ষুণ্ণ থাকিলে—উক্ত দীর্ঘকাল পরে ইহার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। অপর আর এক উপায়ে পৃথিবীর ধ্বংসকাল স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন,—যদিও ভূপৃষ্ঠ এখন সম্পূর্ণ শীতলতা প্রাপ্ত হইয়াছে,—কিন্তু অদ্যাপি ভূমধ্যে প্রভূত তাপ বর্ত্তমান রহিয়াছে, আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদ্গম তাহার প্রধান নিদর্শন; এতদ্ব্যতীত ভূপৃষ্ঠ খনন করিয়া পরীক্ষা করিলেও দেখা যায়,—ভূগর্ভের প্রতি ত্রিশ গজ গভীরতায় এক ডিগ্রি পরিমাণ উষ্ণতা বৃদ্ধি হইতে থাকে। কিন্তু এই তাপ চিরস্থায়ী নয়, কালসহকারে ইহাও ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে;—জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ লর্ড কেল্‌ভিন্ এই তাপক্ষয়ের পরিমাণ স্থির করিয়া দেখিয়াছেন,—প্রায় এক কোটি কুড়ি লক্ষ বৎসর পরে সৃষ্টিরক্ষার প্রধান কারণভূত এই তাপ এককালীন ভূগর্ভ হইতে বিলীন হইয়া যাইবে। সৃষ্টিনাশব্যাপারের দুইটি পৃথক পৃথক গণনায় এই প্রকারে একই ফল প্রাপ্ত হওয়ায়—আচার্য্য কেল্‌ভিনের গণনা অনেকেই সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতেছেন।

জীবসংস্থানের কালও, সূর্য্যের তাপক্ষয়ের পরিমাণ অবলম্বন করিয়া নিরূপিত হইয়া থাকে। পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন,—পদার্থের আকার যতই ক্ষুদ্র হয়, পদার্থটি ততই অল্প তাপে অধিক উষ্ণ হইয়া পড়ে, এবং আবার বৃহদায়তন বস্তুর তুলনায় ইহা অতি অল্প সময়েই শীতল হইয়া যায়। পৃথিবীর গঠনসামগ্রী, সৌরসামগ্রী অপেক্ষা প্রায় তিন লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার গুণ লঘুতর,—সুতরাং ধরার আদিম উষ্ণতা ক্ষয় হইয়া কোন্ সময়ে ভূপৃষ্ঠ কঠিন হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা গণনা করা অসম্ভব নয়। ভুবন-বিখ্যাত জড়বিদ্ লর্ড কেল্‌ভিন্ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন—এক বা দেড় কোটি বৎসর পূর্ব্বে ধরাপৃষ্ঠ শীতল হইয়া জীববাসোপযোগী হইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ জীবের ঊর্দ্ধতম বয়ঃকাল স্থির করিতে হইলে, বাহ্য প্রকৃতির নিষ্করুণ ব্যবহারে সকল জীবদেহ কতকাল অবিকৃত থাকিতে পারে, —তাহাই স্থির করিয়া থাকেন। সহস্র আভ্যন্তরীণ বিকলতা ও দৈব-উৎপাতে যে প্রাণিদেহ মুহূর্ত্তে বিনষ্ট হইতে পারে, জীবতত্ত্ববিদ্ বয়ঃগণনায় তাহার হিসাব করেন না,—এবং করাও সম্ভবপর নয়। সৃষ্টিধ্বংসকালের পূর্ব্বোক্ত গণনা কতকটা এই প্রথায় সম্পন্ন হইয়াছে:——

চন্দ্র-আকর্ষণজাত "জোয়ার ভাঁটায়" পৃথিবীর আহ্নিকগতি নিয়তই ক্ষীয়মাণ হইয়া ধরাপৃষ্ঠ যে নিয়তই জীববাসের অনুপযোগী হইয়া যাইতেছে, এবং সভ্যতার উন্নতির সহিত ইন্ধনের অযথা ব্যবহারে, সৃষ্টির জীবন যে ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে,—এই সকল কথা পণ্ডিতগণ আয়ুঃগণনায় গ্রহণ করেন নাই। এই জন্য অনেকে বলিতেছেন,—সৃষ্টি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের ভবিষৎ-বাণী সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। গণনালব্ধকালের বহু পূর্ব্বে কোন উচ্ছৃঙ্খল জ্যোতিষ্কের সংঘাতে বা অপর সহস্র আকস্মিক উৎপাতে যে পৃথিবীর অকাল মৃত্যু উপস্থিত হইবে না,—তাহা কে বলিতে পারে? এই বৈজ্ঞানিক যুগেও জড়ময়ী ধ[illegible]বিধ্বংসিতা সম্বন্ধীয় প্রাচীন প্রবচনটি পূর্ণ সত্য।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

রাজসাহী।

——(৫০:)——

"রাজসাহী" নামক প্রবন্ধে ইঙ্গিত করা হইয়াছে (১) রাজা মানসিংহের নামের সহিত রাজসাহী নামের ব্যুৎপত্তি যোজন করা যাইতে পারে। আইন আক্‌বরী গ্রন্থে রাজসাহীর নাম নাই। সুতরাং রাজসাহী নামের উৎপত্তি পরবর্ত্তী কালে। রাজা মানসিংহ আগমহলের সৌষ্ঠবসাধন করিয়া রাজমহল নাম দিয়া এখানে রাজধানী স্থাপন করেন। প্রাচীন রাজসাহী পরগণা রাজ-

(১) উৎসাহ, ভাদ্র, ১৩০৪।

মহল হইতে বড় বেশী দূর নহে;—বর্ত্তমান বীরভূমিও পশ্চিম মুর্শিদাবাদের উত্তরাংশ লইয়া গঠিত। অতএব রাজসাহী নাম 'শাহী' রাজা মানসিংহের প্রদত্ত —এ অনুমান অসঙ্গত নহে (২)। এই রূপেই পার্শ্ববর্ত্তী সুল্‌তানাবাদ পরগণা সুলতান সুজার নামের সহিত সংযুক্ত। নাটোরপরিবারের হস্তে প্রাচীন রাজসাহী পরগণার জমিদারী অর্পিত হওয়ায় কিরূপে বর্ত্তমান রাজসাহী জেলা গঠিত হয় পূর্ব্ববারে সামান্য উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রস্তাবে কিছু বিস্তৃত ভাবে নাটোর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠার বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে।

বর্ত্তমান রাজসাহী জেলা নবাবী আমলে প্রাচীন প্রধান পরগণা লস্কর-পুরের নামানুসারে কথিত হইত। কোম্পানীর প্রথম আমলে—ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের সময় পর্য্যন্ত লস্করপুর পৃথক্ কালেক্টরী ছিল। উল্লিখিত সময় পর্য্যন্ত নিজামত রেকর্ডে লস্করপুরের কালেক্টরের নিকট হইতে মুর্শিদাবাদ নিজামত এজেণ্টের নিকট পত্রাদি দেখা যাইতেছে। ১৭৮৯ খৃঃ মে পর্য্যন্ত নিজামত এজেণ্ট স্পীক সাহেবই—রাজসাহীর কালেক্টরও ছিলেন। পরে কোম্পানীর আমলে জেলা বিভাগ ও কালেক্টরীর নূতন বন্দোবস্তের সময় রাজসাহী ও লস্করপুর কালেক্টরি একীভূত হইয়া নাটোররাজবংশের বাসস্থানের অনুরোধে রাজসাহী জেলা নামে বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। লস্করপুর বর্ত্তমান পুঁঠিয়া রাজবংশের প্রাচীন জমিদারী। এ বংশের অভ্যুদয় সম্বন্ধে যে জনশ্রুতি আছে, তাহা এই:—

পূর্ব্বকালে পুঁঠিয়া গ্রামে বৎসরাচার্য্য (বৎসাচার্য্য?) নামক ঋষিতুল্য এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। এ সময়ে বঙ্গদেশ অষ্টাদশ সুবাদারের অধীন ছিল; ইহারা সমবেত চেষ্টায় রাজস্ব প্রদান বন্ধ করিয়া দিল্লীর বাদ-সাহের বিরুদ্ধে উত্থান করেন। বাদসাহ বিদ্রোহদমন জন্য একজন প্রধান সেনাপতিকে বাঙ্গলায় প্রেরণ করেন। সেনাপতি বৎসাচার্য্যের উপদেশ ও আশীর্ব্বাদে বিদ্রোহদমনে সক্ষম হন বলিয়া পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে কিছু ভূসম্পত্তি দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সময়ে লস্কর খাঁ নামক সেনানী ও জায়গীরদারের নিঃসন্তান পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে; সেনাপতি ঐ লস্করপুর জমিদারী সাধু ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ

(২) "রাজশাহী" হওয়াই সঙ্গত। প্রচলিত বলিয়া আমরা 'স' রাখিতে বাধ্য হইয়াছি।

সংসারে বীতস্পৃহ; সুতরাং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পীতাম্বর জমিদারী গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নীলাম্বর লস্করপুর জমিদারীর আরও উন্নতি সাধন করেন। নীলাম্বরের অন্যতম পুত্র আনন্দ রাজোপাধি প্রাপ্ত হইলেও জ্যেষ্ঠ পুত্র রতিকান্ত সাধারণের নিকট 'ঠাকুর' নামেই বিশেষ পরিচিত হইয়া উঠেন। রতিকান্তের পুত্র রামচন্দ্র তৎপুত্র নরনারায়ণ, দর্পনারায়ণ ও জয়নারায়ণ মুর্শিদ কুলীখাঁর সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন (৩)।

উক্ত প্রবাদের মূল অন্বেষণ করিলে দেখা যায়, দর্পনারায়ণ হইতে চারি পুরুষ উর্দ্ধেই এক সময়ে সুযোগে পুঁঠিয়ার ঠাকুরবংশ জমিদারী লাভ করেন। চারি পুরুষে ১২০ বৎসর ধরিলে এ বিপ্লব বাদসাহ আকবরের সময়ে ঘটে, ইহা স্পষ্টই অনুমিত হইবে। সুতরাং কৃষ্ণনগরের রাজবংশের আদি পুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের ন্যায় পুঁঠিয়ার রাজারাও তাঁহাদের জমিদারীর জন্য হিন্দু-রাজা টোডর মল্ল বা মানসিংহের নিকট ঋণী, ইহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। দর্পনারায়ণ প্রভৃতির পর পুঁঠিয়া বংশের সকলেরই নামে নারায়ণ সংযুক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের সকলের সহিত উপস্থিত প্রবন্ধের কোন সম্বন্ধ নাই। নরনারায়ণের সময় নাটোরবংশের প্রতিষ্ঠাতা স্বনামখ্যাত রঘুনন্দনের পিতা কামদেব বারইহাটী গ্রামের তহশীলদার ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। রঘুনন্দন দর্পনারায়ণের অনুগ্রহে পালিত ও শিক্ষিত হন। নিতান্ত সামান্য অবস্থা হইতে প্রতিভা ক্রমেক্রমে তাঁহাকে অত্যুচ্চ পদে উন্নীত করে বলিয়া তাঁহার নামের সহিত একটা প্রবাদ সংযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে; অভাবনীয় উন্নতি দেখিলে সাধারণে তাহার একটা সুসঙ্গত (?) ব্যাখ্যা না দিয়া নিশ্চিন্ত হয় না। জনশ্রুতি রঘুনন্দনকে বাল্যকালে পুঁঠিয়ার বাটীতে দেবপূজার পুষ্প-চয়নে নিযুক্ত করিতেছে। এক দিন আতপক্লিষ্ট বালক রঘুনন্দন পুষ্পো-দ্যানে বৃক্ষতলে নিদ্রিত, এমন সময়ে (সেই বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ বংশের প্রতিষ্ঠাতার উপকথার মত) এক কালসর্প তাহার মস্তকের উপর ফণা বিস্তার করিয়া সূর্য্যরশ্মি প্রতিহত করিতেছে দেখা গেল। সংবাদ শুনিয়া রাজা দর্পনারায়ণ রঘুনন্দনকে নিকটে আনাইয়া বলেন "তুমি রাজা হইবে, কিন্তু দেখ বাপু, আমার বংশের নিকট হইতে লস্করপুর যেন কাড়িয়া লইওনা"।

(৩) 'The Rajas of Rajshahi'—Calcutta Review.

রঘুনন্দন এরূপ উচ্চ আশা কখনই হৃদয়ে পোষণ করেন নাই সুতরাং প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য সমগ্র রাজসাহীর জমিদারী হস্তে আসিলেও লস্করপুর গ্রহণ করেন নাই—ইত্যাদি। এ প্রবাদ কোথাও রঘুনন্দনের ভ্রাতা রামজীবনের স্কন্ধেও আরোপিত।

জনশ্রুতি যাহাই হউক, রাজা দর্পনারায়ণ রঘুনন্দনের বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যতৎপরতার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঢাকার নবাবদরবারে উকীল স্বরূপে প্রেরণ করেন (৪)। মুর্শিদকুলী খাঁ দেওয়ানী কার্য্যালয় প্রভৃতি মুর্শিদাবাদে উঠাইয়া আনায় তিনিও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ সঙ্গে এখানে আসেন। রঘুনন্দন নিজ প্রতিভা গুণে অনতিবিলম্বেই দরবারে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন। পুঁঠিয়া রাজার স্বনামা মৈত্র প্রথম প্রধান কানুন্‌গো দর্পনারায়ণ তাঁহাকে ভাল বাসিতেন; ক্রমে তিনি প্রধান কানুন্‌গোর দেওয়ান হইয়া পড়েন। জমিদারের উকীল দরবারে থাকিয়া কার্য্যকুশলতা দেখাইলে নবাব সরকারে উচ্চপদপ্রাপ্তির সুবিধা ছিল, উত্তরকালে বর্দ্ধমানরাজের উকীল ও দেওয়ান মাণিক চাঁদ এইরূপে প্রতিপন্ন হন। বর্ণিত সময়ে মুর্শিদকুলী খাঁর প্রথম দেওয়ানী আমল। কুলী খাঁ মুর্শিদাবাদে এক বৎসর স্বাধীন ভাবে দেওয়ানী কার্য্য চালাইয়া বর্ষশেষে রাজস্বের সুন্দর উন্নতি দেখাইয়া এক নিকাশী কাগজ প্রস্তুত করেন।। ঐ নিকাশী কাগজ বাদসাহ সকাশে দাখিল জন্য প্রধান কানুন্‌গোর দস্তখত প্রয়োজন। তখন বঙ্গের প্রধান কানুন্‌গোর পদ দুইটি কায়স্থ পরিবারের মধ্যে ॥৵০ ও ।৵০ আনা ভাগে বিভক্ত ছিল। কানুন্‌গোদ্বয় সমগ্র সুবার ভূসম্পত্তির রেজেষ্ট্রার; তাঁহাদের দস্তখতী কাগজ ভিন্ন বাদসাহী খাল্‌সা দপ্তরে সুবার দেওয়ানের নিকাশ দিবার নিয়ম ছিল না। কানুন্‌গোগণকে দস্তখত জন্য অনুরোধ করা হইলে প্রথম কানুন্‌গো দর্পনারায়ণ নিজ রসুম বাবদ তিন লক্ষ টাকা চাহিয়া বসিলেন, কুলী খাঁ বাদসাহের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঐ টাকা দিবেন স্বীকার করিলেও তিনি দস্তখত করিতে সম্মত হইলেন না। দ্বিতীয় কানুন্‌গো

(৪) স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র এখানে মোক্তার বলিয়াছেন। মুসলমান ইতিহাসে বা ইংরেজ দপ্তরের কাগজে কোথাও এরূপ স্থলে "মোক্তার" কথার প্রয়োগ নাই। মিত্র মহাশয় বর্ত্তমান সময়ের আম্‌মোক্তারের কথা ভাবিয়া থাকিবেন।

জয়নারায়ণ ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাগজে সহী করিলেন। কুলী খাঁ স্বীয় প্রতিপত্তি ও উপঢৌকনের উপর নির্ভর করিয়া আর দর্পনারায়ণের দস্তখতের মুখাপেক্ষা করিলেন না। ইতিহাসের এই উক্তিতে জনশ্রুতি যথেষ্ট লতা পল্লব সংযোগ করিয়াছে। প্রবাদ এই যে দর্পনারায়ণ নিকাশী কাগজে দস্তখত না করায় নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ বিপন্ন হইয়া রঘুনন্দনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এবং কৌশলে ও প্রলোভনে তাঁহার দ্বারা ঐ নিকাশী কাগজে প্রধান কানুন্‌গোর মোহর দিয়া লন। সেই অবধি রঘুনন্দনের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় (৫)। কুলীখাঁর সুযোগ্য দেওয়ান ভূপতি রায়ের মৃত্যুর পর কানুন্‌গো দর্পনারায়ণ স্বয়ং খাল্‌সা (রাজস্ব বিভাগের) দেওয়ানী কার্য্যভার গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিলে, রঘুনন্দন খাল্‌সা দেওয়ানের পদে উন্নীত হইয়া রায়রায়াণ উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনিই বঙ্গের প্রথম রায়রায়াণ বলিয়া প্রসিদ্ধ (৬)। মুর্শিদকুলীখাঁর সুবিখ্যাত রাজস্ব বন্দোবস্তে দেওয়ান রঘুনন্দন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত; প্রতিভা ও কর্ম্মকুশলতায় তিনি কুলীখাঁর উপযুক্ত সহকারী ছিলেন। রাজস্ব বন্দোবস্ত স্থির হওয়ার সমকালে ও পরে রঘুনন্দন ক্রমেক্রমে জ্যেষ্ঠ সহোদর রামজীবনের নামে যে সকল জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লন, তাহা আয়তনে বাঙ্গালার সকল জমিদারী অপেক্ষা

(৫) রঘুনন্দন ও কানুন্‌গো মোহর প্রবাদ সম্বন্ধে আমাদের রাজসাহীর বন্ধু শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র বলিয়াছেন "আজিমখানের সহিত মুর্শিদকুলীখাঁর মনোমালিন্যের পর কুলী খাঁ হিসাব লইয়া স্বয়ং বাদসাহদরবারে গেলে সকল কথা পরিষ্কার বলিবার অবসর পাইবেন এই চিন্তায় আজিমখানের মুখ শুকাইল। তিনিই কানুন্‌গোগণকে শাসন করিয়া দিলেন যেন নিকাশী কাগজে দস্তখত না করেন। কানুন্‌গোদ্বয় উভয় সঙ্কটে পড়েন। এদিকে কানুন্‌গোর সহী না পাইয়া কুলীখাঁর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া রঘুনন্দনের স্মরণাগত হইলেন। রঘুনন্দনের চেষ্টায় একজনমাত্র কানুন্‌গোর দস্তখতযুক্ত হিসাব ও উপঢৌকন লইয়া তিনি সম্রাটের নিকট গমন করেন, দাক্ষিণাত্য যুদ্ধে তখন অর্থের বড়ই অনাটন, কুলী খাঁও বহু অর্থ লইয়া উপস্থিত, কাজেই একজন কানুন্‌গোর দস্তখত খবরেই আসিল না" ইত্যাদি। (বৈশাখ ১৩০৪ সাহিত্য)।

(৬) স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র বলিয়াছেন এ সময়ে বাদসাহ নবাবের উপর অসন্তুষ্ট থাকায় তাঁহাকে এক জাল হিসাব প্রস্তুত করিতে হয়। বলাবাহুল্য ইতিহাসে বাদসাহের প্রিয়তম দেওয়ান কুলীখাঁর জাল হিসাব প্রস্তুত করার কোন কথাই বলে না। রঘুনন্দনের 'জাল' অপবাদ

বৃহৎ; এই জন্যই হঠাৎ বড়লোক হওয়ায় কথায় "রঘুনন্দনী বাড়" বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। নিম্নে সংক্ষেপে সেই সকল জমিদারীপ্রাপ্তির বিবরণ প্রদত্ত হইল।

(ক) মুর্শিদকুলীখাঁর বন্দোবস্তের প্রথম অবস্থায় পরগণা বাণগাছীর চৌধুরী গণেশরাম ও ভগবতীচরণ বারংবার রাজস্ব আদায়ে শৈথিল্য করায় তাঁহাদের জমিদারী কৌশলক্রমে দেওয়ান রঘুনন্দন নিজ জ্যেষ্ঠ সহোদর রামজীবনের নামে পত্তন করিয়া দখল করাইয়া লন। নাটোর-বংশের এই প্রথম জমিদারী। স্বর্গীয় কিশোরী চাঁদ মিত্র বাঙ্গালা ১১১৩ সাল (১৭০৬ খৃঃ) এই জমিদারীপ্রাপ্তির তারিখ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(খ) অতঃপর বাঙ্গালা ১১১৭ সালে (১৭১০ খৃঃ) আধুনিক রাজসাহী জেলার অন্যতম প্রধান পরগণা ভাতুড়িয়ার ব্রাহ্মণ জমিদার (সান্তোলরাজ) রামকৃষ্ণের পত্নী সর্ব্বাণী দেবীর মৃত্যু হইলে তাঁহাদের একমাত্র উত্তরাধিকারী কৃষ্ণরামের ভ্রাতুষ্পুত্র বলরাম জন্মান্ধ ও বধির উল্লেখে জমিদারী কার্য্য পরিচালনে অসমর্থ বলিয়া ঐ বিস্তীর্ণ জমিদারীর কার্য্যভার তাৎকালিক একমাত্র

মোচন হইতে দেখিলে আমরা বড়ই সুখী হইব। মিত্র মৈত্র মহাশয়ের নির্দ্দেশ যুক্তিযুক্ত হইলেও কয়েকটী আপত্তি আছে। ইতিহাস, বর্ণিত ঘটনা কুলীখাঁর মুর্শিদাবাদে আসার বৎসরেক পরে ঘটিয়াছিল বলিতেছে। ইতিপূর্ব্বেই আজিমশ্বানের ব্যবহারের জন্য বাদসাহ আরঙ্গজেব ধমক দিয়া তাঁহাকে বেহারে আসিতে আদেশ দেওয়ায় পুত্র ফেরোকশেরকে ঢাকায় রাখিয়া তিনি স্বপরিবারে প্রথমে রাজমহলে পরে পাটনায় আসিয়া বাস করিয়াছেন (১৭০৩ খৃঃ) কানুনগোদ্বয়কে উল্লিখিতরূপে শাসন করিয়া দেওয়ার তাঁহার অবসর বা প্রয়োজন কোথায়? দ্বিতীয় কানুনগোর দস্তখতে রঘুনন্দনের হস্ত দেখিতে গেলে বলিতে হয় তিনি তাঁহারই সহকারী ছিলেন বা তাঁহার নিকটেও রঘুনন্দনের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। দুইজন কানুনগোর মধ্যে সদ্ভাব ছিলনা, দুই বংশে কানুনগো পদ লইয়া বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা—ইহা আমরা স্থানান্তরে দেখাইয়াছি (সৎসঙ্গ, অগ্রহায়ণ ও চৈত্র, ১৩০২)।মুর্শিদাবাদেরও কানুনগো গোষ্ঠির মধ্যে চিরাগত প্রবাদ রঘুনন্দনকে প্রধান কানুনগো দর্পনারায়ণের সহকারী করিয়া মোহর দেওয়ার কথা স্বীকার রাখিতেছে।

রঘুনন্দন সম্বন্ধে মুর্শিদাবাদের জনশ্রুতি "অমূল্য" একথা সাহস করিয়া বলা যায় না। "তোয়ারিখ বাঙ্গলা" নামক মুসলমান ইতিহাসে সুজাখাঁর দেওয়ান আলম চাঁদকে বঙ্গে প্রথম রায়রায়াণ বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। দুইটী কথাই প্রবাদমূলক বলিয়া আমরা রঘুনন্দনকে প্রথম রায়রায়াণ স্বীকার করিয়াছি।

সমর্থ রঘুনন্দনের হস্তে পড়িল (৭) ১৭১১ খৃঃ অব্দের (১১২৩ হিঃ) বাদসাহ শাহআলম্ বাহাদুর শাহের মোহরযুক্ত নাটোররাজবাটীর এক সনন্দের অনুবাদ পরে প্রদত্ত হইল। ইহাতেও ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের নামে বন্দোবস্ত।

(গ) প্রাচীন রাজসাহীর রাজা উদয়নারায়ণ আত্মহত্যা করিলে বিস্তীর্ণ রাজসাহী-জমিদারীও রঘুনন্দন, রামজীবন এবং "কালুকোঁর"—এই দুই নামে বন্দোবস্ত করিয়া লন, পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে। রাজসাহী-জমি-

(৭) বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র উল্লিখিত "রাণী ভবানী" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "রাজা রামকৃষ্ণ ডেমরার রায়বংশের সর্ব্বাণী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন, এবং দীর্ঘকাল রাজ্যশাসন করিয়া সর্ব্বাণী দেবীকে বর্ত্তমান রাখিয়া ১১১৭ শকে (১৭২০ খৃঃ) স্বর্গারোহণ করেন.....রাণী সর্ব্বাণীর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারিবিহীন সান্তোলরাজ্য ১৭২১ খৃষ্টাব্দ হইতে রাজা রামজীবনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' তাঁহার অবলম্বন, নোটে নির্দ্দিষ্ট আছে। উপযুক্ত মৌলবীর সাহায্য না পাওয়ায় বন্ধুবর নাটোররাজবাটীর সনন্দগুলির সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই বলিয়া যাইতেছে। তাঁহার প্রেরিত নাটোররাজবাটীর সনন্দগুলির বিকৃত নকল হইতে বহরমপুর কলেজের সুযোগ্য মৌলবী সুহৃদ্বর মফীমুদ্দিনের বিশেষ সাহায্যে আমরা প্রকৃত সনন্দ প্রায় উদ্ধার করিয়া এক এক খণ্ড সংশোধিত প্রতিলিপি তাঁহাকে পূর্ব্বেই পাঠাইয়াছি। ইহার একটি সনন্দে দৃষ্ট হয় ১৭০৪ খৃঃ অব্দে (১১১৬ হিঃ) আরঙ্গজেব বাদসাহ উক্ত বলরামের নামে ২৫৩২৪৬৲ টাকা রাজস্বপ্রদানের অঙ্গীকারে ভাতুড়িয়া পরগণা দিগরের জমিদারী দিয়াছিলেন। বক্ষমাণ সনন্দের ইয়াদ্দস্তে এই মর্ম্মে লিখিত আছে "১১১৫ হিঃ (১৭০৩ খৃষ্টাব্দে) সুবা বাঙ্গলার দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁর দরখাস্তে প্রকাশ যে চাকলা ঘোড়াঘাটের ভাতুড়িয়া ও গয়রাহের জমিদার সর্ব্বাণী দেবীর দর্শন ও শ্রবণশক্তি হ্রাস হওয়ায় কার্য্যে নিতান্ত অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন, উঁহার স্বামী পূর্ব্বে ঐ মহালের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। মহালের গোমস্তারা এক্ষণে উহাকে দখল দেয় না, মহালে অনেক বাকী পড়িয়াছে, লুটপাঠ প্রভৃতি হইতেছে। উক্ত মহালের বাকী খাজানা পেস্কস্ প্রভৃতি সহ (টাকার অঙ্কগুলি বিস্তৃত নকল হইতে ভালরূপ উদ্ধার হয় নাই) আদায় দিয়া প্রার্থনাকারী সনন্দপ্রাপ্তির আশা করে। হুকুম হইল যে সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া উহাকে সনন্দ দেওয়া হয়।" এই এক সনন্দ হইতেই প্রমাণ হইতেছে রামকৃষ্ণ ১৭০৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে পরলোকগত হন। মৈত্র মহাশয়ের ১১১৭ শক, অবশ্য ছাপার ভ্রম; কিন্তু ১৭২০ ও ২১ খৃঃ অব্দ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী দেশীয় লেখকগণকে আদর্শ করিলে আমরা ইতিহাসে প্রায়ই এইরূপে প্রতারিত হই। স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র নাটোররাজধানীতে অবগত হইয়া যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার মর্ম্ম প্রায়ই ঠিক; সর্ব্বাণীর মৃত্যুকাল রামকৃষ্ণে অর্পিত হইয়াছে মাত্র। বলরামকে লেখকগণও দখল দেন নাই।

দারীপ্রাপ্তির পর রামজীবন রাজা উপাধি পান। ইতিহাসের কালুকোঁর তাঁহার পুত্র কুমার কালিকাপ্রসাদ। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দ এই জমিদারীপ্রাপ্তির কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (৮), নানা কারণে আমাদের বোধ হয় রাজসাহীপ্রাপ্তি অনেক পূর্ব্বের ঘটনা।

(ঘ) ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে মহম্মদাবাদের খ্যাতনামা রাজা সীতারাম রায়ের উৎসেধ সাধনের পর রঘুনন্দন ভূষণার সুবিস্তৃত জমিদারীরও সিংহযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন। বন্দোবস্ত অবশ্য পূর্ব্বমত রামজীবনের নামে। রাজস্ব-বিভাগের দেওয়ান স্বয়ং নিজ নামে কি বলিয়া জমিদারী লইবেন ?

আরও কিছুকাল পরগণার পর পরগণা রঘুনন্দনী মেলে মিশিয়াছিল। রাজা রামজীবনও জমিদারী-কার্য্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার কল্যাণে সিদ্ধহস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজস্ব-বাকীর অপবাদ কোন কালেই তাঁহাদিগকে স্পর্শ করে নাই। সুজাৎ খাঁ ও নিজাবৎ খাঁ নামক টুন্‌কী স্বরূপপুরের (সরকার মহম্মদাবাদ,—বর্ত্তমান যশোহর) দুই জন পাঠান-জমিদার বিদ্রোহী হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী স্থান লুণ্ঠন করিয়া পরিশেষে মুর্শিদাবাদ-চালানী ৬০০০০৲ হাজার টাকা রাজস্ব পর্য্যন্ত কাড়িয়া লয়। নবাবের আদেশে হুগলীর ফৌজদার তাহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া মুর্শিদাবাদ প্রেরণ করিলে তাহারা চির-কারাবাস-দণ্ডে দণ্ডিত এবং জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিয়া রামজীবনে অর্পিত হয় (৯)। স্বর্গীয়

(৮) মুসলমান ইতিহাসে কোন তারিখ নাই। স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র এক পৃষ্ঠায় দুই স্থানে ১১১৫ ও ১১২০ সাল উদয়নারায়ণের মৃত্যুকাল (Calcutta Review—Selections. July, 1894) এবং ১১২১ সালে রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত বলিয়াছেন। গৌড়ে ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও ঐ সময় (১৭১৪ খৃঃ) রাজ্যপ্রাপ্তির নির্দ্দেশ আছে। ইহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনও সকল সময়ে নিরাপদ নহে দেখা গেল। অন্যান্য প্রমাণ হইতে স্থিরীকৃত হইয়াছে, ভূষণা মহম্মদাবাদের সুবিখ্যাত রাজা সীতারাম রায় ১৭১৪ খৃঃ অব্দে পরলোকগত হন। সীতারামের বিদ্রোহের অনেক পূর্ব্বে রাজসাহী-জমিদারী নাটোরপরিবারের হস্তে আসিয়াছে ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। ভাতুড়িয়ার প্রথম সনন্দেই রামজীবনকে নবাবের প্রিয় জমিদার এরূপ ইঙ্গিত থাকায় ভাতুড়িয়াপ্রাপ্তির পূর্ব্বে রাজসাহীপ্রাপ্তি ঘটে বলিয়া মনে হয়। বিশেষ প্রমাণ অভাবে নিশ্চিত রূপে কিছু বলা যায় না।

(৯) আমরা হস্তলিখিত পারসী গ্রন্থে "টুন্‌কী" পাঠ পাইয়াছি, Gladwin "Tunghee" বলেন। ইতিহাস সমশের খাঁ প্রভৃতিকে এই দুই স্থানের জমিদার বলিয়া নির্দ্দেশ করে।

মিত্র মহাশয় এ ঘটনা রঘুনন্দনের মৃত্যুর পরে ঘটে বলিয়াছেন। ইতিহাস তাহা বলে না, মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন "সাহজিয়াল তুর্কী ও স্বরূপপুরের কিশোর খাঁ (খিজির খাঁ ?) সমশের খাঁ এবং পরগণা পুখুরিয়ার জমিদার ইস্‌কিন্দার বেগ্ নরহত্যা অপরাধে বন্দী হওয়ায় তাঁহাদের জমিদারী রামজীবনকে দেওয়া হয়। জালালপুরের জমিদার এনায়ৎউল্লা রাজস্ববাকীর জন্য রামজীবনের নিকট হাবেলী ফতেবাদ বিক্রয় করেন।"

এখন হইতে রাজসাহী-জমিদারী বাঙ্গলার মধ্যে আয়তনে সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠিল, ইহার তদানীন্তন পরিমাণ বার হাজার বর্গ মাইলেরও অধিক। বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদের উত্তর পশ্চিম ভাগ, রাজসাহী, বগুড়া, পাবনা, ফরিদপুরের প্রায় সমস্ত, রঙ্গপুরের অর্দ্ধাংশ ও যশোহরের কিয়দংশ লইয়া এই সুবিস্তীর্ণ জমিদারী গঠিত। রঘুনন্দনের কল্যাণে মুর্শিদকুলীখাঁর বন্দোবস্তে ইহার দেয় রাজস্বও অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল। এ সময়ে সর্ব্ব সমেত ১৩৯ পরগণায় ইহার সদর জমা ১৬৯৬০৮৭৲ টাকা খাল্‌সা সেরেস্তায় লিখিত হয়। কোম্পানীর প্রথম বন্দোবস্ত সময়ে জমিদারী সামান্য বর্দ্ধিত হইলেও রাজস্ব প্রায় দ্বিগুণ হইয়া উঠে (১০)।

(২নঃ) ভাতুড়িয়ার সনন্দের অনুবাদ।

মহামান্য দস্তখতী সনন্দ এই [illegible]ান ৫ জুলুস্ ১১ই সাবান বাদসাহ সরকারের কেফায়ৎকারী, সম্মানভাজন, সুচরিত্র, অনুগ্রহভাজন বীর মুর্শিদ-কুলী খাঁ হুজুরে প্রার্থনা করেন যে "ভাতুড়িয়া পরগণার (যাহা বাঙ্গলা দেশের কর্ম্মচারিগণের তন্‌খার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে) জমিদারী কার্য্যের নিতান্ত বেবন্দোবস্ত হইয়াছে। তথাকার জমিদার শ্রীমতী সর্ব্বাণী দর্শন ও শ্রবণশক্তি-হীন ও সর্ব্বকার্য্যে অক্ষম ছিলেন ; সম্প্রতি তাঁহার নিঃসন্তান পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে এবং তাঁহার স্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র বলরাম বৃদ্ধ হওয়ায় দর্শন ও শ্রবণ-শক্তির হ্রাস হইয়াছে, তিনিও নিঃসন্তান, জমিদারী-কার্য্যাদি তাঁহার দ্বারা নির্ব্বাহ হয় না। এজন্য অধীন (ফিদ্‌বী কুলী খাঁ) সর্ব্বাণীর মৃত্যুর পর জমিদারী কার্য্যে সম্পূর্ণ কুশল, পরগণে কালীগাঁও প্রভৃতির জমিদার (১১) রামজীবনকে

(১০) Grant's Analysis—Fifth Report.

(১১) এইস্থানে সনন্দের প্রতিলিপি অস্পষ্ট। পরগণে কালীগাঁও না হইয়া "কালীকোঁর

মহালের শাসন ও আবাদের উন্নতি জন্য ঐ জমিদারী দিয়াছে। ভরসা যে হুজুরের সম্মতি ক্রমে দস্তখতী সনন্দ দেওয়া হইবে।” এই প্রার্থনা মঞ্জুর করা হইল। এক্ষণে উচিত যে বর্ত্তমান ও ভাবী করোবিয়ান্ ও মুতঃসুদ্দিগণ এই আদেশ অনুসারে উক্ত প্রশংসিত ব্যক্তিকে এই জমিদারীতে ভারপ্রাপ্ত জানিবেন। তিনি যথা সময়ে রাজকর আদায় দিবেন। প্রজাগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া সাধারণকে সন্তুষ্ট রাখিবেন। নিয়মিত কর ভিন্ন আইন-বিরুদ্ধ কোন নূতন কর বা নিয়ম সংস্থাপন করিবেন না এবং মহালের উন্নতি পক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন ইতি।

পৃষ্ঠে ইয়াদ্ দস্তেও ঐ মর্ম্মে লিখিত আছে। তারিখ (১১২৩ হিঃ)।

অতঃপর ১১২৯ হিঃ (১৭১৬ খৃঃ) অব্দে এক তারিখের লিখিত রাজসাহী, ভাতুড়িয়া ও ভূষণার তিনখানি সনন্দ রাজা রামজীবনের নামে দেখা যায়। অবশ্য সনন্দে রাজা উপাধির নির্দ্দেশ নাই। ইহা ফেরেক্ শেরের সময়। স্পষ্টই অনুমিত হইবে এ তিন খানি সনন্দ সমস্ত জমিদারী আয়ত্ত হইলে সুস্থির হইয়া আনয়ন করা হইয়াছে। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে বাদসাহী সনন্দের প্রয়োজন বলিয়াই এ গুলি লওয়া হয়; নতুবা এ সময়ে মুর্শিদকুলী খাঁ সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে ব্যবহার করিতেছিলেন এ কথা ইতিহাস-পাঠকের অজ্ঞাত নাই। তিনখানি সনন্দ একই এক প্রকারের ভাষায় লিখিত, ইয়াদ্ দস্ত গুলিও সম্পূর্ণ রূপে এক ভাবের। এই সনন্দ বা ফরমান্ তিন খানিতেই “বেশী জমা ও পেস্কস্ স্বীকারে দেওয়া হইল” এবং “আবাদের উন্নতি পক্ষে যত্ন করিবে, পথিকগণের যাতায়াত যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে হয় তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখিবে, প্রজাবর্গকে সুখে রাখিবে” ইত্যাদি জমিদারের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মের নির্দ্দেশ আছে।

উদয়নারায়ণের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র (?) চাঁদ ও সাহেবরামের নামে সুল্‌তানা-বাদের এক সনন্দের অস্পষ্ট প্রতিলিপি আমরা দেখিয়াছি ইনি অবশ্যই রাজসাহীর উদয়নারায়ণ, সুতরাং ইহার নাম উদিতনারায়ণ নহে। ইহাতে আরও দেখা যায় রাজসাহী হস্তচ্যুত হইলেও পার্শ্ববর্ত্তী সুল্‌তানাবাদ উদয়না-

ও রামজীবন জামদার” এরূপ হওয়া সম্ভব। আসল সনন্দের সহিত না মিলাইলে ইহার পরিষ্কার উদ্ধার অসম্ভব।

রায়ণের বংশধরগণকেই প্রথমে দেওয়া হয়। পরে ইহারা নাটোররাটীর পেন্সন্ দ্বারা জীবন যাপন করেন তাহা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় মোহিনীমোহন রায়।

এক-বাক্য, এক-লক্ষ্য, এক-ব্যবসায়,
সঙ্কল্পে অটল, মন্ত্রে অবার্থ-সন্ধান,
স্বাবলম্বে অদ্বিতীয়, আদর্শ বিদ্যায়,
শান্ত, শিষ্ট, সুচতুর, বাগ্মী, মতিমান,
নির্ম্মলচরিত, বন্ধু উপদেশ-দানে,
স্বধর্ম্ম-স্বজাতি-প্রীতি গুপ্ত মর্ম্ম-তলে,—
একাধারে এত গুণ এ মর্ত্ত্য-ভবনে,
লক্ষেতে পাইব কোথা? কোটিতে না মিলে!
ধনে বংশে যশে মানে হইয়া মণ্ডিত,
জীবনের মহাব্রত করি উদ্‌যাপন,
দরিদ্রে দক্ষিণা দিয়া শক্তি পরিমিত,
কর, দেব! সুখে আজ স্বর্গে আরোহণ।
নহে শুধু রাজসাহী, শুধু বঙ্গদেশ,—
ভারত যুড়িয়া আজ তব শোকাবেশ!

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী।

গোময়।

আমরা কৃষিকার্য্যে অনেক বিষয়ে নিপুণ। এ দেশের কৃষাণের অবস্থা, প্রকৃতি ও মূলধন, দেশের ভূমিসংক্রান্ত রাজশাসন, জনগণের আচার ব্যবহার ও জাতিগত সংস্কার, দেশের প্রাকৃতিক সংস্থাননিবন্ধন অন্য দেশ হইতে এ দেশে কৃষিকর্ম্মের যে তারতম্য স্বাভাবিক, তাহার ক্রম বিকাশ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু কৃষিব্যাপারে জ্ঞান কৃষকের যে সহায়তা করে, তাহার অভাব হেতু আমরা অনেক সময় করণীয় কার্য্যে অবহেলা করিয়া যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকি, তাহাতেও সন্দেহ নাই। "গোময়" তাহার একটি উদাহরণ।

গোময় যে একটি প্রধান সার তাহা আমরা বহুকাল হইতে অবগত আছি; এমন কি বঙ্গভাষায় 'সার' গোময়ের প্রতিশব্দ। কিন্তু এই সারের সারত্ব কোথায়, তাহা অবগত না থাকায় কৃষক শকটে শকটে সার ভ্রমে কত সময় কেবল অসার পদার্থ বহিয়া আনিয়া আপন শস্যক্ষেত্রে নিক্ষেপ করে।

গোময়ে যে "যবক্ষার জান" থাকে তাহাই ইহার অন্যান্য উপাদান অপেক্ষা অধিকতর আবশ্যকীয়। কিন্তু আমাদের দেশে গোময়-রক্ষার প্রথা ভাল নয় বলিয়া, আমরা ইহার অধিকাংশ সারভাগ হারাইয়া থাকি। গরুর মূত্রে যবক্ষার জান অধিক থাকে। যে গাভী কেবল গোশালাতেই পালিতা হয়, গরুর পালে মাঠে যায় না, সে এক বৎসরে দুই সহস্র হইতে তিন সহস্র গ্যালন মূত্র ত্যাগ করে। ইহা আদৌ সংগৃহীত হয় না। ইহা গোশালা কর্দ্দমাক্ত করিয়া কেবল অপচয় হয়। গোময়ে যে যবক্ষার জান থাকে তাহাও সমস্ত পাইলে ভাবনা কি? গোময় গোশালা হইতে বা গোচারণের মাঠ হইতে সংগৃহীত হইয়া এক স্থানে স্তূপাকারে রক্ষিত হয়; তাহার উপর প্রখর রৌদ্র ও মূষল ধারায় বৃষ্টি পতিত হয়। তপনতাপ উহাকে শুষ্ক করে, বারিধারা উহা বিধৌত করিয়া লইয়া যায়। গোময় পচিবার সময় যবক্ষার জান হইতে এমোনিয়া (Amonia) হয়; এমোনিয়া সমীরসহ মিশ্রিত হইয়া কৃষকের অজ্ঞাতসারে গোময় হইতে প্রস্থান করে। কিন্তু তরুদেহে মানবের ব্যবহার্য্য তেজস্কর পদার্থগঠনে এমোনিয়া এক প্রধান উপাদান। আমাদের বুদ্ধিদোষে ও

অজ্ঞতানিবন্ধন আমরা এমোনিয়াশূন্য গোময়কে সাররূপে ব্যবহার করি। তীব্র ভিনিগারসিক্ত পক্ষিপুচ্ছ গোময়স্তূপের সন্নিকটে ধারণ করিলে, যদি শ্বেত ধূম বহির্গত হয়, তাহা হইলে এমোনিয়ার পলায়ন উপলব্ধি হইবে। গোময়ের তীব্র দুর্গন্ধ অনেক পরিমাণে এমোনিয়া-জনিত। রৌদ্রের উত্তাপে এমোনিয়ার উদ্ভব বৃদ্ধি পায়; এই নিমিত্ত যাহাতে গোময়স্তূপে রৌদ্র না পাইয়া উহা শীতল থাকে, তাহার উপায় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। গোময়-স্তূপে একটি আচ্ছাদন করিয়া দিলে, ইহা অনেক পরিমাণে সংসাধিত হইতে পারে; ইহাতে বর্ষাগমে গোময় বারিবিধৌত হইয়া যাইবারও আশঙ্কা তিরোহিত হয়। অঙ্গারচূর্ণ পলায়নপর এমোনিয়াকে আপন অঙ্গে আবদ্ধ রাখিতে কিয়ৎ পরিমাণে সক্ষম। এই নিমিত্ত গোময়স্তূপের সহিত অঙ্গার মিশ্রিত করিয়া রাখিলে ভাল হয়। ইহা ব্যতীত, খড় কুটা মিশাইয়া রাখিলেও এমোনিয়ার পলায়ন তিরোহিত হয়। এই কারণে আমাদিগের প্রাঙ্গণের আবর্জ্জনা ও পাকশালার ভস্মাঙ্গার পৃথক স্থানে ফেলিয়া না দিয়া, গোময়স্তূপেই রাখিয়া দিলে ভাল হয়। এই আবর্জ্জনা পচিয়াও সার হয়; এবং ভস্ম ও অঙ্গারও পৃথক পৃথক সার। ভস্মাঙ্গারের আর এক মহৎ গুণ যে, উহারা কীট-নিবারক।

যে প্রদেশে কাষ্ঠ অপ্রতুল, তথায় গোময় ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া গোময় যে শস্যোৎপাদনের সহায়তা করিত, তাহার হ্রাস হয় বটে, কিন্তু উহা একবারে অপচয় হয় না; কারণ গোময়ের ভস্মও উৎকৃষ্ট সার। কোন দ্রব্য দগ্ধ করিলে তাহার জান্তব অংশই দগ্ধ হইয়া যায়; আকরীয় অংশের হ্রাস হয় না। এই জন্য, গোময়ভস্মে গোময়ের আকরীয় অংশ সমস্তই বর্ত্তমান থাকে। লেগুমিন জাতীয় উদ্ভিদে, (মটর, সীম ইত্যাদি) গোময় অপেক্ষা গোময়ভস্মই যে উৎকৃষ্ট সার, তাহা অনেক বার পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে। গোল আলু-ক্ষেত্রে গোময় ব্যবহৃত হইলে কীট উৎপন্ন হইয়া ফসল নষ্ট করে; কিন্তু গোময়ভস্ম প্রয়োগ করিলে সে আশঙ্কা প্রায়ই তিরোহিত হয়। এই কারণ, আমরা গোময়কে ইন্ধন রূপে ব্যবহৃত হইতে দেখিলে অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় "হায় হতোস্মি" করি না।

গোময় ব্যবহার করিবার সময় ইহা সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে উহা না পচিলে তরুলতার কোন উপকারেই আইসে না। পচিলে গোময়ের উপা-

দানের বিশ্লেষণক্রিয়া সাধিত হয়; এবং তখনই সেই বিশ্লিষ্ট উপাদান বারি-বিমিশ্রিত হইয়া তরুমূলের অগ্রভাগস্থ ছিদ্র দিয়া তরুদেহে প্রবেশপূর্ব্বক উহার পুষ্টিসাধন করিতে সমর্থ হয়। টাট্‌কা গোময় ব্যবহার করিলে অনেক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে। এই কারণে, গোময়কে এইরূপ ভাবে নরমে গরমে রাখিতে হয় যে, ক্ষেত্রে ব্যবহার করিবার অতি পূর্ব্বেও যেন উহা না পচে; অথচ ক্ষেত্রে ব্যবহারকালেও যেন একবারে টাট্‌কা না থাকে।

সকল গরুর গোময় সমান উপকারী নহে। "ষাঁড়ের গোবর"—অর্থ, "অপ্রয়োজনীয়"। তাহা বলিয়া এ অর্থ কৃষকের নিকট নহে। আমাদিগের বিবেচনায় বৃদ্ধ ষাঁড়ের গোবর অন্য গোময় অপেক্ষা অধিকতম উপকারী। তাহার কারণ নিম্নে বলিতেছি।

জন্তু যাহা আহার করে, তাহা হইতে তাহার শরীরের পোষণকার্য্যোপযোগী অংশ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্টাংশ মলমূত্রাদি রূপে পরিত্যাগ করে। একটি বাছুর যাহা আহার করে, তাহা হইতে তাহাকে তাহার অস্থি, চর্ম্ম, দন্ত, লোম, ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত উপাদান সংগ্রহ করিতে হয়; কিন্তু একটি বয়োপ্রাপ্ত বলদের অস্থি চর্ম্মাদি প্রস্তুতের নিমিত্ত কোনও পদার্থের প্রয়োজন হয় না, যেহেতু তাহার এসকল গঠিত হইয়া গিয়াছে; সংসারযাত্রানির্ব্বাহকালে যে শারীরিক ক্ষয় হয়, তাহা পূরণের নিমিত্ত যে পরিমাণ পদার্থ প্রয়োজন কেবল তাহাই ভুক্ত দ্রব্য হইতে তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। এই জন্য বৎস অপেক্ষা পূর্ণবয়স্ক বলদের গোময় অধিক উপকারী। যে বলদকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার ক্ষয় অধিক, ও ক্ষয় পূরণের নিমিত্ত খাদ্য হইতে অধিক পরিমাণে পদার্থ গ্রহণ করিতে হয় বলিয়া, উহার গোময় অপেক্ষা "বাবু বলদের" বা "বড়লোক বলদের" (অর্থাৎ যাহাদিগকে কোন পরিশ্রমই করিতে হয় না) গোময় অধিক উপকারী। সেইরূপ, যে গাভী দুগ্ধ দেয়, তাহার গোময় অপেক্ষা যে গাভীর বৎস বড় হওয়ায় দুগ্ধ ফুরাইয়া গিয়াছে, তাহার গোময় অধিকতর উপকারী। আবার বৃদ্ধ গো—যাহার শারীরিক ক্ষয় সম্পূর্ণ রূপে পূরণ করিবার ক্ষমতা স্বভাবতঃ নষ্ট হইয়াছে তাহার গোময় সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্কর।

শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস।

বৃন্দাবনদাস প্রণীত ভজন-নির্ণয়।

—(০)—

বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবনদাসকে গৌরলীলার ব্যাসদেব বলিয়া বর্ণনা করেন। ব্যাসের শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করিয়া যেমন কৃষ্ণলীলা জানিতে পারা যায়, তেমনি বৃন্দাবনদাসের "চৈতন্যমঙ্গল পাঠ করিয়া চৈতন্যদেবের লীলা জানিতে পারা যায়। এই জন্য চৈতন্যমঙ্গলের অপর নাম চৈতন্য-ভাগবত। চৈতন্যভাগবত, বৃন্দাবনদাসের আদি গ্রন্থ। বৃন্দাবন, চৈতন্য-ভাগবত রচনার পর ভজননির্ণয় নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ভজননির্ণয়ে কয়েকবার চৈতন্যমঙ্গলের নাম দৃষ্ট হয়। চৈতন্যদেব, জীবনের শেষ অষ্টাদশ বৎসর জগন্নাথক্ষেত্রে বাস করেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, রাজা প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন। সার্ব্বভৌম প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি চৈতন্য-দেবকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তিনিই চৈতন্যদেবের গৌরহরি নাম রাখেন। চৈতন্য, রাধানাম শুনিলে ভাবে বিহ্বল হইতেন। রামানন্দ রায় চৈতন্যের একজন ভক্ত ছিলেন। তিনি প্রতাপরুদ্রের রাজ্যের এক প্রধান পদে অধিরূঢ় ছিলেন। রামানন্দ প্রণীত জগন্নাথবল্লভ নাটকে চৈতন্যের বন্দনা নাই। পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগ্রন্থে দেখিতে পাই, রামানন্দ রায় চৈতন্যদেবকে ঈশ্বর বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। বৃন্দাবনদাস বলেন, রামানন্দ রায় গদাধরকে রাধা ও চৈতন্যদেবকে কৃষ্ণমূর্ত্তিতে দেখিতে পান। মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র, পণ্ডিতরাজ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, ভাবুকাগ্রগণ্য রামানন্দ রায় চৈতন্যদেবের নিতান্ত অনুগত শিষ্য হইয়াছিলেন।

একদা উৎকলের পণ্ডিতগণ মহারাজ প্রতাপরুদ্রের নিকট গমন করিয়া নিবেদন করেন যে, "মহারাজ! চৈতন্য ভারতী যে ঈশ্বর তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ কি? তিনি যে রাধা বলিয়া ভাবে বিহ্বল হন, সেই রাধার উপাসনারই বা শাস্ত্রীয় প্রমাণ কি?" প্রতাপরুদ্র "জানিয়া বলিব" বলিয়া পণ্ডিতগণকে বিদায় দিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে আহ্বান করেন। সার্ব্বভৌম, সভায় আসিলে প্রতাপ-

রুদ্র তাঁহাকে উৎকলপণ্ডিতগণের প্রশ্নের মর্ম্ম জানাইলেন। সার্ব্বভৌম চৈতন্যদেবকে পণ্ডিতগণের প্রশ্নের বিষয় বলেন। চৈতন্যদেব, সার্ব্বভৌমকে বলিলেন, "সার্ব্বভৌম! তুমি নিজে বৃহস্পতিসদৃশ পণ্ডিত। তুমি নিজেই পণ্ডিতগণের নিকট রাধার উপাসনার শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতে পার। এ বিষয়ে বিশ্বামিত্রপদ্ধতি নামক গ্রন্থ প্রধান প্রমাণ স্বরূপে পরিগণিত হইতে পারে।"

নির্দ্দিষ্ট দিবসে উৎকল-পণ্ডিতগণ, রাজকর্ত্তৃক সভায় আহূত হইলেন। সার্ব্বভৌম পণ্ডিতগণের সঙ্গে বিচার করিয়া চৈতন্যদেবের মতের সমর্থন করিলেন। আমরা সার্ব্বভৌমের কথায় জানিতে পারি যে, মাধবেন্দ্রপুরী চৈতন্যমতের আদিগুরু। একদা এক ব্রহ্মচারী একখানি গ্রন্থ মাধবেন্দ্রকে দিয়া অন্তর্হিত হন। কথিত আছে, স্বয়ং কৃষ্ণই ব্রহ্মচারিবেশে মাধবেন্দ্রপুরীকে গ্রন্থ প্রদান করেন। মাধবেন্দ্রপুরীর প্রতি নিষেধ ছিল, তিনি যেন অন্য ব্যক্তিকে এই গ্রন্থ না দেখান। এই গ্রন্থই রাধার উপাসনার মূল গ্রন্থ। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, চৈতন্যদেব কি একটি নূতন মতের প্রতিষ্ঠা করেন? আমরা বলি চৈতন্যের মত কিয়দংশে নূতন বটে। বৈষ্ণবধর্ম্ম পূর্ব্বাবধি ছিল, কিন্তু উহাতে রাধার উপাসনা ছিল না, পরকীয় রসের স্পষ্ট বিকাশ ছিল না। নূতন বলিয়াই উৎকলের পণ্ডিতগণের মনে মহান্ সংশয় উপস্থিত হয়। মাধবেন্দ্রপুরী চৈতন্যমতের মূল, চৈতন্যদেব পরিপক্ক ফল। উড়িষ্যার পণ্ডিতগণ সার্ব্বভৌমের বিচারে প্রবোধিত হইলেন, চৈতন্যদেবের মতের শাস্ত্রীয়তা স্বীকার করিলেন এবং চৈতন্যদেবকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিলেন।

চৈতন্যদেব কোন সময়ে ক্রমাগত সাত দিন নিজের মত বৈষ্ণবগণের নিকট ব্যাখ্যা করেন। বিষ্ণুপুরী নামক চৈতন্যদেবের পার্ষদব্যক্তি, স্বকৃত ভাবদীপ গ্রন্থে চৈতন্যদেবের মত লিখিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস, এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ভজননির্ণয় রচনা করেন। ভজননির্ণয় চারি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের নাম "কর্ত্তব্য"। প্রথম কর্ত্তব্যে গুরুমহিমা, দ্বিতীয় কর্ত্তব্যে গৌরাঙ্গতত্ত্ব, তৃতীয় কর্ত্তব্যে শান্তদাস্যাদিভাবনির্ণয়, চতুর্থ কর্ত্তব্যে উৎকলপণ্ডিতগণের সমীপে সার্ব্বভৌম ও প্রতাপরুদ্রের কথোপকথন। ভজননির্ণয়ে লিখিত আছে, প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবের মত জানিতে অভিলাষী হইলে স্বরূপের প্রতি প্রেমলীলা বর্ণনের আদেশ হয়। তদনুসারে স্বরূপ,

রাসকৌমুদী নামক গ্রন্থ রচনা করেন। প্রতাপরুদ্র এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া চৈতন্যদেবের মত জানিতে পান। স্বরূপের কিরণাবলী ও বিষ্ণুপুরীর ভক্তিরত্নাবলীও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই দুই গ্রন্থেও চৈতন্যদেবের মত বর্ণিত হইয়াছে।

চৈতন্যদেবের ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদনের জন্য যেন বৃন্দাবনদাস বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলিতে অনেক অসম্ভব কথারও বর্ণনা আছে। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন একদা চৈতন্যদেব কিয়ৎকালের জন্য অন্তর্দ্ধান হন। ভক্তমণ্ডলী বিরহে কাতর হইয়া অন্বেষণ করিতে থাকেন; এমন সময়ে তিনি আসিয়া উপস্থিত হন। সকলে জানিতে পারিলেন যে, তিনি লঙ্কায় বিভীষণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। ভজননির্ণয় গ্রন্থে, বৈষ্ণবগণের উপাসনাপ্রণালী বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কোন ঘটনা বিশদরূপে বর্ণনা করিতে বৃন্দাবনের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

আমরা ভজননির্ণয় হইতে কতিপয় সুন্দর স্থল উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। যে গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা হইল উহা ১২০৩ সালের হস্তলিখিত। লেখকের দোষে অনেক স্থানের অর্থবোধ হয় নাই।

জগন্নাথদর্শনে চৈতন্যের আক্ষেপ।—পদ।

সেইত পরাণনাথ পাইনু।
যাহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেনু॥
সদামাত্র জাগে মনে রম্য বৃন্দাবন।
সেই স্থানে পাবো তোমা ব্রজেন্দ্রনন্দন।
দেখিয়া বিরহ হয় না দেখি বিশেষে।
বিরহ স্বরূপ গৌর প্রেমাঙ্গ বিশেষে॥

অন্যত্র রাধাভাবে আক্ষেপ।—

কোথা গেল প্রাণনাথ অনাথ করিয়া।
সখাগণ সঙ্গে মোর আনিলে ছাড়িয়া॥
একাকিনী হইনু মুই গহন কাননে।
প্রাণ যায় মোর পাছে শুনাহ বচনে॥
এইমত নানা পদ করয়ে বিষাদ।
স্বরূপ পণ্ডিত দেখি মানয়ে প্রমাদ॥

জয়তিতেঽধিকং পড়ে অধ্যায় সমুদায়।
পণ্ডিত স্বরূপ দোঁহে তাহে মিশি গায়॥
কিবা হেতু পড়ে গৌর দুই লোক শুনে।
কেবা জানি পারে তাহে রামানন্দ বিনে॥
মথুরা বিরহাদি গৌরাঙ্গেতে যাত।
এই শ্লোক পড়ে তাহে ডাকে প্রাণনাথ॥
ললিতা বিশাখা সখী আগো প্রাণের সমান।
প্রাণপতি মোর হরি না আইল নিদান॥
স্বরূপ শ্রীরাম চাহি এই শ্লোক পড়ে।
তাহা প্রাণনাথ বলি ধরণীতে পড়ে॥
অহে কৃষ্ণ রাধাবর পরম প্রধান।
কি হেতু বাড়ালে প্রীত বধিতে নিদান॥
এই কুঞ্জ এই সখী এই বৃন্দাবন।
এইত কালিন্দী রাধা শীতলবদন॥
এই চন্দ্র এই দিবা এই নিশাকাল।
কন্দর্প কুসুম তরু মালতী বিশাল॥
সভে সুখ দিত তবে যবে ছিলে তুমি।
তব দেহ মোর প্রাণ কি করিব আমি॥
শীতল যমুনা-জল অনল সমান।
সুধানিধি দিবাকর হইল নিদান॥
কোথা গেলে পাব আমি মুরলীবদন।
শ্রবণে শুনিব আর মধুর বচন॥
আর না বাজাবে বাঁশী কদম্বের মূলে।
আর নাহি দেখি খেলা কালিন্দীর কূলে॥
আর নাহি শোভা ইথে বৃন্দাবন।
সেই গোপপুত্রগণ হইল এমন॥
কেমনে পাসরিব সে সব বিলাস।
এইদণ্ডে হইল যত রসের প্রকাশ॥

আমি পরবধূ প্রীতে হইনু যে বশ।
দারুণ নির্দ্দয় বিধি ভাঙ্গিল সে রস॥
কেন বা পীরিতি কৈনু পরের পুরুষে।
আগে সুখ যত হইল দুখের বিশেষে॥
এইমত কান্দে প্রভু সহজে প্রেমাঙ্গ।
পণ্ডিত শ্রীরাম রোধে অস্থির গৌরাঙ্গ॥

গঙ্গাতীরে রাধা রাধা বলিয়া গৌরাঙ্গের ভ্রমণকালে।—

অহো রাধা প্রাণময়ি কর অবধান।
তব রূপ দেখি মোর হরিল গেয়ান॥
কোথা গেলে মোরে ছাড়ি কমলবদনি।
বারেক করহ দৃষ্টি খঞ্জনলোচনি॥
তোমার বরণধন অতুল কাঞ্চন।
মোরে দীন দুঃখী দেখি না কর বঞ্চন॥
বারেক দেখাও রূপ প্রেমের আনন্দ।
হৃদয়ে লাগাও মোর চরণার বিন্দ॥
কোথা গেলে প্রাণময়ি আমারে ছাড়িয়া।
কেমনে বাঁচিব আমি তোমা না দেখিয়া॥
বারেক শুনাও মোরে মধুর বচন।
প্রাণদগ্ধ করে মোরে দারুণ মদন॥
কোন্ দোষ কৈনু মুই ছাড়ি গেলা কোথা।
তোমা বিনা মন পুড়ে নাহি যায় ব্যথা॥
উলটি কদলীতরু যখন ঘটন।
কমল কোমল পদে করিলে রটন॥
করিশুণ্ড বাহু যুগে করিয়া বন্ধন।
যত দোষ কৈনু মুই করহ মোচন॥
প্রাণ রাখ প্রাণময়ি দরশন দিয়া।
অহো অহো রাধা বলি ডাকেন ফুকারিঞা॥
তাহার যতেক গুণ স্বরূপ আখ্যান।

পাইয়া রোদন করে সদা পড়ে ধ্যান ॥
গঙ্গাতীরে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া।
রাধা রাধা বলি ডাকে বাউল হইয়া ॥

বৃন্দাবনদাস এই বলিয়া গ্রন্থরচনা আরম্ভ করিয়াছেন।—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

বন্দে গুরুপদদ্বন্দ্ব মানয়ং ভক্তি ভাবয়োঃ
নিত্যং কল্পতরোমূলমজ্ঞানান্ধ বিনাশনং ॥
গৌরং কৃপাময়ং বন্দে সগণেধীর বৈষ্ণবৈঃ।
রাধাকৃষ্ণৈক প্রেমাঙ্গং বিশ্বচৈতন্য বিগ্রহং ॥
গুরুকৃপা হৈতে পাই গৌরঅবতার।
গৌর হইতে রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জের বিহার ॥
আমি নাহি জানি কিছু অল্পমাত্র মতি।
চৈতন্যমঙ্গলে কিছু করাইলা স্মৃতি ॥
মোরে আজ্ঞা কৈল প্রভু ভজনবিধানে।
করবৃন্দাবনদাস শাস্ত্র অনুমানে ॥ ইত্যাদি

গ্রন্থের শেষভাগ এইরূপ।—

না ধরিবে দোষ মোর বৈষ্ণব সকল।
মাধবেন্দ্রপুরী-পদ পরম মঙ্গল ॥
মন্মথ গোপাল গুরু জগতে বিদিত।
মাধবেন্দ্রদ্বারে কৈল সংসারের হিত ॥
আমি কিবা জানি তার লীলার অবধি।
ভক্তমুখে শুনি কিছু লিখিলাঙ বিধি ॥
নিত্যানন্দ প্রভু মোর করুণাসাগর।
হরিনাম জ্ঞান দিঞা তারিলে পামর ॥
তাঁর পাদপদ্মে মোর অশেষ প্রণাম।
যারে সর্ব্ব ভক্ত বোলে স্বয়ং ভগবান ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং গুরু-অবতার।
বৃন্দাবনদাস বন্দে কি জান মো ছার ॥

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

শিবনিবাস।

—(:০:)—

বাল্যকাল হইতে যে শিবনিবাসের প্রশংসা শুনিয়া আসিতেছি,—

"শিবনিবাসী, তুল্য কাশী
ধন্য নদী কঙ্কনা :
উপরে ঘড়ি, নিচে ঘড়ি
বাজে ঘড়ি ঠনঠনা।"

সেই শিবনিবাস দর্শনের জন্য মনে বড়ই কৌতূহল হইল। ইচ্ছা হইলে সুযোগের অভাব হয় না,—কয়েক জন উপযুক্ত সঙ্গীও মিলিল। একদিন সদলবলে শিবনিবাস দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিলাম।

শিবনিবাস মাজদিয়া (কৃষ্ণগঞ্জ) হইতে ২।৩ মাইলের মধ্যে। মাজদিয়ার উত্তরপশ্চিম কোণে অবস্থিত। স্থানটি প্রায় চতুর্দ্দিকেই নদীবেষ্টিত হওয়ায় একটি দ্বীপের মত বলা যাইতে পারে। চূর্ণী ও মাথাভাঙ্গার মধ্যে ব্যবধান এক মাইলের বেশী হইবে না। এই দুই নদী এখানেই রেলরাস্তার পুলের নিকট একত্র মিশিয়াছে। নদী গুলি অতি অল্প পরিসর, স্রোতের বেগ খুব মন্দ। নদীকূলে ও গর্ভে নানারূপ শৈবাল জন্মিয়াছে। তাহার জল এত পরিষ্কার স্ফটিকোপম যে নদীর নিম্ন তলস্থ বালুকাকণা গুলি পর্য্যন্ত একটি একটি করিয়া গণনা করা যায়। মৎস্যাদি জলচরজীবগণের ইতঃস্তত গমনাগমন পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। এত স্বচ্ছতোয়া নদী আমি আর দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। দুই নদীর জলই খুব স্বচ্ছ, তাহা হইলেও চূর্ণীর জল মাথাভাঙ্গা অপেক্ষা আরও পরিষ্কার, আরও স্ফটিকনিভ। চূর্ণী পার হইয়া আমরা কয়জন গল্প গুজবে পথ অতিক্রম করিয়া চলিলাম। বলা বাহুল্য যে আমরা পদব্রজেই গিয়াছিলাম। দূর হইতে শিবনিবাসের উচ্চচূড় মন্দির দৃষ্টিপথে পতিত হইল। কতবার গাড়ীতে যাইতে এই মন্দির দেখিয়াছি, কত কি ভাব মনে হইয়াছে, কতবার এখানে নামিয়া এই প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ মন্দির গুলিকে দেখিয়া জীবন সার্থক করিব ভাবিয়াছি, সেই সব পুরাতন স্মৃতি যেন আবছায়ার মত

মনের মধ্যে আসিতে লাগিল। মন যেন একটু আকুলিত হইয়া পড়িল। এবার সে আশা পূর্ণ হইবে, বহুদিনের একটা অতৃপ্ত বাসনার আজ শেষ হইবে মনে করিয়া একটু সুখবোধ হইল।

শিবনিবাস গ্রামের মধ্যে পৌঁছিয়া কোন উদার বন্ধুর আলয়ে মাধ্যাহ্নিক কর্ত্তব্য শেষ করা হইল। ক্রমে বেলা পড়িয়া গেলে আমরা গ্রামটির মধ্যে একবার বাহির হইলাম। আজকাল প্রত্নতত্ত্বের যে ধূম পড়িয়া গিয়াছে তখন সে তত্ত্ব কিছু সংগ্রহের চেষ্টাও মনে বলবতী হইল। আমরা রাজবাড়ী দেখিতে গেলাম। রাজবাড়ীর আধুনিক অবস্থা অতীব শোচনীয়। বাড়ীটি ত্রিতল। একতল ভূগর্ভে, আর দুইতল উপরে দেখা যায়। এখন বাড়ীর শোভা শ্রী কিছুই নাই।

রাজবাড়ীর সঙ্গে যে সব স্থান ভুক্ত এবং প্রাচীরবেষ্টিত ছিল তাহার প্রায় সমস্তই এখন অন্যান্য অনেক ভদ্রলোক লইয়া বসবাস করিতেছেন। রাজবাড়ীর অন্তপুরের প্রকোষ্ঠটিই মাত্র এখন আছে; তথায় রাণীদিগের কেহ কেহও আছেন এমত শুনিলাম। তবে তাঁহাদেরও যে বড় ভাল অবস্থা তাহা নহে। আমার জনৈক সঙ্গী নকুল বাবু এই রাজবংশের দৌহিত্রবংশীয়। তাঁহার নিকট শিবনিবাস সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা জানিতে পারিলাম। রা বাড়ীর দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রাণে বড়ই দুঃখ হইল; যে স্থানে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা বসিত, নদীর তীর হইতে প্রাসাদ পর্য্যন্ত কামানের শ্রেণী সজ্জিত থাকিয়া যে পুরী রক্ষিতা হইত, শত শত সিপাহী শান্ত্রীর কলরবে যে স্থান সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত, আজ সে স্থান শৃগাল কুকুরের ক্রীড়াভূমি হইয়াছে, আজ তথায় একটি দ্বারবান পর্য্যন্ত নাই! ধন্য কাল! ধন্য তোমার প্রভাব!

শিবনিবাসের পত্তন সম্বন্ধে ইতিহাস এইরূপ যে,—এই স্থানের নিকটবর্ত্তী চূর্ণীর তীরস্থ একটি নিবিড় বন ছিল, তথায় একটি দুর্দ্দান্ত দস্যু বাস করিত। অনেকে বলেন তাহার নাম নসরৎ খাঁ। যাহাহউক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রাজধানী কৃষ্ণনগর হইতে শুনিতে পান যে ঐ দস্যু প্রজাকুলের বড় অনিষ্ট করিতেছে, তাহাকে দমন করিবার জন্য মহারাজ সৈন্যসামন্তসহকারে এইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হন, কিন্তু সে দস্যুরও প্রাণের মমতা ছিল। প্রবল পরাক্রান্ত কৃষ্ণনগরাধীপের পরাক্রমের বিষয় তাহার অপরিজ্ঞাত ছিল না, এজন্য তাঁহার অভিযানের সংবাদ পাইয়াই সে পলাইয়া যায়। যাহাহউক মহারাজ নদীতীরে

শিবির সন্নিবেশ করিয়া তথায় রাত্রি যাপন করেন। পরদিন প্রাতে নদীতীরে হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিতেছেন, এমন সময় একটি বৃহৎ রোহিত মৎস্য জল হইতে তীরে লাফাইয়া পড়িল। রাজপারিষদগণ পরামর্শ দিলেন যে "মহারাজ, যখন এস্থান নিজ হইতে মহারাজকে উপহার দিয়াছে তখন এস্থানে আপনার বাস করা কর্ত্তব্য।" মহারাজের মনেও সে কথা যেন ভাল লাগিল। তিনি সে স্থানে বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সুতরাং তদুপযুক্ত প্রাসাদাদি নির্ম্মিত হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। অচিরেই সেই নির্জ্জন চূর্ণী নদীতীরে উচ্চ রাজপ্রাসাদ শিরোত্তলন করিয়া দণ্ডায়মান হইল। মহারাজ স্থানটির তিন দিকে পরিখা খনন পূর্ব্বক চূর্ণীর সহিত যোগ করিয়া দিয়া শিবনিবাসকে যে রজত কাঞ্চী পরাইয়াছিলেন, তাহা কঙ্কনবৎ শিবনিবাসকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া ঐ পরিখাকে কঙ্কনা নাম প্রদান পূর্ব্বক তথায় বহু সংখ্যক শিবমন্দির স্থাপন করিয়া স্থানটির নাম শিবনিবাস রাখিলেন। তখন শিবনিবাসে এত শিব ও শিবমন্দির ছিল যে বাস্তবিকই স্থানটিকে যেন শিবের নিবাসস্থল বলিয়াই বোধ হইত। অনেকে আবার এরূপও বলেন যে, সে সময় মহারাষ্ট্রগণের অতুল প্রতাপ; তাহাদের লুণ্ঠন-আক্রমণাদিতে বঙ্গদেশ অত্যন্ত চকিত হইয়া পড়িয়াছিল। মহারাষ্ট্রগণ তখন বঙ্গের এতই আতঙ্কজনক হইয়াছিল যে, বঙ্গবামা সন্তানের দুরন্তপণা নিবারণের জন্য 'বর্গীর' নাম ব্যবহার করিতেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মহারাষ্ট্রদিগের উৎপাত উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন প্রদেশে স্বীয় বাসস্থান মনোনীত করেন।

একথা আমাদের নিকট অসঙ্গত বোধ হয় না বরং এই প্রস্তাবই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যাবজ্জীবন এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। কেবল মৃত্যুকালে গঙ্গাতীরস্থ 'গঙ্গাবাস' নামক তদীয় স্থাপিত গ্রামে বাস করেন। কৃষ্ণগঞ্জও এই মহারাজের নাম অনুসারেই সংস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

এই শিববিবাসে থাকিবার সময়ই মহারাজ, নবাব সিরাজদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্রমূলক পত্র প্রাপ্ত হন, এবং অত্রস্থ মন্ত্রভবনে বসিয়াই তিনি এই বিষয়ের ঔচিত্যানুচিত্য সম্বন্ধে চিন্তা করেন।

মহারাজের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মহেশচন্দ্র এখানে থাকেন, অন্যান্য পুত্রগণ 'হরধাম', 'আনন্দধাম' প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। মহারাজ শিবচন্দ্র কৃষ্ণনগরে ছিলেন বটে কিন্তু তিনি অধিকাংশ সময়ই শিবনিবাসে থাকিতেন।

এই সকল প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজগণকর্ত্তৃক অধ্যুষিত, মহা গৌরবসম্পন্ন শিবনিবাস এখন কেবল সেই প্রাচীন কীর্ত্তির কয়েকখানি জীর্ণ কঙ্কাল ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান থাকিয়া স্বীয় দুরদৃষ্টের পরিচয় প্রদান করিতেছে। রাজপ্রাসাদ, ঘড়িখানা, নহবতখানা, সকলই ভূমিস্যাৎ হইয়াছে; তাহাদের দেহপঞ্জর দ্বারা স্থানীয় অনেক ব্যক্তির নব নব গৃহ রচিত হইয়াছে। নকুল বাবু বলিলেন যে, এখানে এমন বাড়ী নাই যাহাতে রাজবাড়ীর সেই প্রাচীন ছোট ছোট ইট অন্ততঃ দুই চারি খানি দেখিতে না পাওয়া যায়। তাহার পর আমরা মন্দির দেখিতে গেলাম। এখন তিনটিমাত্র বড় মন্দির ভাল অবস্থায় আছে। দুইটি শিবমন্দির আর একটি রামসীতার মন্দির। মন্দিরগুলির নির্ম্মাণকৌশল দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। সেই উচ্চচূড় গগনস্পর্শী মন্দির সমস্ত খিলান করিয়া নির্ম্মিত। এই দেশীয় কারিগর দ্বারাই এ সমস্ত মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরগুলি নির্ম্মাণগুণে এই দেড়শত বৎসরেরও অধিককাল প্রাকৃতিক নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও বেশ সুন্দর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া উপরের দিকে তাকাইলে প্রাণে যেন ভয়ের সঞ্চার হয়, বুঝিবা মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই প্রকাণ্ড গম্বুজ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া এ জীবলীলার অবসান করিয়া দিবে। একটি কথা বলিলে সে কথা যেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিয়া শত প্রতিধ্বনিতে কর্ণ বধির করিয়া দেয়, সে বাক্যের অর্থবোধ দুর্ঘট হইয়া পড়ে। তারপর সেই দেবমূর্ত্তিগুলি! তাদৃশ সুন্দর কৃষ্ণ প্রস্তর আর দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। শিবলিঙ্গদ্বয় সুবৃহৎ এবং যেন সর্ব্বদাই তৈলচর্চ্চিত; বোধ হয় যেন কেহ এখনই পূজা করিয়া রাখিয়া গিয়াছে! শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তিটি অতি পরিপাটি! যে সকল ভাস্কর এই মূর্ত্তিগুলি প্রস্তুত করিয়াছে তাহারা যে অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই! সে মন্দিরে দাঁড়াইয়া সেই সকল মূর্ত্তি দেখিয়া ভারতের প্রাচীন শিল্পগৌরবের কথা মনে পড়িয়া গেল!" এই সব সুন্দর মূর্ত্তি,—এই সব উচ্চচূড় পাষাণবৎ মন্দির এ সমস্ত তো এই ভারতীয় শিল্পীদিগেরই হস্তচিহ্ন! তাহারা আজ

কোথায়? তাহাদের ব্যবসায়, তাহাদের শিল্প কেন লোপ পাইল? সেই ভারতের সন্তানকে এখন শিল্পবিদ্যা শিখিবার জন্য সুদূর ইটালি প্রদেশে যাইতে হইতেছে! নীরবে এক বিন্দু অশ্রু নয়নের কোণে আসিল, নীরবে সে অশ্রু মুছিয়া মনে মনে কালকে নমস্কার করিলাম!!

মন্দিরের বহিঃস্থ কোটরে অসংখ্য শুক শালিকাদি বিহঙ্গকুল নিজ নিজ কুলায় প্রস্তুত করিয়াছে, তাহাদের অবিরত কলধ্বনিতে সে স্থান সতত শব্দায়মান!

গত ভূমিকম্পে মন্দিরের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই, একটি মন্দিরচূড়া পড়িয়া গিয়াছে। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার আগাছা জন্মিয়াছে এবং পশ্বাদির অত্যাচারে পার্শ্বস্থ অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, কৃষ্ণনগরের বর্ত্তমান মহারাজের এ বিষয়ে দৃষ্টি নাই। স্বীয় পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিকলাপ রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার মত শিক্ষিত রাজার দৃষ্টি না থাকিলে বড়ই ক্ষোভের বিষয়; এগুলি রক্ষার জন্য ইনি একটা বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দিলে ভাল হয়।

মন্দিরগুলির বাহিরে এবং প্রত্যেক দেবমূর্ত্তির পাদদেশস্থ প্রস্তরে একটি করিয়া সংস্কৃত শ্লোক লিখিত আছে। লেখাগুলি বঙ্গাক্ষরে,—অতি চমৎকার ও পরিষ্কাররূপে খোদিত। বহিঃস্থ শ্লোকগুলি অত্যুচ্চে স্থাপিত, অতি কষ্টে দুইটিমাত্র সংগ্রহ করিয়াছি। শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরের বহিঃস্থ শ্লোকটি ও বিগ্রহের পীঠস্থ শ্লোকটি সংগ্রহ করিয়া উঠিতে অবসর পাইলাম না। বিশেষতঃ তখন মন্দিরের মধ্যে অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল, পাদপীঠস্থ শ্লোকাক্ষরগুলি স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতেছিল না। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য শ্লোকগুলি নিম্নে লিখিয়া দিলাম;—

সর্ব্ব পশ্চিমস্থ মন্দিরের বহিঃস্থ শ্লোক। ১৬৭৬

যো জাতঃ খলু ভারতে সুরতরু র্জেতা দিগীশাং শকে
সেনানী সুখরাজি রাজবিলসৎ সংখ্যাবতীয়ং পুরে
কৃত্বামন্দিরমিন্দু চুম্বি শিখরঃ (ং?) ভূপাল চূড়ামণি—
স্তত্র শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র নৃপতিঃ শম্ভূং সমস্থাপয়ৎ।

ঐ শিবলিঙ্গের পাদপীঠস্থ শ্লোক।

ত্রৈলোক্যপ্রভুনা প্রতিষ্ঠিত তয়া রামস্তু রামেশ্বর

উৎসাহ।

[শ্রাবণ, ১৩০৫

স্তদ্বৎ শ্রীদ্বিজকৃষ্ণচন্দ্র কৃতিনা ভূরাজ রাজাভিধাং
তদ্দত্তাং দধতা স্বয়ং ত্রিজগতীনাথোঽপি সংস্থাপিতঃ।
নাম্না ভক্ত পরায়ণঃ সমভবৎ শ্রীরাজরাজেশ্বরঃ।

মধ্যস্থ মন্দিরের বহিঃস্থ শ্লোক। ১৬৮৪

যঃ সাক্ষাৎ কৃত শৈবমূর্ত্তি বসুধেশানাং শকে সম্ভবাং
সংখ্যাতঃ ক্ষিতি দেবরাজ পদভাক্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রভুঃ।
তস্য ক্ষৌণিপতে র্দ্বিতীয় মহিষী মূর্ত্তেব লক্ষ্মীঃ স্বয়ং
প্রাসাদ প্রবরে প্রাসাদ সুমুখং শম্ভুং সমস্থাপয়ৎ।

ঐ পাদপীঠস্থ শ্লোক।

যঃ শ্রীমান্ অতিগত্য (?) রাজতি মহারাজাদি রাজপ্রভাং
লক্ষ্মীস্তন্মহিষী হরেরিব মহারাজ্ঞীতি সংকীর্ত্তিতা
তৎ সংস্থাপিত এষ দীব্যতি মহারাজ্ঞীশ্বরোঽয়ং শিবঃ
খ্যাতঃ স্যাৎ গিরিশ স্বদীশ্বরতয়া ভক্ত্যাহি যৈঃ স্থাপ্যতে।

শ্লোকগুলির রচনাপ্রণালী অতি সুমিষ্ট এবং জ্ঞানবত্তার পরিচায়ক। বিশেষতঃ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্থাপিত মন্দিরে যে পাণ্ডিত্য ও কবিত্বপরিচায়ক কবিতা থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। যিনি নিয়ত পণ্ডিত-মণ্ডলী সমাবৃত হইয়া কাব্যরসাস্বাদনে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, যাঁহা কৃপাসাগরের বলে অনেক বঙ্গীয় রত্ন উজ্জ্বলপ্রভ হইয়াছেন তাঁহার স্থাপিত মন্দিরের শ্লোকের কবিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই।

যাহা হউক আমরা মন্দিরাদি দেখা শেষ করিয়া পুনরায় কৃষ্ণগঞ্জ অভিমুখে রওনা হইলাম। মন্দিরে সান্ধ্য আরাত্রিকের শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতে লাগিল এবং সে বাদ্যধ্বনি মন্দিরকুট্টিমে প্রতিহত হইয়া শতগুণে বহির্বায়ুতে মিশাইয়া পড়িতে লাগিল।

আমরা শ্রবণপুটে সে গম্ভীর মঙ্গল বাদ্যসুধা পান করিতে লাগিলাম। আমার মনে কেবলই শিবনিবাসের পূর্ব্ব গৌরব বারম্বার উদিত হইতে লাগিল! এই মন্দিরে যখন গুরু গম্ভীরে "মহিম্ন পারস্তে" ইত্যাদি স্তব ধ্বনিত হইয়া শিব-নিবাসের নরনারীর কর্ণ পবিত্র করিত, যখন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় সভাসদ আদি লইয়া এই শিবনিবাসে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, কতশত সেনা

এই শিবনিবাসকে পদভরে কম্পিত করিত, সে সব চিত্রকল্পনা মানসপটে অঙ্কিত করিতে লাগিল। আর মনে হইল,—ভারতের প্রাচীন শিল্পের কথা! এমন সুন্দর সুন্দর পূর্ত্তবিদ্যার গভীরতার পরিচায়ক মন্দিরনির্ম্মাতাগণ—এমন সুদক্ষ ভাস্করগণ কোথায়? তাহারা লোপ পাইল কেন? আর কি তাহারা আসিবে না, তাহাদের নৈপুণ্যে কি আর তাহারা আমাদিগকে চমকিত করিবে না? এ সমস্ত কি আর শ্রুতি ও স্মৃতিগত অবস্থা হইতে দৃষ্টিগত অবস্থায় আসিবে না? মনের মধ্য হইতে ধ্বনিত হইল "তে হি নো দিবসা গতা।"

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

—(০)—

কবিতাকুঞ্জ।

নিবেদন।

তোমার অতুল স্নেহ-নদীতে
সিনান করি,
ফিরিনু গৃহে শূন্য কলসী
সলিলে ভরি।
তোমার চরণ পরশ পবিত্র
অমূল্য ধূলি,
মাখিয়া অঙ্গে দাহ যন্ত্রণা
গিয়াছি ভুলি।
তোমার মধুর হাস্য-মদিরা
করিয়া পান,
জানি না কিক্ষণে আজি হে বন্ধু!
হারানু জ্ঞান।
তোমার প্রেম- সুধা-সমুদ্রে
ডুবিয়া মরি,
হারালাম কূল, আজি অকূলে
বল কি করি।
হে নাথ! হে সখা! নয়নানন্দ
পরাণ-বন্ধু!
উছলি উঠিছে নয়নে আমার
অশ্রু-সিন্ধু।
কত যে ধূলি ও পদতল
আছে পরশি,
লও মিশাইয়া এ ধূলি সে সনে
তোমার দাসী।

শ্রীসরলাবালা দাসী।

নিমন্ত্রণ।

আমাদের পবিত্র জীবন,
শুধু কি নিজের তরে,
বহিতে গরব ভরে,
অনন্ত নিদ্রার মাঝে রহিতে মগন?

ব্যথিতের নয়ন-আসার,
ঢালিয়া প্রেমের বারি,

যদি না মুছাতে পারি,
এ দগ্ধ জীবনে তবে কিবা ফল আর?
তৃষিতেরে নাহি দিব জল,
আশ্রিতেরে কাছে ডেকে,
রাখিব না স্নেহে ঢেকে,
তবে এ জীবন বয়ে কিবা আছে ফল?

দীনেরে না করিব যতন,
মহত্ব বাড়াতে তার,
দলিব পদের ঘায়,
এ যদি জীবননীতি কায কি জীবন?

নিজ স্বার্থ মরিব খুঁজিয়া,
আমার একটু প্রাণ,
পরে না করিব দান,
শ্মশানে প্রেতাত্মা সম মরিব ঘুরিয়া?

চাহিনা গো এমন পরাণ!
এ নীচতাপূর্ণ প্রাণ,
করিব গো খান খান,
আপনারে সারা বিশ্বে করিব গো দান!

হব আমি নদীর লহর,
মাতায়ে মানবদলে,
মিশাব সাগরজলে,
বাজাইব সপ্তস্বরে বীণা মনোহর।

মিশে আমি মলয় পবনে,
চাঁদের জোছনা ল'য়ে,
ফুলের সুরভি ব'য়ে,
ভেট দেব হাসি হাসি বিশ্বের চরণে।

হব আমি হতাশের আশা,
তাহাতে মিশায়ে প্রাণ,
গাহিব প্রেমের গান,
পূরাইব মরমের যত ভালবাসা।

মাতৃহীন যত বালকের,
'মা' হ'য়ে লইব কোলে,
তুষিব মধুর বোলে,
মোর স্নেহে ভুলে যেন ব্যথা মরমের!

অধম পতিত যত আছে,
বিভু প্রেমামৃত ঢালি
ধুইয়া প্রাণের কালি,
'ভাই বোন' ব'লে স্নেহে ডেকে লব কাছে।

ভালবাসা ঢালিব সবায়,
নৃপতি পতিত দীন,
কারে না ভাবিব ভিন,
ডুবাইব বিশ্ব মোর স্নেহের ধারায়।

বিশ্বপ্রেমে হইব মগন,
প্রতিদান নাহি লব,
শুধু জগতের হব,
মাতাইব মহানন্দে তাতেই জীবন।

কে সাধিবি এ মহা সাধন,
এক প্রাণ এক মনে,
আয় সে আমার সনে,
কেহ কি লইবি স্নেহে মোর নিমন্ত্রণ!

শ্রীনগেন্দ্রবালা—।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। ৫ম ভাগ ১ম সংখ্যা। আমরা বিনিময়ার্থ ও সমালোচনার্থ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা পাইয়া সম্মানিত হইয়াছি। যে উদ্দেশ্যে এই পত্রিকা প্রচলিত হইয়াছে তাহা বঙ্গসাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই আদরণীয়। বর্ত্তমান সংখ্যায় "দ্বিজ রামচন্দ্রের দুর্গামঙ্গল কাব্য", "হরি ও সোম", "ইতিহাস-রচনার প্রণালী", "শীতলা-মঙ্গল", "বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ"—এই পাঁচটি প্রবন্ধ আছে। ইতিহাসরচনার প্রতি সম্প্রতি অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, বোধ হয় পরিষৎ সেই জন্যই ইহার রচনাপ্রণালী নির্দ্দেশ করিবার জন্য সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের দ্বারা এই প্রবন্ধের অবতারণা করাইয়াছেন। প্রবন্ধটি সময়োপযোগী তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইতিহাসরচনার প্রণালী নির্দ্দেশ করা সহজ নহে; কি স্বদেশে, কি বিদেশে কোন লেখকই ইহার সর্ব্ববাদিসম্মত আদর্শ হইতে পারেন না। এক যুগে যাহা ইতিহাসরচনার প্রকৃষ্ট প্রণালী বলিয়া খ্যাতি লাভ করে, অন্য যুগে তাহা সর্ব্বথা পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। গুপ্ত মহাশয় যাহাকে প্রণালী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, লর্ড মেকলেও বহু পূর্ব্বে সেই প্রণালীর নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু এখন লর্ড মেকলের জন্মভূমিতেও সকল লেখক সে প্রণালীর অনুসরণ করেন না। যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যসমাজে ইতিহাসালোচনায় নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে;—"আমাদের দেশে এখন ইতিহাস লেখা আরম্ভ হইয়াছে। কাব্য-নাটক প্লাবিত সাহিত্য-ক্ষেত্রে কেহ কেহ ইতিহাসের সম্মান-রক্ষায় উদ্যত হইয়াছেন, কিন্তু ইঁহারা যেরূপ গবেষণাকৌশলের পরিচয় দিতেছেন, ইতিহাসের প্রকৃতির দিকে সেরূপ দৃষ্টি রাখিতেছেন না। সর্ব্বপ্রথম কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে যে ত্রুটি ঘটিয়া থাকে, আমাদের সাহিত্যসমাজে ঐতিহাসিকদিগেরও তাহাই ঘটিয়াছে। ভাষা, শৃঙ্খলা এবং বর্ণনা প্রভৃতিতে ইঁহাদের তাদৃশ নৈপুণ্য পরিদৃষ্ট হইতেছে না। ইঁহাদের গ্রন্থে অতিরিক্ত স্বদেশপ্রেম এবং অত্যধিক অহংজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ইঁহারা ঘটনাগুলি স্তরে স্তরে সজ্জিত করিতেছেন, কিন্তু বর্ণনাবৈচিত্র্য বা শৃঙ্খলার অভাবে ঐ সকল [illegible]র বিবরণ নিরতিশয় নীরস হইয়া পড়িতেছে। ইঁহারা বৈদেশিক [illegible] লেখকদিগের মতামত এত উদ্ধৃত করিতেছেন যে, তৎসম[illegible] কেবল গ্রন্থগুলি ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িতেছে মাত্র। ইহাতে এই ফল হইতেছে যে, পাঠক এক স্থানে পরস্পর-বিরোধী মতসমূহ স্তূপাকারে সজ্জিত দেখিতেছেন। উহা তাঁহাদের মানসপটে সুচিত্রিত আলেখ্যের ন্যায় অঙ্কিত হইতেছে না। বস্তুতঃ ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে তাঁহাদের ন্যায় পাঠকও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছেন। এই সকল ত্রুটি দূরীভূত হইলে, আমাদের মধ্যে ইতিহাসের গৌরব রক্ষিত হইতে পারে। আমরা

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের নিকটে ইতিহাস শিখিতেছি। আমাদিগকে ইতিহাস-রচনার প্রণালীও তাঁহাদের নিকটে শিক্ষা করিতে হইবে। প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমক ঐতিগাসিকদিগের সহিত গিবন্ বা গ্রীন্ প্রভৃতি যদি আমাদের অভিনব ইতিহাস-লেখকগণের পদপ্রদর্শক হয়েন, তাহা হইলে অনেক সুফলের আশা করা যাইতে পারে।”—আমরা ইহার সকল কথা মানিয়া লইতে পারিলাম না। “ভাষা শৃঙ্খলা এবং বর্ণনা প্রভৃতিতে ইহাঁদের তাদৃশ নৈপুণ্য পরিদৃষ্ট হইতেছে না”—এ কথাগুলি মানিয়া লইতে হইলে ইহাঁদের প্রতি অবিচার করা হয়। “ইহাঁদের গ্রন্থে অতিরিক্ত স্বদেশপ্রেম এবং অত্যধিক অহংজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে”—ইহাও সত্য বলিয়া বোধ হয় না। কাহারও কাহারও লেখায় স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া অসম্ভব নহে, কারণ স্বদেশপ্রেমই প্রকৃত ইতিহাস-রচনার প্রবর্ত্তক। তাহা সত্যকে অতিক্রম করিলেই “অতিরিক্ত মাত্রায় বিকশিত হইয়াছে” বলা যাইতে পারে। কোন উদাহরণের উল্লেখ না করিয়া এরূপ মারাত্মক সমালোচনা করা সহজ, কিন্তু ইহাকে পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের ন্যায় প্রবীণ পণ্ডিতের লিখিত নিরপেক্ষ সমালোচনার উপযুক্ত নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কোন ইতিহাসলেখক অহংজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন কি না জানি না। কঠোর সমালোচনা ও অহংজ্ঞান এক কথা হইলে বলিতে হইবে, এই প্রবন্ধে গুপ্ত মহাশয়ও বুঝি তাহার যৎকিঞ্চিৎ পা চয় প্রদান করিয়াছেন! “ইঁহারা বৈদেশিক ইতিহাসলেখকদিগের মতামত উদ্ধৃ ত করিয়া” “গ্রন্থগুলি ভারাক্রান্ত” করিতেছেন কি না অথবা ওরূপ না করিলে ইঁহাদের গ্রন্থ আদৌ কেহ অধ্যায়ন করিত কি না তাহারও মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান প্রবন্ধের কোন্ ভাব কোন্ বর্ণনা কোন্ সিদ্ধান্ত কোন্ কোন্ পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার সারাংশ ‘উদ্ধৃত’ করিয়া দিলে গুপ্ত মহাশয়ের প্রবন্ধ ‘ভারাক্রান্ত’ হইত বটে কিন্তু তাহা অধিকতর মনোজ্ঞ হইত। যেরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে তাহাতে ইহার কতটুকু তাঁহার নিজের আর কতখানি পুরাতন তাহা বিশেষজ্ঞ পাঠক ভিন্ন অন্য কাহারও বুঝিবার উপায় নাই! প্রবন্ধরচনায় ইহাতে ততটা দোষ নাই, কিন্তু ইতিহাসে এরূপ প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত কি না সন্দেহের কথা। ইহাতে অবশ্যই বাহাদুরী আছে, কিন্তু সত্যঘোষণাই যাঁহার লক্ষ্য তিনি কোথায় কোন্ কথা পাইলেন তাহা না লিখিয়া নিজে বাহাদুরী লইবেন কেন? সমালোচক মহাশয় উপদেষ্টার বেদী অধিকার করিয়া অবলীলাক্রমে অনেক কথাই বলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সকল কথাই যথাযোগ্য হইয়াছে বলিয়া প্রশংসা করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম। শুনিয়াছি অনেকে ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাও শুনিয়াছি “Some to the fascination of a name surrender judgment hood-winked!”

সন্ন্যাসী।

আমি অপরাহ্নে হরিদ্বারে উপস্থিত হইলাম। ব্রহ্মকুণ্ডের উপরেই একটা দ্বিতল
ালিকার দ্বিতলস্থ একটি ক্ষুদ্র কামরা সন্ন্যাসী ভাড়া লইয়াছিলেন; তাঁহার
স হত সেই স্থানেই গেলাম। আমি নিজের সঙ্গে কিছুই লই নাই; গ্রীষ্মকাল,
বিছানাপত্রের বিশেষ দরকার ছিল না। বিশেষতঃ সন্ন্যাসীকে তৎপর দিন
দেরাহুনে জোর করিয়া লইয়া আসিব ইহাই আমার সঙ্কল্প ছিল। সন্ন্যাসীর
বাসগৃহে কোন দ্রব্যই দেখিলাম না; সেখানে যে কেহ বাস করে তাহার চিহ্ন-
মাত্রও নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম, সন্ন্যাসী দুই প্রহরে কোন এক
সদাব্রতে গিয়া উপস্থিত হন, সেখানে ফেরে ী, দাইল কি তরকারী পান তাহার
দ্বারা, গঙ্গার তীরে বসিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি বস্তুখে , কমণ্ডলুটি ছিল তাহাও হারাইয়া
গিয়াছে, করপুটে গঙ্গাজল পান করেন; স প গ পথে জঙ্গলে জঙ্গলে সারাদিন
ভ্রমণ করেন, সন্ধ্যার সময়ে ক্লান্তশরীরে আসিয়া এই গৃহটির মধ্যে হস্তপদ
বিস্তৃত করিয়া পড়িয়া থাকেন; কখনও হইয় হয়, কখনও হয় না। অমর যে
তিন দিন তাঁহার সঙ্গে ছিল সে তিন দিন মানুসার তিনি এমন করিয়া ভ্রমণ করিতে
পারিতেন না; তাহার জন্য সন্ন্যাসীর প্রবল উদ্দাম ভাব অনেকটা সংযত
হইয়াছিল। আমার মনে হইল ছেলেটিকে তাঁহার আত্মীয়গণ লইয়া গিয়া
ভাল করেন নাই; হয়ত ছেলেটির অসুবিধা দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসীর মনে
আবার গৃহের দিকে টান হইত।

যাহা হউক রাত্রে আমার কি আহার হইবে তাহারই চিন্তায় সন্ন্যাসী
কাতর হইলেন। আমি তাঁহাকে নিশ্চিন্ত হইতে বলিলাম, এবং তাঁহাকে
সেখানে রাখিয়া বাজার হইতে সামান্য কিছু খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনি-
লাম। অনেক জেদ করাতে তিনি সামান্য কিছু আহার করিলেন, আমিও
জলযোগ করিলাম। ‘জলযোগ’ কথাটা ভুল হইল; কারণ জলের সঙ্গে যোগ-
সাধন করিতে আমাদিগকে গঙ্গায় নামিতে হইয়াছিল। সন্ন্যাসী বলিলেন

"আমরা এই গঙ্গাতীরেই খানিক ক্ষণ উপবেশন করি।" আমি বুঝিলাম, এই কলনাদিনী জাহ্নবীর তীরে, সম্মুখে ও অভ্রভেদী হিমালয়, মস্তকোপরি চন্দ্র-নক্ষত্রখচিত নীলাকাশ, চারিদিকে প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্য,—এই সব দেখিয়া হয়ত তাঁহার মন কথঞ্চিৎ শান্ত থাকে, তাই তিনি এখানে বসিতে বলিলেন। আমরা কুশঘাটের উপরে গিয়া বসিলাম; কারণ ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে সর্ব্বদাই জনতা লাগিয়াই আছে।

ঘাটে গিয়া দুই জনেই বসিলাম বটে, কিন্তু কি বলিয়া কি কথা আরম্ভ করিব, তাহা কিন্তু আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। এমনই ভাবে ৫।৭ মিনিট কাটিয়া গেল; শেষে সন্ন্যাসীই আপনা হইতে বলিলেন "ভাই, তুমি আমার দুঃখকাহিনী শুনিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছ; তোমাকে আর কষ্ট দিব না। সব বলিতেছি। তোমাকে 'তুমি' বলিয়া ডাকিতেছি তাহাতে দুঃখিত হইও না, আমি যাহাকে ভালবাসি তাহাকে আপনি বলিয়া ডাকি না।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী কেমন অন্যমনস্ক হইয়া রহিলেন। আমি স্থির করিলাম, নিজে কোন প্রকার ঔৎসুক্য দেখাইব না, বা কোন প্রশ্নও করিব না; সন্ন্যাসী আপনা হইতে যাহা বলেন তাহাই শুনিব।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন "দেখ, তোমার নিকট দুইটি ব্যাপার গোপন করিব; একটি আমার পরিচয়, দ্বিতীয়টি আমার কলিকাতার বাড়ীর ঠিকানা। কেন, তাহা জান? আমি একটা সম্ভ্রান্ত পরিবারের কলঙ্কস্বরূপ; আমার পরিচয় দিলে তোমার মনে সে পরিবার সম্বন্ধে একটা ধারণা কেন জন্মাইব? সে পরিবারকে কলঙ্কিত করিবার অধিকার আমার নাই? কেমন? পরিচয় দেওয়া কি তুমি ভাল মনে কর?" আমি বলিলাম "না, তুমি তোমার পরিচয় আমাকে দিও না, আমি তাহা জানিবার জন্য ব্যস্তও নহি। তোমার দুঃখকাহিনী আমাকে বল, তোমার অন্তরের জ্বালা তাহা হইলে অনেকটা কমিয়া যাইবে।" "সেই বেশ কথা"—এই বলিয়া সন্ন্যাসী আবার অন্যমনস্ক হইলেন। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। "না এইবার আমি মনকে ঠিক করিয়াছি, তোমাকে সব বলিতেছি" বলিয়া সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমি দেখিলাম, হয়ত সন্ন্যাসী উন্মত্ত হইয়া উঠিবে; কাজেই আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম "না, তোমার কাহিনী আমার শুনিয়া দরকার নাই; চল

ঘরে ফিরিয়া যাই, রাত্রি হইতেছে।"—সন্ন্যাসী আমার মনের ভাব বুঝিল, অতি ধীরে বলিল "ভাই, বিরক্ত হইও না, আমি সব বলিতেছি। আজ পাঁচ বৎসর হইল কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থের একটি সুন্দরী কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়, তখন আমার মা বাঁচিয়া ছিলেন; আমাদের অবস্থা তখন বেশ ছিল, এখনও তেমনিই আছে; আমি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ি। যখন বিবাহ হয় তখন আমার স্ত্রীর বয়স পনর বৎসর, আমার বয়স তখন তেইশ বৎসর। যৌবন বয়স, কবিতাময় জীবন, উন্নত অবস্থা, সুন্দরী স্ত্রী; বল দেখি ভাই, আমার তখনকার অবস্থা কি? আমি তখন স্বপ্নরাজ্যে বেড়াইতাম; আমাকে তখন যদি কেহ স্বর্গে যাইবার জন্য অনুরোধ করিত, আমি তাহাতেও অসম্মত হইতাম, স্বর্গেও বুঝি এত সুখ মিলিত না। আমি বি, এ পাশ করিলাম। এম, এ পরীক্ষা দেওয়া হইল না। বাড়ীতেই বসিয়া থাকি, আর সৌন্দর্য্যের রাজ্যে ভ্রমণ করি। বিবাহের দেড় বৎসর পরে অমর জন্মগ্রহণ করে। আমাদের সুখ ষোল কলায় পূর্ণ হইল। কিন্তু কে জানিত যে এত সুখেও আমাদের দুঃখ আসিবে। তার পর কি হইল জান? আজ পাঁচ ছয় মাস পূর্ব্বে আমার স্ত্রীর অত্যন্ত জ্বর হয়, জীবনসংশয় হইয়াছিল, অনেক যত্নে, অনেক চেষ্টায় অনেক অর্থব্যয়ে জীবন রক্ষা হয়; কিন্তু তাঁহার শরীর এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে ডাক্তারেরা সকলেই বায়ুপরিবর্ত্তনের পরামর্শ দেন। আমি তদনুসারে সপরিবারে——যাই। স্থানটির নাম আর তোমাকে বলিলাম না। যেখানে গেলাম সে স্থানটি উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইলেও সেখানে অনেক বাঙ্গালী বাস করেন। যদিও সে সময়ে স্থান-পরিবর্ত্তন জন্যই আমার স্ত্রীর শরীর ক্রমে একটু একটু করিয়া সুস্থ হইতেছিল, তবুও একজন চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে তাহাকে রাখা আমি কর্ত্তব্য মনে করিলাম। সেই সহরে অনেক নামওয়ালা ডাক্তার ছিলেন বটে, কিন্তু আমার একজন বাঙ্গালী বন্ধু বলিলেন "এখানে একজন নেটিব ডাক্তার আছেন তিনি যদিও ক্যাম্বেল স্কুলের পাশ এবং তাহার বয়স যদিও কম, কিন্তু তাঁহার চিকিৎসা সম্বন্ধে বড়ই সুনাম এবং তিনি অতিশয় সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তি। বড় বড় ডাক্তারেরা আসিয়া পদধূলি প্রদান করিয়াই বড় বড় দর্শনী লইয়া চলিয়া যান, ছোট রকমের ডাক্তারগণ তাহা করেন না; বিশেষ কোন অবস্থাপন্ন

লোক যদি তাঁহাদিগকে কোন চিকিৎসার জন্য ডাকেন তাহা হইলে তাঁহারা বিশেষ যত্ন করিয়াই দেখেন।"

ডাক্তার বাবু আসিলেন; দিব্য গৌরবর্ণ পুরুষ, চক্ষে সোণার চসমা আছে, কথায় বার্ত্তায় অতি বিনয়ী, বয়স বোধ হয় ২৩।২৪ বৎসর হইবে। তাঁহাকে পাইয়া আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। আমার স্ত্রীর অবস্থার কথা বলিলাম এবং ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষাও করাইলাম। প্রথম দর্শনেই ডাক্তারের প্রতি আমার একটা অনুরাগ জন্মিয়াছিল; তাঁহাকে প্রত্যহ দুই বেলাই আমার বাসায় আসিতে অনুরোধ করিলাম; তিনিও সম্মত হইলেন। এই ভাবে ১০।১৫ দিন যায়; আমার স্ত্রীর শরীরও প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া আসিয়াছে, তবুও আর দুই এক মাস আমরা সেখানেই থাকিব স্থির করিলাম।

এই সময়ে একদিন আমি প্রাতঃভ্রমণ করিয়া বাসায় ফিরিতেছি; আমার বাসার অন্তর্গত একটা ছোটখাটো রকমের ফুলবাগান ছিল; সেটা অন্দরের দিকে, বাহিরের দিকেও। আমি যখন বাসার মধ্যে প্রবেশ করিব তখন দেখি ডাক্তার সেই বাগানের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন, এবং ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া আমার স্ত্রী তাঁহার সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া কি কথা বলিতেছে। এ দৃশ্য দেখিয়াই আমার মাথা ঘুরিয়া গেল; 'সন্দেহ' রাক্ষসী আমার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। আমি তাড়াতাড়ি যাইয়া বারান্দায় একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। তাহার একটু পরেই ডাক্তার আসিয়া আমার কাছে যথারীতি বসিলেন এবং আমার মুখ বিবর্ণ দেখিয়া কোন অসুখ হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। "শরীরটা তেমন ভাল নাই, তবে বিশেষ কিছু অসুখ হয় নাই" বলিয়া ডাক্তারের কথার জবাব দিলাম; ডাক্তার চলিয়া গেলেন। আমার মনের তখন যে প্রকার অবস্থা তাহা আর তোমাকে কি বলিয়া বুঝাইব ভাই? আমার মনে হইতে লাগিল, এই দণ্ডেই বজ্রপতনে আমার দেহের অবসান হইলে আমি বাঁচিয়া যাই!

আমি কোনদিন বেড়াইয়া আসিয়া এ অবস্থায় বসিয়া থাকি না; সে দিন আমাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া সকলেই চিন্তিত হইলেন। আমার অসুখ হইয়াছে বলিয়া আমি বিছানায় শয়ন করিলাম, এবং কেহ যেন আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত না জন্মায় তাহাও বলিয়া দিলাম। এ আদেশ যে

আমার স্ত্রীর উপরেও খাটিতে পারে তাহা তিনি কি করিয়া বুঝিবেন? আমার স্ত্রী আসিয়া আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত জন্মাইলেন; প্রতিদিন যেমন সহাস্যবদন আজও তাই, তাঁহার ভাবের কোন বৈলক্ষণও দেখিলাম না। আমি ভাবিতে লাগিলাম স্ত্রীলোকের কি ভয়ানক হৃদয়। তখন Shakespeare এর সেই কথা মনে হইল "Frailty thy name is woman." আমি অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করিলাম। অনেক ক্ষণ শয়ন করিয়া থাকিলাম; আমার স্ত্রী আমাকে বিশেষ অসুস্থ মনে করিয়া ডাক্তার ডাকিতে চাহিলেন, আমি নিষেধ করিলাম। সেই দিন অপরাহ্ণেই আদেশ প্রচার করিলাম, আগামী কল্য আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া যাইব। হঠাৎ আমাদের এই মত-পরিবর্ত্তনের সংবাদে সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন। আমার শরীর বড় ভাল নয়, এই কারণ দর্শাইয়া পর দিনই আমরা সকলে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

ভাই! ইহার পরে যে সব ঘটনা হইয়াছিল, তাহা তোমাকে অতি সংক্ষেপে বলিব; সে সব কথা ভাল করিয়া গোছাইয়া বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমরা প্রাতে হাবড়া ষ্টেসনে পৌছি। বাড়ীতে পৌছিয়া গোলমালেই দিন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পরে আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। আমার শুধু মনে হইতে লাগিল অসতী-সহবাস করিব। শেষে আমি পাগলের মত হইয়া পড়িলাম, আমার জ্ঞান লোপ হইল; অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া আমার স্ত্রীকে ডাকিয়া প্রকাশ্য ভাবে তাহাকে সমস্ত কথা বলিয়া দিলাম। অভিমানিনী দাঁড়াইয়া স্থিরভাবে আমার সমস্ত কথা শুনিল একটি জবাবও দিল না; শেষে ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া গেল। আমিও আর স্থির থাকিতে না পারিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। প্রায় এক ঘণ্টা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া যখন বাড়ীতে আসিয়া উপরে যাইতেছি, তখন একজন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল "সর্ব্বনাশ বৌমা যেন কি খাইয়াছেন"। এই সংবাদ শুনিয়া তাড়াতাড়ি আমি তাহার শয়নকক্ষে গেলাম; দেখি ঘরের মেজেয় পড়িয়া আমার স্ত্রী ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। আমাকে দেখিয়া একবার উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল, পারিল না; দাসীরা তাহার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিতেছে; ইঙ্গিতে আমাকে নিকটে ডাকিল, আমার পায়ের উপর মাথা

রাখিয়া শুধু একটি কথা বলিল "অপরাধ নাই"। তার পরেই নয়নতারকা স্থির হইল; সব শেষ হইয়া গেল। আমি স্থিরভাবে বসিয়া এই অন্তিম দৃশ্য দেখিলাম, অকস্মাৎ আমার দৃষ্টি তাহার বক্ষের দিকে পড়িল। বোধ হইল তাহার অঞ্চলে কি বাঁধা আছে, আর তাহাই সে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া আছে। অনেক কষ্টে হাত ছাড়াইয়া অঞ্চল খুলিয়া দেখিলাম একখানি পত্র। তাড়াতাড়ি পত্র খুলিয়া যাহা পড়িলাম, এ জীবনে তাহা ভুলিব না। ভাই, তোমাকে সংক্ষেপে বলি, সে ডাক্তার আমার শ্বশুরের অন্নে প্রতিপালিত, ডাক্তারী পাশ করিয়া ঐ সহরে Practice করিতেছে, প্রথমে আমাদিগকে জানিতে পারে নাই; আমার স্ত্রী তাহাকে চিনিতে পারে এবং যে দিন আমি তাহাদিগকে বাগানে কথা বলিতে দেখি, সেই দিনই প্রথম আমার স্ত্রী তাহাকে ডাকিয়া কথা বলে। আমরা যতদিন ওখানে ছিলাম, আমার স্ত্রীর মনে ডাক্তার সম্বন্ধে সন্দেহ হইত, কিন্তু সে কথা সে কাহাকেও বলে নাই। সেইদিন প্রাতঃকালে ঝির দ্বারা তাহার পরিচয় লয় এবং তাহার সন্দেহ ভঞ্জন হয়। সেই দিনই আমাকে সে কথা আমার স্ত্রী জানাইত; কিন্তু যখন বলিতে আসিতেছিল তৎপূর্ব্বেই আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছিল। আমি কি করিয়াছি, বুঝিতে পারিলে? এই দেখ আমি একজন স্ত্রীহন্তা; এই দেখ আমি এক নিরপরাধিনী অবলার প্রাণ সংহার করিয়াছি; এই দেখ—"বলিয়া সন্ন্যাসী লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক দশ হাত সরিয়া গেল। তাহাতে উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। আমি তাড়াতাড়ি যাইয়া তাহার হাত ধরিলাম, দেখি সংজ্ঞা নাই। অঞ্জলি পূরিয়া গঙ্গার জল আনিয়া মুখে চোখে দিতে লাগিলাম; অনেকক্ষণ পরে সন্ন্যাসীর চেতনা হইল। তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে, ধীরে ধীরে দুইজনে তাহার বাসগৃহে আসিলাম; নীরবে গৃহতলে দুইজনে শয়ন করিলাম; দুই জনেই গভীর চিন্তায় নিমগ্ন; অজ্ঞাতসারে নিদ্রা আসিয়া আমাকে অধিকার করিয়া ফেলিল। প্রাতঃকালের সূর্য্যালোক যখন ঘরে প্রবেশ করিয়াছে তখন আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখি সন্ন্যাসী সেখানে নাই, মনে করিলাম বাহিরে বেড়াইতে গিয়াছে। ক্রমে বেলা হইল, তখনও তাহার দেখা নাই। আমি বাহির হইলাম; চারিদিকে অনুসন্ধান করিলাম। হরিদ্বারের সমস্ত স্থানই আমি জানি, প্রায় সকল স্থানেই দেখিলাম; কোথাও তাহাকে পাইলাম না।

ক্লান্ত হইয়া সেই নির্জ্জন গৃহে ফিরিলাম। সেখানেও নাই। অপরাহ্ণে আবার খুঁজিতে বাহির হইলাম, নিরাশ হইলাম। দুইদিন হরিদ্বারে থাকিয়া চারিদিকে দেখিলাম, কোন উদ্দেশ পাইলাম না। শেষে নিরাশহৃদয়ে দেরাদুনে ফিরিয়া আসিলাম।

তাহার পর কলিকাতা মহানগরীতে কতবার তাহার অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু কে আমাকে সেই অজ্ঞাতকুলশীল কায়স্থ সন্তানের পরিচয় আনিয়া দিবে? আমি এই ঘটনা ব্যতীত আর কিছুই জানি না। তবুও পথ চলিতে কতদিন চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়াছি, যদি সে বাঁচিয়া থাকে, যদি সে আবার এই কলিকাতায় আসিয়া সংসারী হইয়া থাকে। আমার মনে হয় একদিন যেন তাহাকে কলিকাতায় দেখিয়াছিলাম; একদিবস কর্ণওয়ালীসষ্ট্রীট দিয়া একখানি সুন্দর ট্যান্‌ডমে চড়িয়া তাহারই মত চেহারার একজন লোককে দেখিয়াছিলাম বলিয়া মনে হয়। কিন্তু দেখিতে দেখিতে সে গাড়ী দ্রুত বেগে চলিয়া গেল। কলিকাতা সহরে সে গাড়ীর খোঁজ আর কেমন করিয়া পাইব? এখনও মনে হয় একদিন হয়ত তাহার সঙ্গে দেখা হইবে। একদিন হয়ত তাহার সঙ্গে যাইয়া তাহার প্রিয়তম পুত্র অমরনাথ কতবড় হইয়াছে দেখিব। ভগবান্ জানেন আমার এ আশা পূর্ণ হইবে কিনা?

শ্রীজলধর সেন।

বিশ্ব-রচনা।

হর্সেল ও তাহার উত্তরকালীন জ্যোতির্বিদগণের মত।

তারাজগতের রচনাপ্রণালীর তত্ত্ব অবগত হইবার অভিপ্রায়ে জ্যোতির্ব্বিদগণের মধ্যে হর্সেলই প্রথমতঃ কৃতসঙ্কল্প হইয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শৃঙ্খলাপূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। এই তত্ত্বলাভ আশায় হর্সেল যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাকে সামান্যতঃ পারিভাষিক-রূপে 'তারামান' কহে। তারামান কি? অত্যন্ত তেজস্বী দূরবীক্ষণ দ্বারা নভোমণ্ডলের কোন নির্দ্দিষ্ট

অংশে কত তারা আছে শুদ্ধ তাহারই গণনা করা। তিনি যে দূরবীক্ষণ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহার রন্ধ্র ২০ ইঞ্চ, বৃংহণশক্তি ১৬০ গুণ, এবং তাহার দৃষ্টিক্ষেত্রের ব্যাসমান ১৫ কলা অর্থাৎ চন্দ্রবিম্বের ব্যাসের অর্দ্ধ। তবেই আকাশে দৃশ্যমান চন্দ্রবিম্ব পরিমিত স্থানের সিকি রকম স্থানে যত গুলি তারা দূরবীক্ষণের ভিতর দেখা যাইত তত গুলিই এক এক সন্ধানে গণা হইত। দূরবীক্ষণের ভিতর দিয়া যে অন্তরিক্ষ ভেদ করিয়া নভোমণ্ডল দৃষ্ট হয় সে অন্তরিক্ষ সূচ্যাকার অর্থাৎ ফুল তুলিবার জন্য যে কলাপাতের ঠোঙ্গা করা যায় তেমনই। এখন যদি স্বীকার কর যে অন্তরিক্ষের সর্ব্বত্র তারাগণ সমভাবে বিন্যস্ত আছে তবে প্রতি বার দূরবীক্ষণের ক্ষেত্রগত তারাসংখ্যা দ্বারা দৃষ্টি কতদূর গেল তাহার একটা সাপেক্ষিক পরিমাণ ধরিতে পারা যায়। দর্শক যখন অন্তরিক্ষে লক্ষ্য বদ্ধ করিয়া দূরবীক্ষণ দিয়া দেখেন, তখন দূরত্ব যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাঁহার দৃষ্টিক্ষেত্র তত চারিদিকে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। যাঁহার জ্যামিতিতে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে, তিনি অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে ঐ সূচ্যাকার আকাশাংশের বিন্দু দূরবীক্ষণের অধিশ্রয়ণ, এবং উহার ভূমি সেই চক্রাকার ক্ষেত্রপরিমিত, যে ক্ষেত্র পর্য্যন্ত দূরবীক্ষণের দর্শনশক্তি যাইতে পারে। এই সূচির ঘনফল, উহার উচ্চ্রায় যতদূর গিয়াছে, সেই দূরত্বের ঘনের অনুপাতী। দূরবীক্ষণ যদি অন্তরিক্ষ ভেদ করিয়া দ্বিগুণ যায়, তবে দৃষ্টিসূচির দীর্ঘতা যে কেবল দ্বিগুণ হইবে তাহা নহে, উহার ভূমি প্রতি পার্শ্বে দ্বিগুণ হইবে, সুতরাং সূচির ঘনফল আটগুণ হইবে। তবেই পূর্ব্বস্বীকৃত যে 'আকাশের সর্ব্বত্র তারাগণ সমভাবে বিন্যস্ত' তদনুসারে, হর্সেলের মতে, তারাসংখ্যা আটগুণ বাড়িবে। অতএব যখন হর্সেল দেখিলেন যে, দূরবীক্ষণগত এক দৃষ্টিক্ষেত্রের তারাসংখ্যা অপর দৃষ্টিক্ষেত্রের তারাসংখ্যা অপেক্ষা আটগুণ, তখন তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে এ ক্ষেত্রের তারানিচয় দ্বিগুণ অন্তরে আছে।

হর্সেল বুঝিলেন যে, দূরবীক্ষণ দিয়া তারা দেখিয়া তারা গণা অসাধ্য, কারণ এরূপ করিয়া গণনা করিতে হইলে, লক্ষ লক্ষ বার দূরবীক্ষণ সন্ধান করিতে হইবে, এবং প্রতিবারে এক এক করিয়া তারাসংখ্যা করিতে হইবে। অতএব তিনি মন্দাকিনীর এড়োদিকে অর্দ্ধাধিক খগোল পরিমিত

একটিমাত্র নভোমেখলার পর্য্যবেক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি এই মেখলায় ৩,৪০০ দূরবীক্ষণক্ষেত্রে তারাগণের গণনা করিয়া দেখিলেন যে মন্দাকিনীর দূরবর্ত্তী প্রদেশ অপেক্ষা নিকটবর্ত্তী প্রদেশে তারাসংখ্যা অধিক।

নীচের ফর্দ্দ দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, মন্দাকিনীর দিকে যত যাইবে, তারাসংখ্যা ততই বাড়িবে; এবং সে বাড়ীর হার কত, তাহাও জানা যাইবে। মন্দাকিনী হইতে বৃত্তপাদমিত আকাশকে ১৫°,১৫° করিয়া ৬ অংশে ভাগ করিয়া, ইহার এক এক অংশে হারাহারী কত তারা আছে তাহার সংখ্যা ধরা হইয়াছে।

১ম	মেখলা	মন্দাকিনী	হইতে	৯০°	অবধি	৭৫°	পর্য্যন্ত	ক্ষেত্রপ্রতি	তারাসংখ্যা ৪
২য়	,,	,,	,,	৭৫°	,,	৬০°	,,	,,	,, ৫
৩য়	,,	,,	,,	৬০°	,,	৪৫°	,,	,,	,, ৮
৪র্থ	,,	,,	,,	৪৫°	,,	৩০°	,,	,,	,, ১৪
৫ম	,,	,,	,,	৩০°	,,	১৫°	,,	,,	,, ২৪
৬ষ্ঠ	,,	,,	,,	১৫°	,,	০°	,,	,,	,, ৫৩

মন্দাকিনীর অপর অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে, সেই শক্তিসম্পন্ন সেই দূরবীক্ষণ দিয়া, সদৃশরূপে সদৃশ প্রদেশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্যার্ জন্ হর্সেল যে ফল লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এই,—

১ম	মেখলায়	ক্ষেত্র-প্রতি	৬	তারা
২য়	,,	,,	৭	,,
৩য়	,,	,,	৯	,,
৪র্থ	,,	,,	১৩	,,
৫ম	,,	,,	২৬	,,
৬ষ্ঠ	,,	,,	৫৯	,,

নীহারিকা-বিন্যাসের বর্ণনাস্থলে, যে পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছিল, সেই পদ্ধতি অনুসারে ব্যাখ্যা করিলে, উক্ত সংখ্যা সকলের ভাবার্থ সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। মনে করুন, আপনি নির্ম্মল নিরভ্র নভস্তলে দণ্ডায়মান, আর মন্দাকিনী ক্ষিতিজ বেষ্টন করিয়া আছে। এরূপ অবস্থায় পূর্ব্বে নভোপ্রদেশের যে যে অংশের নাম মেখলা দেওয়া হইয়াছে, তাহার

প্রথম মেখলা হইল সেই বৃত্ত,—যে বৃত্তের কেন্দ্র আপনার খস্বস্তিক, এবং ব্যাস খস্বস্তিক হইতে ক্ষিতিজ পর্য্যন্ত আকাশের ষষ্ঠাংশ। এই বৃত্তের নীচে চারিদিকে আকাশের তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে মেখলা সেই হইল দ্বিতীয় মেখলা। এই রূপে এক এক মেখলা পার হইয়া অবশেষে মন্দাকিনীতে উপনীত হইতে হয়। মন্দাকিনী ক্ষিতিজের উপর ১৫° পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তারাসংখ্যার নির্ঘণ্ট দেখিয়া বুঝা যাইতেছে যে, উক্তরূপে অবস্থিত হইয়া দর্শন করিলে, মাথার উপর অতি অল্প তারা দেখা যায়, এবং মন্দাকিনীর দিকে যতই অগ্রসর হইবে, তারাসংখ্যা ততই বাড়িতে থাকিবে। দর্শকের অবস্থান পূর্ব্ববৎ থাকিলে, দ্বিতীয় টেবেলে তারাসংখ্যার অর্থ কি হয় তাহা দেখুন। দ্বিতীয় তালিকার তারা সকল বিপরীত বা অদৃশ্য গোলার্দ্ধের তারা। পৃথিবী যদি স্থানান্তরিত করা যায় তবে এ সকল তারাও দর্শকের নয়নগোচর হইতে পারে। এ গোলার্দ্ধের প্রথম মেখলা, অর্থাৎ যে মেখলার তারাসংখ্যা অত্যন্ত অল্প, তাহা দর্শকের খস্বস্তিকের বিপরীত দিকে, অর্থাৎ এ মেখলা তাহার পায়ের ঠিক নীচের দিকে। অন্যান্য মেখলা অনুক্রমশঃ ক্ষিতিজের সন্নিকৃষ্ট, এবং ষষ্ঠ বা শেষ মেখলা ক্ষিতিজ বেড়া ১৫° চওড়া দেখাইবে।

যে সকল তারাসংখ্যা দেওয়া গেল, সে সকল হারাহারী মাত্র; এতদ্দ্বারা নভোমণ্ডলের প্রদেশবিশেষে তারা-বিন্যাসের বাস্তব বিষমতার যথাযথ ভাব হৃদয়ঙ্গম হয় না। কখন দেখা গেল যে যন্ত্রক্ষেত্রে একমাত্র তারারও আবির্ভাব নাই, আবার কখন বা ক্ষেত্রমধ্যে শত শত তারা ভাসমান হইল। হারহারী হিসাবে প্রথম মেখলার তারা অপেক্ষা স্বয়ং মন্দাকিনী-বৃত্তের তারা দ্বিগুণ অপেক্ষাও নিবিড়তর। মন্দাকিনীবৃত্ত বলিলে কেবল সেই বৃত্তটি বুঝাইবে না; ঐ বৃত্তে উহার উভয় পার্শ্বে ১৫° পরিমিত আকাশ ধরিতে হইবে।

হর্সেল স্বীয় প্রাথমিক গবেষণার ফল সন্দর্শন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, যদি 'তারাসকল অন্তরিক্ষে সর্ব্বত্র সমভাবে বিন্যস্ত আছে' এ কল্পিত মত স্বীকার করা যায় তাহা হইলে সাধারণ্যতঃ কাণ্টের মত গ্রহণের সবিশেষ আপত্তি থাকে না। মন্দাকিনীপ্রদেশের তারাসংখ্যা

তদীয় তীর্য্যক্ আকাশের তারাসংখ্যার পাঁচগুণ। পরন্তু হর্সেল ও কাণ্টের মতে যে কিঞ্চিৎ বিষমতা দেখা যায় তাহার মধ্যে এইটি উল্লেখিতব্য। হর্সেল অনুমান করেন যে, তারাজগতের কিনারা হইতে মাঝারের আধা-আধি পর্য্যন্ত এড়োভাবে একটা প্রকাণ্ড ফাইট আছে। উত্তর উপরাশি মরালক সমীপে অর্থাৎ যে স্থানে মন্দাকিনী দ্বিধারা হইয়াছেন, এই ফাইট সেই খানে আরম্ভ হইয়া গরুত্মান্, অহি ও বৃশ্চিক দিয়া দক্ষিণ খগোলের অনেকদূর পর্য্যন্ত গিয়াছে। তারাগণের বিন্যাস ও তাহাদের ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য দেখিয়া হর্সেলের মনে তারাগণের দূরত্বের একটা আনুমানিক পরিমাণের ভাব জন্মিয়াছিল। এই অনুমিত দূরত্ব সহায়ে তিনি তারাস্তরের ঊর্দ্ধাধঃ বেধকে ১৫৫ এবং উহার ব্যাসকে ৮৫০ ধরিয়াছিলেন। এই ১৫৫ এবং ৮৫০, ইহাদের সংজ্ঞা মাইল বা ভূব্যাস, বা পৃথ্বী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব নহে; উক্ত রাশিদ্বয়ের একক, প্রথম শ্রেণীর তারাগণের মধ্যম দূরত্ব পরিমিত। জ্যোতির্বিদগণ প্রথম শ্রেণীর তারাগণের যে হারাহারী লম্বন ধরেন, তদনুসারে উক্ত শ্রেণীর তারাগণের হারাহারী দূরত্ব এতই ধরা যাইতে পারে যে তাহা আলোকের পক্ষে ১৬ বৎসরের পথ। এ হিসাবে তারাজগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত যাইতে আলোকের ৮৫০ × ১৬ = ১৩৬০০; স্থূলতঃ ১৪হাজার বৎসর লাগে, এবং আমোদের এই পৃথিবীতে আসিতে ৭০০০ বৎসর অতিবাহিত হয়।

হর্সেলের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তিমূল এই যে, তারাজগতের সর্ব্বত্র তারাগণ সমসান্দ্র, অর্থাৎ তারাগণের প্রদেশবিশেষে নিবিড়তা বা বিরলতা স্বীকার করার প্রয়োজন নাই। তাহা হইলেই, বুঝিতে হইল যে নভোমণ্ডলের যে কোন দিকে দূরবীক্ষণ চালাও না কেন, দূরবীক্ষণের ভিতরে যত তারা পাইবে সেই তারাসংখ্যা সেই দিকের তারাজগতের আয়তি-সূচক। পরন্তু অনেক আলোচনা ও অনুশীলনের পর হর্সেল স্থির করিয়াছিলেন যে বিশেষরূপে রূপান্তরিত না করিলে, তাঁহার এ মত গ্রহণ করা যাইতে পারিবে না। যুগল তারা, অন্যান্য দ্বিতয় তারা, এবং তারাস্তূপ দেখিয়া বিশ্বাস হয় না যে, যুগলের দুইটির, দ্বিতয় দুইটি, এবং স্তূপের কোন দুইটির ব্যবধান অন্যান্য তারাদ্বয়ের ব্যবধানের সমান। কি কারণে

মত পরিবর্ত্তন বিধেয় বিবেচনা হইয়াছিল. তাহা ঠিক দেখাইতে হইলে উল্লেখ করিতে হইবে যে, যদি মন্দাকিনীর দিকে তারাগণের নিবিড়তার বৃদ্ধি সর্ব্বত্র সম্পূর্ণরূপে সমভাবাপন্ন হইত, অর্থাৎ যদি মন্দাকিনীসংলগ্ন প্রদেশদ্বয়ে তারাগণ এরূপ ব্যবস্থিত হইত যে তাহাদের বেধের পরিমাণ সম্বন্ধে সবিশেষ ভেদ দৃষ্ট না হইত, তাহা হইলে পূর্ব্ব মতপরিবর্ত্তনের প্রয়োজন না হইতে পারিত। পরন্তু মন্দাকিনীর অন্তর্গত তারাপুঞ্জের বেধে মধ্যে মধ্যে বিলক্ষণ বিষমতা দৃষ্ট হয়। তবেই হর্সেলের আদ্য মত বজায় রাখিয়া উক্ত বিষমতার ব্যাখ্যা করিতে হইলে, বিষম প্রমাদে পতিত হইতে হয়। দেখুন যদি কৃত্তিকার প্রতি দূরবীক্ষণ সন্ধান করা যায়, তবে পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ অপেক্ষা কৃত্তিকা নক্ষত্রে সাত আট গুণ অধিক তারা নেত্রগোচর হয়। এখন যদি তারাস্তরের বাস্তব বেধ সমান ধরেন, তবে ফল দাঁড়াইবে এই যে, কৃত্তিকার পার্শ্ববর্ত্তী আকাশ অপেক্ষা কৃত্তিকার দিকের আকাশে তারাগণ দ্বিগুণ দূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত আছে, অর্থাৎ আমাদের দিক হইতে কৃত্তিকার দিকে এক দীর্ঘ অথচ অস্থূল তারাস্তম্ভ আছে। আকাশের অনেক স্থলে এইরূপ তারাস্তূপ আছে, অতএব বলিতে হইবে যে তারাজগতে বহুসংখ্যক তারাস্তম্ভ আছে। আবার অন্তরিক্ষের অন্যান্য প্রদেশে বিশেষতঃ মন্দাকিনীর চারিদিকে অনেক স্থান প্রায় তারাশূন্য দেখা যায়। তারাবিন্যাসের এবম্ভূত বিষমতা দেখিয়া, কারণস্থলে অনুমান করিতে হইবে যে, তারাজগতে বিস্তর দীর্ঘ অথচ অবিস্তীর্ণ বিবর আছে। সে বিবরগুলি আমাদের রবির দিকে চলিয়াছে। সুতরাং তারাজগতকে বহুসংখ্যক রন্ধ্রবিশিষ্ট একটা প্রকাণ্ড তারা-মৎস্যবৎ মনে করিতে হয়। কিন্তু তারাজগতের আকার এরূপ একটা মাছের মত মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত, কারণ তাহা হইলে বিবর সকল শাখাস্বরূপ সূর্য্যের দিক হইতে বাহির হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

যখন দূরবীক্ষণের ভিতর বহুসংখ্যক তারা দেখা যায়, এবং চারি পাশের আকাশ তারাশূন্য বোধ হয়, তখন সেই তারানিচয়কে বাস্তব তারাস্তূপ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে অর্থাৎ অন্যান্য স্থান অপেক্ষা সেই স্থানের তারাগণ নিবিড়তর। এই ভিন্ন অন্য কোন ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। শুধু

চক্ষেই দেখিতে পাইবেন যে, মন্দাকিনী একটি নিরবচ্ছিন্ন সমভাবাপন্ন মেখলা নহে। মন্দাকিনী-প্রবাহের প্রভূত স্থল অপেক্ষাকৃত শ্যামাকাশে বিচ্ছিন্ন কদাকার অভ্রস্তূপ-বৎ প্রতিভাত হয়। অতএব অভ্রস্তূপময় স্থল যে প্রকৃত পক্ষে তারাসংঘাত এবং উহা যে কেবল দৃক্‌সূত্রগত তারাজগতের আয়তিব্যঞ্জক নহে, এ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য। হর্সেল এ বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন কি না সে পক্ষে জ্যোতির্বিগণের সংশয় আছে। যাহা হউক তিনি তারাজগতের সাপেক্ষিক দূরত্ব অবধারণের জন্য উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়াছিলেন। সে উপায় এই।—দূরবীক্ষণের ক্ষেত্রগত তারাসংখ্যা দ্বারা তারাগণের দূরত্বের অনুমান না করিয়া তাহাদের উজ্জ্বলতার দ্বারা তাহাদের দূরত্বের অনুমান করা। তারাগণ যদি সকলই বস্তুতঃ সমোজ্জ্বল হয় তবে তাহাদের ঔজ্জ্বল্যের যে ভেদ আমাদের নয়নগোচর হয় তাহা কেবল তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বনিবন্ধন বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, এবং এতদ্দ্বারা প্রত্যেক তারার দূরত্ব অবধারণ করিতে সক্ষম হই। কিন্তু সকল তারা যে সমান উজ্জ্বল নহে তাহা কাহার অবিদিত নাই। অতএব এ উপায় দ্বারা তারাবিশেষের দূরত্বনিরূপণ করা যে অসম্ভব, তাহা হর্সেল স্বয়ংই বুঝিয়াছিলেন। পরন্তু তাহা বলিয়া যে এ উপায় দ্বারা সমশ্রেণীভুক্ত তারাগণের অথবা পুঞ্জবিশেষের দূরত্বের যে কোন ভাব পাওয়া যায় না এমত বলা হইতে পারে না। যদিও পঞ্চম শ্রেণীভুক্ত তারাবিশেষ চতুর্থ শ্রেণীর তারাবিশেষ অপেক্ষা আমাদের সন্নিকৃষ্ট হইতে পারে, তথাপি সমস্ত পঞ্চম শ্রেণীর তারাগণের যে হারাহারী দূরত্ব চতুর্থ শ্রেণীর তারাগণের হারাহারী দূরত্ব অপেক্ষা অধিক, তাহার সন্দেহ নাই। এই হারাহারী সাপেক্ষিক দূরত্ব যে কিয়ৎ পরিমাণে সংখ্যায়ত্ব তাহারও সন্দেহ নাই।

শ্রীমাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের ইংরাজি।

অবিশ্রয়ণ,	Focus.	অহি,	Serpent.
উচ্ছ্রায়,	Height.	উপরাশি,	Constellation.
একক,	Unit.	এড়ো,	Perpendicular.
কাণ্ট,	Kant.	কৃত্তিকা,	Pleiades.
ক্ষিতিজ,	Horizon.	খস্বস্তিক,	Zenith.
গরুত্মান্,	Aquila.	ঘনফল,	Cubic content.

তারাজগৎ,	Stellar Universe	তারামৎস্য,	Star-fish.
তারামান,	Star-gauging.	তীর্য্যক্,	Perpendicular.
দৃষ্টিক্ষেত্র,	Feild of view.	[illegible]	Double.
নীহারিকা,	Nebula.	পদ্ধতি,	Method.
ফাইট,	Chasm, opening.	মন্দাকিনী,	Galaxy, Milky way.
মেখলা,	Belt.	যুগল,	Binary.
রন্ধ্র,	Opening.	লম্বন,	Parallax.
বাড়ী,	Increase.	বিবর,	Opening.
বৃত্তপাদ,	One fourth of a Circle.	বৃংহণ শক্তি	Magnifying power.
বেধ,	Thickness.	সান্দ্র,	Dense.
সূচ্যাকার,	Conical.	স্তূপ,	Cluster.
হার,	Rate.	হর্সেল,	Herschel.
অনুপাতী,	Proportional.	চক্রাকার,	Circular.
উজ্জ্বলতা,	Magnitude (brightness)	বৃশ্চিক,	Scorpius.
সন্ধান,	Application.		

গতজন্ম।

আজি জ্যোৎস্নালোকে হেন মুক্ত সমীরণে
সুপ্তিহীন স্বপ্নলীন নীরবে বসিয়া
কোন্ গতজন্মস্মৃতি উঠিছে জাগিয়া ?
ওই তারকার পাশে মেঘ-বাতায়নে
হাসে আজি কা'র মুখ ? কেন দু'নয়নে
উচ্ছ্বসিত অশ্রুনীর আসিছে ভরিয়া ?
বিরহ-ব্যথিতে, হায়, কে দিবে বলিয়া
কা'র প্রীতিরাশি তা'র পড়িছে স্মরণে ?
কোথা কোন্ জন্মে মোরে কা'রা রেখেছিল
সোহাগের শত ডোরে বাঁধি ? স্নেহময়ী
কোন্ সে জননী আপনার প্রাণরসে
পুষেছিল এ পরাণ ? কেবা দিয়েছিল
গলে সে মালিকাখানি, যত্নে অবচয়ি
জীবন-কুসুমরাশি যৌবন-লালসে ?

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

বর্ষা।

মনুষ্যহৃদয়ের উপর বহির্জগতের অসীম আধিপত্য। জড় প্রকৃতি ভাবরাজ্যের সর্ব্বপ্রধান নিয়ামক বলিলেও বেশী বলা হয় না। তাই দেখিতে পাই প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আমাদের মনেরও অজ্ঞাতসারে এমন একটা অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায় যে আমরা সহসা তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া উঠিতে পারি না। যখন জগৎ দিগন্তপ্লাবী জ্যোৎস্নাস্রোতে ভাসিয়া শুক্লবসনা সুন্দরীর ন্যায় হাসিতে থাকে, হৃদয়ও তখন অনন্তের অন্তরশায়িনী পূর্ণিমা সুন্দরীর পূর্ণ সৌন্দর্য্যস্রোতে ভাসিয়া যায় ; মনে হয়, এ নিশিতে শুধু হাসিতে হয়, এ নিশি বুঝি শুধু মিলনের জন্য ; মনে হয় বুঝি শোকতাপ দুঃখ দারিদ্র্য এ জগত হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে ; আছে শুধু হাসি আর গান, প্রেম আর মিলন। নিশান্তের শুক তারার সঙ্গে বিহঙ্গকাকলী নিদ্রালস প্রকৃতিকে যখন মুখর করিয়া তুলে, মনুষ্যহৃদয়ও প্রকৃতির এই ললিত বীণাঝঙ্কারে আপনা হইতেই অঙ্গুলিতাড়িত তন্ত্রীর মত চঞ্চল হইয়া উঠে। তখন জগতে যেন শুধু অরুণোদয়ের আশা, শুধু আনন্দ, শুধু কোলাহল। তখনকার সেই বাঙ্ময়ী প্রকৃতি আমাদিগকেও বাঙ্ময় করিয়া তুলে। যুথিকা বালার শুভ্র সরল হাসির সহিত আমরাও প্রাণ খুলিয়া হাসি। স্বভাবচঞ্চল প্রভাতবায়ুর সহিত তাহার উদ্ভ্রান্ত নৃত্যে মনুষ্যহৃদয়ও চঞ্চল হইয়া উঠে। তখন Wordsworth এর মত—

My heart with pleasure fills
And dances with the daffodils.

আবার যখন মধ্যাহ্ন “রৌদ্রময়ী রাতির” মত প্রকৃতিকে তাহার “নিস্তব্ধ নিঝুম” সৌন্দর্য্যের মোহময় আবরণে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়, তখন মনুষ্যহৃদয়ও পল্লীবালকের মত তাহার মধ্যে আপনার অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে। যখন দিনের আলো পড়িয়া আসে, সন্ধ্যার তরল ছায়া যখন চূর্ণ কুন্তলের মত ধরণীর সর্ব্বাঙ্গ দৃঢ়বেষ্টিত করিয়া তাহার প্রশস্ত নীল ললাটে তারার টিপ পরাইয়া দেয়, তখন মনুষ্যহৃদয়ও কবির সহিত বলিয়া উঠে—

Thine is the breathing blushing hour,
When all unheavenly passions fly,
Chased by the soul-subduing power
Of Love's delicious witchery.

সন্ধ্যার সহিত যেন এ জগতের কোন অব্যক্ত বিরহবেদনার কাহিনী জড়িত আছে। গোধূলির সেই রহস্যময় আলোক, মনুষ্যহৃদয়ের বিগত সুখস্মৃতির মত অস্তাবলম্বী সূর্য্যের হেমাভ কিরণমণ্ডিত অসম্বদ্ধ মেঘশ্রেণী, নীড়গমনোন্মুখ বিহঙ্গের মধুর কলতান, দূরশ্রুত নির্ঝর-পতনশব্দের মত বৃক্ষরাজির আকুল মর্ম্মরধ্বনি, সর্ব্বোপরি নদীসীকরসম্পৃক্ত সান্ধ্য সমীরণের সেই মোহময় সঞ্চালনশব্দ—সকলে মিলিয়া মানবহৃদয়ে একটা চাঞ্চল্য, একটা অনির্দ্দিষ্ট ব্যাকুলতা সৃজন করিয়া দেয়। বুঝি,

নিঃসঙ্গিনী ধরণীর
বিশাল অন্তর হতে উঠে সুগম্ভীর
একটি ব্যথিত প্রশ্ন ক্লিষ্ট ক্লান্ত সুর
শূন্য পানে—আরো কোথা—আরো কতদূর।

শোকের প্রথম বেগ শমিত হইলে তাহার স্থলে যেমন একটা গাঢ় বেদনা থাকিয়া যায়, সন্ধ্যার উদ্দাম মিলনব্যাকুলতার পরও তেমনি অন্ধকারময়ী রজনীর একটা অন্তর্গূঢ় ঘনবেদনা অনুভূত হয়। তিমিরাবগুণ্ঠিতা রজনীর গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে একটা অমানুষিক গাম্ভীর্য্য, একটা অচঞ্চল চিন্তাশীলতা আমাদের মনকে অধিকার করে।

এমনি, ঋতুর-পরিবর্ত্তনেও মনুষ্যহৃদয়ে প্রকৃতিহৃদয়ের মত পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। যখন,

শরদ পূর্ণিমা, নিরমল রাতি
উজোর সকল বন;

তখনকার মনের অবস্থার সহিত "পৌষ প্রখর, শীতে জর্জ্জর, ঝিল্লিমুখর রাতি"তে মানসিক পরিবর্ত্তনের তুলনা করিলে আমরা পার্থক্য বিশেষ রূপে বুঝিতে পারি। মেঘনির্ম্মুক্ত আকাশ, সুচারু পঙ্কজশোভিত স্বচ্ছনীর বাপীসমূহের অগাধ সৌন্দর্য্য, ঈষৎকম্পিত পরিস্ফুতগুচ্ছ শস্যশ্রেণীর তরঙ্গিত শ্যামল

সমুদ্রশোভা—সকলে মিলিয়া মনুষ্যহৃদয়ে সেই নিরুপমা শরৎসুন্দরীর জয়-ঘোষণা করে; হৃদয়ে নূতন আশা নূতন উৎসাহ সঞ্চারিত হয়, তাই পুরাকালে নৃপতিবৃন্দ এই সময়ে দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন; আর যখন,

পৌখনি রজনী পবন বহু মন্দ
চৌদিকে হিমকর হিমকরু বন্দ।

তখন মনুষ্যের মনেও সময়োপযোগী নির্জ্জীবতা আসিয়া পড়ে।

আবার যখন বসন্তাভরণা প্রকৃতি রাজরাজেশ্বরী বেশে পুষ্পসিংহাসনে সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তিমতী হইয়া বসেন, তখন জীবমাত্রেই আপন আপন প্রিয়তমের কাছে সে অনুপম সৌন্দর্য্যের উপমা খুঁজিতে যায়। তাই শত কবিকণ্ঠে সেই জগৎমোহিনী দেবতার জয়শব্দ উচ্চরিত হইয়া দিগন্ত ধ্বনিত হইয়া উঠে।

কিন্তু বর্ষার যেমন একটা প্রগাঢ় বেদনা, একটা বিশ্বব্যাপী উদাসভাব, দুঃখের ভিতর যেমন একটা গাম্ভীর্য্য অনুভূত হয়, এমন আর কোন ঋতুতে নহে। সেই যখন মেঘৈর্মেদুরমম্বরং, আর

রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন
রিমি রিমি শবদে বরিষে;

জগতে যখন শুধু,

মেঘ দুরু দুরু দাদুরির বোল
ঝিমা ঝিঝি নিকি বোলে;

যখন আর্দ্রবায়ুবিষণ্ণ প্রকৃতির দীর্ঘনিশ্বাসের মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া বহিতে থাকে তখন মানুষও বিরহিণী রাধার মত বলিয়া উঠে,—

"এ সখি হামারি দুঃখের নাহি ওর
এ ভরা বাদর এ মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি, ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥"

তখন সত্যই শূন্যমন্দির বিরহীর হৃদয়ে দুঃখের অন্ত নাই। আজ এমন সময় প্রিয়তমকে কাছে কাছে রাখিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার দীর্ঘ নিশ্বাসে আপনার দীর্ঘ নিশ্বাস মিশাইবে—না আজ সে কোথায়! আজ কোথায় প্রিয়তমের সহিত ভুজে ভুজে নিবিড় বন্ধন,—না নির্ম্মম অদৃষ্ট তাড়নায় সে কোথায়,—কত দূরে, হয় ত কোন সুদূর প্রবাসে। কত অকথিত কথা—যাহা বলি বলি করিয়া শত চেষ্টাতেও বলা হয় নাই, মনে হয় তাহা বুঝি

এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘন ঘোর বরিষায়
এমন মেঘস্বরে, বাদল ঝর ঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়!

কোথায় সে আজ? হয়ত প্রবাসে এমন করিয়া সেও ওই জলভরা মেঘের দিকে চাহিয়া আছে, হয় ত এমনি করিয়া এই 'মেঘলা হাওয়া' তাহারও বুকের ভিতর দিয়া হুহু করিয়া বহিতেছে। জড় প্রকৃতি—সে কেমন করিয়া জানিবে যে তাহার এই অপূর্ব্ব বিরহ বেশে মনুষ্যহৃদয়ও চঞ্চল হইয়া উঠিবে।

কেতকী কদম্ব ফোটে, বনে কেকারব ছোটে
ভরা ভাদরের ব্যথা তারা কি জানে!

এ ভরা ভাদরে না জানি সে কি করিতেছে,

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষ প্রণয়িনি জনে কিংপুনর্দূরসংস্থে॥

প্রিয়কণ্ঠলগ্ন আলিঙ্গনবদ্ধ সুখীজনের হৃদয়ও এই স্নিগ্ধ বর্ষাসমাগমে চঞ্চল হইয়া উঠে। প্রবাসাভিশাপক্লিষ্ট প্রিয়াসঙ্গভিখারী বিরহিহৃদয়ে না জানি কত ব্যথা। বর্ষার এ বিরহবেদনা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না, ইহা মানবহৃদয়ে স্বতঃই অনুভূত হয়। জগতের আদিম অবস্থা হইতে একাল পর্য্যন্ত সমস্ত মানবের মনে এ বেদনা সুপ্ত অবস্থায় আছে, বর্ষার ধারাপাতের সঙ্গে সঙ্গে কেন যে তাহা সজীবিত হইয়া উঠে এবং আমাদের এই প্রাণহীন কর্ম্মক্লান্ত নিরুদ্দেশ্য জীবনের মাঝখানে শত যোজনস্থিত কোন প্রিয়জনের মধুর স্মৃতি কেন যে জাগিয়া উঠে, এ রহস্য চিরকাল অজ্ঞাত থাকিবে।

এবড় রহস্য যে,

সতোয়নম্রাম্বুদ চুম্বিনোপলাঃ
সমাচিতা প্রস্রবণৈঃ সমন্ততঃ।
প্রবৃত্তনৃত্যৈঃ শিখিভিঃ সমাকুলৈঃ
সমুৎসুকত্বং জনয়ন্তি ভূধরাঃ॥

যখন জলভারাবনত মেঘদল শৈলশ্রেণী ঘিরিয়া ফেলে, বর্ষার জলধারা-পতনে যখন নির্ঝরশ্রেণী শত মুখে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, মত্ত শিখী নব বর্ষাসমাগমে যখন কেকারব করিয়া হর্ষে নাচিয়া উঠে, তখন কেন প্রকৃতির এ নববেশ মানুষের মনে ঔৎসুক্য জন্মাইয়া দেয়; কে জানে কেন? যখন,

বৃষ্টিঘেরা চারি ধার, ঘন শ্যাম অন্ধকার,
ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দ আর, ঝর ঝর পাতা,

তখন,

থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণে, গুরু গুরু গরজনে
মেঘদূত পড়ে মনে, আষাঢ়ের কথা।
মনে পড়ে বরিষার, বৃন্দাবন অভিসার
একাকিনী রাধিকার চকিত চরণ॥
শ্যামল তমালতল, নীল যমুনার জল
আর দুটি ছল ছল নলিন নয়ন।
এ ভরা বাদর দিনে, কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে
কাননের পথ চিনে মন যেতে চায়।
বিজন যমুনাকূলে, বিকশিত নীপমূলে
কাঁদিয়া পরাণ বুলে বিরহ ব্যথায়॥

বর্ষার এই অতলস্পর্শী গম্ভীর বেদনার অভিজ্ঞতা সকল দেশে সকল সময়ে একই। যেমন পর্ব্বতহৃদয়ের অশ্রুজল নির্ঝরমুখে বাহির হয়, তেমনি বিশ্ব-হৃদয়ের সঞ্চিত শত করুণ কাহিনী কবিমুখে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তাই প্রকৃতির এই মেঘাচ্ছন্ন বিষণ্ণ আননের দিকে চাহিয়া শত শত কবি মল্লার রাগে জগতের বিষাদকাহিনী গাহিয়াছেন, আর বুঝি তাহারই উত্তরে এই মল্লার রাগিণীতে মেঘ ঝুরিয়া ঝুরিয়া কাঁদিত। বিশ্বহৃদয়চঞ্চলকারী প্রাবৃটের প্রথম মেঘসমাগম হইতেই জগতের সর্ব্ব প্রধান বিরহ-কাব্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

এবং শাপক্লিষ্ট এক যক্ষের বিরহকথা অবলম্বন করিয়া ইহার,

——————মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপনার অন্ধকার স্তরে,
সঘন সঙ্গীত মাঝে পুঞ্জীভূত করে॥

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার।

——(:০:)——

রাজা রামানন্দ রায়।

——(:০:)——

রামানন্দ রায় স্বপ্রণীত জগন্নাথ বল্লভ নাটকে আপনাকে "সর্ব্ববিদ্যানদী-বিলাসগাম্ভীর্য্যমর্য্যাদাস্থৈর্য্যপ্রসাদাদি গুণরত্নাকর" ও "সুরগুরুপ্রণীত নীতিকদম্বকরচিত মন্ত্রাশ্রবীকৃতপ্রগুণপৃথ্বীশ্বর" ভবানন্দ রায়ের তনুজ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজও তাহারই প্রতিধ্বনি করতঃ ভবানন্দ রায়ের আরও চারিটি তনুজের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা;—

"হেন কালে আইলা তথা ভবানন্দ রায়।
চারিপুত্র সঙ্গে পড়ে মহাপ্রভুর পায়॥
সার্ব্বভৌম কহে এই রায় ভবানন্দ।
ইঁহার প্রথম পুত্র রায় রামানন্দ॥
তবে মহাপ্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
স্তুতি করি কহে রামানন্দ বিবরণ॥
রামানন্দ হেন পুত্র যাহার তনয়।
তাহার মহিমা লোকে কহিলে না হয়॥
সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি তোমার পত্নী কুন্তী।
পঞ্চ পাণ্ডব তোমার পঞ্চ পুত্র মহামতি॥ (১)

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১০ম পরিচ্ছেদ।

রামানন্দ, ভবানন্দ রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। ভবানন্দের অপর পুত্রগণের মধ্যে গোপীনাথ ও বাণীনাথ সমধিক প্রসিদ্ধ। গোপীনাথ উৎকলরাজ প্রতাপ রুদ্র দেবের অধীনে রাজকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন (২) এবং বাণীনাথ শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সেবাফলে "নির্ব্বিষয়" হইয়াছিলেন (৩)। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোপীনাথকে "পট্টনায়ক" ও বাণীনাথকে 'নায়ক' উপাধিতে পরিচিত করিয়াছেন (৪)। 'নায়ক', 'পট্টনায়ক' প্রভৃতি উৎকলীয় উপাধি, বাঙ্গালীর 'মজুমদার' 'বক্সী' প্রভৃতি খেতাবের অনুরূপ। 'মজুমদার' 'বক্সী' প্রভৃতি নবাবী আমলের নবাবের অধীনে কার্য্যবিশেষে নিযুক্ত থাকার পরিচয়জ্ঞাপক, 'নায়ক' 'পট্টনায়ক' প্রভৃতি সেইরূপ উৎকলের হিন্দুনৃমণিগণের প্রদত্ত পদবী।

গোপীনাথ ও বাণীনাথের 'পট্টনায়ক' 'নায়ক' উপাধি দেখিয়া সাধারণতঃ ইঁহাদিগকে উৎকলীয় বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু একটু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে উৎকলভূমিকে ইঁহাদিগের 'ধাত্রী' ভিন্ন 'জননী' বলিয়া কিছুতেই অনুমিত হইবে না।

রামানন্দ, স্বপ্রণীত জগন্নাথ বল্লভ নাটকে স্বীয় পিতার ও নিজ নামের পরে 'রায়' উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। স্বরচিত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পদ সমুদয়ের ভণিতাস্থলে 'রামানন্দ রায়' এই সম্পূর্ণ নাম সন্নিবেশিত করিয়াছেন। 'রায়' উপাধি মুসলমানগণের শাসনকাল হইতে প্রচলিত হইয়াছে। উড়িষ্যার প্রতাপরুদ্রের সময় পর্য্যন্ত মুসলমানপ্রভাব লব্ধপ্রবেশ হয় নাই। ইহাতে অনুমান হয় যে ভবানন্দ রায় ও তৎপুত্র রামানন্দ রায় উৎকলের অধিবাসী নহেন, তাঁহারা উড়িষ্যা প্রবাসী মাত্র ছিলেন। উড়িষ্যা প্রবাসকালে গোপীনাথ ও বাণীনাথ রাজকার্য্যে লিপ্ত হইয়া কার্য্যোচিত উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইংরেজ গর্ভনরকে আফরিকার গর্ভন পাশা হইতে দেখিয়া তাঁহাকে অবশ্য কেহ মুসলমান শাসনকর্ত্তা মনে করেন না।

(২) চৈতন্যচরিতামৃত, অন্তলীলা, ৯ম পরিচ্ছেদ।

(৩) ঐ

(৪) চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার দশম পরিচ্ছেদে ভবানন্দের পঞ্চনন্দনের নাম এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে:—

"রামানন্দ রায় পট্টনায়ক গোপীনাথ।
কলানিধি সুধানিধি নায়ক বাণীনাথ॥"

বাঙ্গালার শেষ হিন্দুরাজা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া শ্রীক্ষেত্রে আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন (৫)। তাঁহার পরও যে অনেকেই তৎপদানুসরণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণও অনুসন্ধানে না পাওয়া যায় এমন নহে। মহাপণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মুসলমানরাজ্যে তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞানমত্তা পুরস্কৃত হইবে না এবং মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মুসলমানরাজ্যে স্বধর্ম্মাচরণে সক্ষম হইবেন না ভাবিয়াই সম্ভবতঃ উড়িষ্যায় গমন করিয়াছিলেন।

ভবানন্দ ও রামানন্দ, উভয়েরই "রায়" উপাধি হইতে আমার অনুমান হয় যে, ইহাঁরা বা ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে কেহ, গৌড়ের রাজসংসারে কোন কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, এবং মুসলমান রাজ্যে শান্তিসুখভোগের বা পার্থিব উন্নতিলাভের সম্ভাবনার অসদ্ভাব দেখিয়া উৎকলপ্রবাসী হইয়াছিলেন। সেই সময়ের বাঙ্গালার ইতিহাসেও ইহার প্রতিপোষক প্রমাণ না পাওয়া যায় এমন নহে। রাজা গণেশ ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে, রাজা রামানন্দের জন্মের ৮৫বৎসর পূর্ব্বে, পাণ্ডুয়ার সুলতানী তক্তের মুসলমান অধিকারীকে বিতাড়িত করিয়া, সধর্ম্মীর বাহুবলে, সধর্ম্মী মন্ত্রণাকুশল পণ্ডিতগণের মন্ত্রণাকৌশলে (৬) বঙ্গদেশে হিন্দুরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। ইনি সাত বৎসরমাত্র হিন্দু-মুসলমানে ভেদ না করিয়া অপক্ষপাতে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। রাজা গণেশ পরলোকগত হইলে তাঁহার পুত্র চিৎমল মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ পাণ্ডুয়ার সুলতানী তক্তে অধিরূঢ় হইলে বাঙ্গালা হইতে চিরদিনের জন্য হিন্দুশাসন বিদায় গ্রহণ করে, কিন্তু তাঁহার পুত্র আহম্মদ সাহের সময় পর্য্যন্ত

(৫) Stewart's History of Bengal.

(৬) নাম তাঁর হৈল শ্রীমান্ কুবের আচার্য্য।
ধর্ম্মবিদ্যাবলে হৈলা সকলের পূজ্য॥
তার গুণ বর্ণিতে মোহার শক্তি নাই।
নৃসিংহ সন্ততি বলি লোকে যারে গায়॥
*　　*　　*　　*　　*
যাঁহার মন্ত্রণা বলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়িয়া বাদশাহে মারি গৌড়ে হৈলা রাজা॥

অদ্বৈত প্রকাশ, প্রথম অধ্যায়॥

এই কুবের আচার্য্যের বংশেই শান্তিপুরের খ্যাতনামা অদ্বৈত প্র[illegible] বির্ভূত হন।

হিন্দুগণ বর্ণবৈষম্যজনিত অসুবিধাদি উপভোগ করে নাই। আহম্মদসাহ অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগত হইলে গৌড়ে অরাজকতা উপস্থিত হয় এবং পুনরায় ভেঙ্গারা ইলিয়াস সাহী বংশ রাজতক্ত অধিকার করে। এই সময়ে ইলিয়াস বংশের পক্ষপাতী ও ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমানগণ, যাঁহারা এতদিন বিষহীন ফণীর ন্যায় বিবরাশ্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন গণেশবংশের অবসানের পর প্রকৃত মুসলমানরাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় নূতন সুলতানের সিংহাসন পার্শ্বে সমাসীন হইয়া বঙ্গে মুসলমান শাসনভিত্তির দৃঢ়তা সম্পাদনে সযত্ন হইলেন (৭)। এই সময়েই হাবসী দাসগণের আমদানী হয় ও ক্রমশঃ হাবসীগণের প্রভাব বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সম্ভবতঃ দেশীয় হিন্দু ও দেশীয় মুসলমান উভয় জাতীয় রাজসেবকগণেরই আদর হ্রাসপ্রাপ্ত এবং হিন্দুগণের উচ্চপদপ্রাপ্তি বা রাজসেবা দ্বারা জীবিকার্জ্জনের পথরুদ্ধ হয়। আমার বিশ্বাস এই কারণেই সম্ভবতঃ রামানন্দের পিতামহ, ঐ বিপ্লবসময়ে রাজধানী গৌড়নগরে উন্নতিলাভের আশা না দেখিয়া শ্রীক্ষেত্রবাসী হন।

শ্রীরাধেশচন্দ্র শেঠ।

ময়ূর তখ্ত।

ভারতবর্ষের ইতিহাসপাঠকমাত্রেই জানেন যে দিল্লীশ্বরের বিখ্যাত রাজসিংহাসন ময়ূর তখ্ত (Peacock's throne) ও রত্নশ্রেষ্ঠ কহিনূর ভারতবিজয়ের পুরস্কার স্বরূপ পরাক্রান্ত বিজেতা নাদিরসার হস্তগত হইয়াছিল। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে যখন নাদির সা ভারত আক্রমণ করেন তখন ভারতের সিংহাসন অধিকার করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, থাকিলে তৎকালীন দিল্লির

(৭) All the adherents of the Bhengura family and many other zealous Mahomedans who during the reigns of the Hindu Dynasty had lived in retirement, now assembled round the throne and gave to it such stability that Nasir Shah enjoyed a long and undisturbed reign. Stewart's History of Bengal.

অধিপতি কাপুরুষ মহম্মদ সা কদাচ তাহার প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইতেন না। প্রকৃত পক্ষেও নাদির সা মহম্মদ সার সেনাপতিকে পরাস্ত করিয়া, ভারতরাজকে বশ্যতা স্বীকার করাইয়া দুই মাসকাল দিল্লীতে অবস্থিতি করেন। তৎপর নগদ অর্থ রত্নজাত ও বহুমূল্য দ্রব্য সামগ্রীতে প্রায় ৩০ ত্রিশ কোটি টাকা লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহার মধ্যে ময়ূর তখ্‌ত ও আর কয়েকখানি সিংহাসনের মূল্যই ৯ নয় কোটি টাকা। ময়ূর তখ্‌তের মূল্য সম্বন্ধে লেখকদিগের মধ্যে ঐক্য নাই। বিখ্যাত ফরাশী রত্নবিদ্ পরিব্রাজক টেভারনিয়ার ইহার নির্ম্মাণব্যয় ১৬ কোটি টাকা অনুমান করিয়াছিলেন। স্কট নামক অন্যতর ঐতিহাস লেখক বলিয়াছেন ইহার মূল্য দুই কোটি টাকা সাব্যস্ত হইয়াছে। মূল্য যিনি যাহাই বলুন না কেন ইহা যে তদানীন্তন দিল্লি সাম্রাজ্যের বিপুল ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

এই বহুমূল্য রত্নরাজিখচিত সিংহাসন বর্ত্তমান সময়েও পারস্য রাজধানীতে বিরাজমান আছে এ সংস্কার ভারতবাসীমাত্রেরই অন্তকরণে বদ্ধমূল রহিয়াছে এবং অন্য দেশীয় অনেক লোকেরই ধারণা এইরূপ। কিন্তু ভারতবর্ষের ভাবী রাজপ্রতিনিধি মাননীয় জর্জ কুর্জন সাহেব মহোদয় স্বরচিত 'পার্শিয়া' নামক গ্রন্থে এই সংস্কার অপনীত করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ সংগ্রহদ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন যে মোগল সম্রাটের সেই বিখ্যাত সিংহাসন (তখ্‌ত তাউস) এক্ষণে বর্ত্তমান নাই, তাহার ভগ্নাবশেষ মাত্র পারস্যের রাজপ্রাসাদান্তর্গত যাদুঘরে (Musium) ঐতিহাসিক শিক্ষার বিষয়ীভূত হইয়া আছে। পারস্য রাজধানী তিহারাণের রাজপ্রাসাদস্থ যে সিংহাসন পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদিগের নিকট ময়ূর তখ্‌ত বলিয়া পরিচিত উহা বাস্তবিক মোগল সম্রাটের ময়ূর তখ্‌ত নহে। এই শেষোক্ত সিংহাসন ইস্পাহানের প্রধান পুরোহিত মহম্মদ হোসেন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। পারস্যরাজ ফতে আলি সা যখন ইস্পাহানের কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার পাণিগ্রহণ করেন তৎকালে তাঁহার যৌতুক স্বরূপ ইহা নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। এই মহিলা জনসাধারণের নিকট "তাউস খানুম" অর্থাৎ ময়ূর বিবি নামে পরিচিত ছিলেন। ইহা হইতেই ফতে আলি সার এই সিংহাসনের নামও ময়ূর-সিংহাসন অথবা তখ্‌ত তাউস্ রাখা হইয়াছিল।

মাননীয় কুর্জন সাহেব মহোদয়ের এই প্রকার প্রতিপাদন যদিও সাধারণ সংস্কারের বিরোধী—তথাপি তাহা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। তিনি উভয় সিংহাসনের যে বিবরণী নিজ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহাতে উভয়ের পার্থক্য সহজে উপলব্ধ হয়। তিনি দিল্লীর ময়ূর তখ্‌তের যে বিবরণী দিয়াছেন তাহা বিখ্যাত ফরাসী পরিব্রাজক রত্নবিদ্ টেভারনিয়ারের লিখিত। ইনি ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে যখন ঔরঙ্গজেবের রাজসভায় স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন তখন স্বচক্ষে দেখিয়া এ বিষয় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এই :—

"এই বিখ্যাত সিংহাসন ৬ ফুট দীর্ঘে ও ৫ ফুট প্রস্থে। ২০।২৫ ইঞ্চি পরিমাণ উচ্চ চারিটি পায়ার উপর চারিখানি পাশি; তাহার উপর সিংহাসন স্থাপিত। এই পাশির উপর বারটি স্তম্ভ দাঁড়াইয়া আছে, তাহার সহিত উপরিস্থ চন্দ্রতাপ সংবদ্ধ। সম্মুখে কোন স্তম্ভ নাই। চারিখানির পাশির প্রত্যেকের মধ্যস্থলে এক একটি রত্ননির্ম্মিত চতুষ্কোণ, মধ্যস্থলে চুণী বা মাণিক চতুর্দ্দিকে মরকত। পাশির অন্যান্য স্থানেও ঐরূপ রত্নখোদিত চতুষ্কোণ, তাহার কোথায় বা মধ্যস্থলে মরকত মণি চতুর্দ্দিকে চুণী কোথায় বা চতুর্দ্দিকেই চুণী মধ্যস্থলে মরকত। সিংহাসনের পায়া ও পাশি সমস্তই বহুপরিমাণ মূল্যবান হীরক চুণী ও মরকত দ্বারা সজ্জিত। সিংহাসনের উপরে উঠিবার জন্য চারিটি ধাপ বা সিঁড়ি। ভিতরে তিনটি মূল্যবান্ বালিশ আছে তন্মধ্যে একটি অর্দ্ধ-গোলাকৃতি ও অপর দুইটি সমতল। উপরিস্থ চন্দ্রাতপের নিম্নভাগ মুক্তা ও হীরকের কারুকার্য্যশোভিত। চতুর্দ্দিকেও মুক্তার ঝালর। চন্দ্রাতপের উপরি ভাগে একটি সুবর্ণ ময়ূর উন্নত পুচ্ছ বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে; পুচ্ছ বহুমূল্য নীলকান্ত মণি ও বহুবিধ অন্যান্য প্রকারের রত্ন দ্বারা সুরঞ্জিত। সুবর্ণ ময়ূরের সর্ব্বাঙ্গও রত্নখোদিত এবং বক্ষে একখণ্ড সুবৃহৎ চুণী, তাহার সহিত দোদুল্যমান্ সুবৃহৎ মুক্তাখণ্ড। ময়ূরের উভয় পার্শ্বে তাহারই অনুরূপ উচ্চতাবিশিষ্ট এক একটি পুষ্পস্তবক। তাহাতে নানা প্রকারের সুবর্ণ পুষ্প, পুষ্পে মিণার কাজ। যখন বাদশাহ এই সিংহাসনে উপবেশন করিতেন তখন তাহার সম্মুখে বিবিধ প্রকারের মণিময় সুবৃহৎ হীরকখণ্ড দোদুল্যমান থাকে এবং সেটি সর্ব্বদাই তাঁহার চক্ষুর নিকটবর্ত্তী দেখা যায়। যে বারটি স্তম্ভের সহিত চন্দ্রতাপ আশ্রিত তাহারও প্রত্যেকটি মূল্যবান মুক্তাখোদিত।

এই সেই বিখ্যাত সিংহাসন,—যাহা তৈমুরলঙ্গ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন এবং সাজিহান সমাপ্ত করেন। ইহা নির্ম্মাণ করিতে প্রায় ১৬ ষোল কোটি টাকা ব্যয়িত হয়।"

পারস্যের বর্ত্তমান ময়ূরতখ্‌ত রাজপ্রাসাদে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তাহার প্রতিমূর্ত্তি কুর্জন সাহেব নিজ পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন (Parsia p. 319) তাহার বর্ণনা তিনি নিজে এইরূপ করিয়াছেন———

"ইহাও উক্ত প্রকারের চতুষ্কোণবিশিষ্ট সুন্দর কারুকার্য্যশোভিত। সমগ্র দ্রব্যটি সুবর্ণপাতে আবৃত। তাহার উপর মনোহর মিণার কার্য্য এবং স্থানে স্থানে বহুমুল্য প্রস্তরখোদিত, প্রস্তরের মধ্যে চুণী এবং মরকত মণিরই প্রাধান্য। ইহা রত্নখচিত সপ্তপদের উপরি স্থাপিত। দুইটি সুন্দর পাদানে পদ রক্ষা করিয়া উপরে উঠিতে হয়। চারিদিকে অক্ষরখোদিত পাশি দ্বারা আবদ্ধ, পশ্চাদের পাশি রত্ননির্ম্মিত ও ত্রিকোণবিশিষ্ট এবং তাহার যে স্থানে চূড়ার মত তথায় একটি গোলাকৃতি হীরকনির্ম্মিত তারা, যন্ত্রদ্বারা ঘূর্ণায়মান হইয়া জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছে। এই তারার দুইদিকে দুটি রত্ন-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র পাখী পরস্পরের দিকে চাহিয়া আছে।

এতদুভয়ের বহিরাকৃতির সাধারণ সাদৃশ্য ভিন্ন আর সকলই পৃথক। শেষোক্তের স্তম্ভ অর্থাৎ পিলার নাই। চন্দ্রাতপ অথবা উপরের কোন প্রকার আবরণ নাই বা পূর্ব্বে থাকিবারও কোন চিহ্ন নাই এবং যাহা সর্ব্বাপেক্ষা বিচারণীয়—কোন ময়ূরাকৃতি নাই।

মাননীয় কুর্জন সাহেব অনুসন্ধানে আরও বাহির করিয়াছেন যে, ফ্রেজার সাহেব স্বরচিত "খোরসান" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে ১৮২২ খৃ অব্দে তাঁহাকে একজন প্রাচীন খুর্দ্দ বলিয়াছিল যে "যখন নাদির সা দস্যুহস্তে নিহত হন ও তাঁহার শিবির লুণ্ঠিত হয় সেই সময় ময়ূর তখ্‌ত এবং মুক্তানির্ম্মিত তাম্বু আমাদিগের হস্তগত হয় এবং সেই স্থানেই তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া আমাদিগের মধ্যে অংশমত বিভক্ত হইয়া যায়।", অসভ্য ও উগ্র প্রকৃতির খুর্দ্দদিগের মধ্যে যে কেহ এরূপ কার্য্য করিবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় মনে করা যাইতে পারে না। এই বৃত্তান্তটি কুর্জন সাহেব স্বোদ্ভাবিত দিল্লীর ময়ূর তখ্‌তের অস্তিত্ব লোপের প্রধান পোষক জ্ঞানে স্বীয় পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

ইহাতেও এক সন্দেহ থাকিয়া যায়, কথিত আছে যে নাদির সার নিকট প্রকৃত ময়ূর তখ্‌ত এতই আদরণীয় ছিল যে তিনি স্বীয় ব্যয়ে ইহার অবিকল অনুরূপ আর একখানি সিংহাসন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রাচীন খুর্দ্দের কল্পিত বৃত্তান্তের সত্যতার প্রতি অবিশ্বাস না করিলেও শিবিরে প্রাপ্ত ঐ ময়ূর তখ্‌ত নাদির সার নির্ম্মিত নকল সিংহাসন বলিয়া ধারণা হওয়া অসম্ভব নহে।

শ্রীরমাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

———o———

কবিতাকুঞ্জ।

বরষায়।

ঝর ঝর ঝর ঝরিছে জল,
ঘনমগন গগনতল,
স্তিমিত চন্দ্র শুনিয়ে মন্দ্র
তপন নাহি ঝলসে;
অধীর পারা কেবলি ধারা
আঁধারি' ধরা, বরষে।

স্তব্ধ দিশি নীরব প্রাণী,
ছুটেছে নদী কলনাদিনী,
কোমল অঙ্গে তরঙ্গভঙ্গে
কতই রঙ্গে ধাইছে।
সাগর দূরে গভীর সুরে
মিলনগীতি গাইছে।

ফুটেছে বনে কেতকী ফুল,
কাঁটার কারায় রূপ অতুল,
রজনীগন্ধ ঢালে আনন্দ
আঁধার-মাখা প্রদোষে।

আর, পলকে পলকে ঝলকে ঝলকে
বাদল শুধু বরষে।

জগত যেন আছি নিরালা,
কেমন যেন আছি একেলা,
কি জানি চাহি, কি জানি গাহি,
বুঝি না প্রাণের ভাষা ;
কি জানি কাহায় রাখিলে হিয়ায়
মিটিবে আকুল আশা।

আয় প্রিয়তমে আয়লো সখি,
হৃদয়ে হৃদয় মিশায়ে দেখি
বুঝি এ শূন্য হইবে পূর্ণ ;
আয়লো আনন্দ মোর !

আসুক বরষা যত মনে লয়,
নাশুক বিশ্ব হউক প্রলয়,
তোমাতে আমাতে রহিব তন্ময়
দিবস রজনী ভোর !

শ্রীমনোমোহন সেন।

কোথায় !

আজ কয়দিন হায়, দেখিতে পাইনি তায়,
আমার সোণার চাঁদ লুকাল কোথায় ?
কোন্ রাহু হ'রে নিল আমার বাছায় ?

সেই রবি শশী তারা, নহেত কিরণ-হারা !
আজো আলো দেয় তারা আকাশের গায় !
সকলি আঁধার যেগো না হেরিয়া তায় !

সেইত সমীর বয়, এখনও কুসুমচয়

ফুটিয়ে হাসিছে ওই কাননের কোলে,
তা বিনা যে ভাসি আমি, শুধু আঁখি জলে,

পাখীর কাকলী রব, শরতের এ উৎসব
প্রকৃতির চারু শোভা সকলি কেমন,
কিছুতে আমার কেন শান্ত নহে মন !

কি জাগ্রতে কি স্বপনে, তার মুখ পড়ে মনে,
সেই সে বালিকা মোর হৃদয়ের ধন।
তারে ছেড়ে কিসে বল ধরি এ জীবন ?

তোরো কি মা নাই মায়া, ভুলেছিস দয়ামায়া,
দুইদিনে এত ভুল হ'য়ে গেছে তোর ?
কি দেখে সে দেশে তুই রয়েছিস ভোর ?

গেলে সেথা একবার, ফিরিয়া আসিতে আর,
চাহে না কাহারো মন সে কেমন দেশ,
সেথায় নাইক কিরে মমতার লেশ ?

মা বাপ ভগিনী ভাই, কারেও কি মনে নাই ?
সে দেশে গেলে কি সব ভুল হয়ে যায় ?
সে কেমন দেশ তবে সে দেশ কোথায় !

সে দেশে থাকিতে মাগো, প্রাণ তার কাঁদে নাকো !
আপনার যারা-তারা সকলি হেথায়,
কেমনে আছিস তুই একেলা সেথায়।

সেই মরুময় দেশে, কেবা তোকে ভালবেসে
সুধার সময়ে বাছা জোগায় আহার !
ফিরে আয় মা আমার কাজ নাই আর।

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

নীলাচল।

(এই স্থানে শ্রীচৈতন্য দেহত্যাগ করেন)।

সেও সে পূর্ণিমা নিশি অমনি মধুর,
স্নিগ্ধ সুধাকর আছিল শোভিত দূর
নীলাম্বরতলে। আকুল তরঙ্গমালা
হরষে নাচিতেছিল মণিময় জ্বালা
সোহাগে শিরসে ধরি। মধুর কল্লোলে
সাগর লুটিতেছিল চরণের তলে;
ভক্তের চরণ রেণু লভিবার আশে;
সমীর ঘুরিতেছিল সুনীল আকাশে,
সাদরে বহিয়া দূর দূরান্তর কোলে
সুগভীর সুধামখা সঙ্গীতের রোলে
জুড়াতে জগতপ্রাণ। সুদূরে দেবতা
বসিয়া বিমানতলে হেরি আকুলতা
বুঝি বা ভক্তের; প্রেমেতে সজল আঁখি
নীরবে ফেলিতেছিল ধীরে থাকি থাকি
নয়নসলিল, স্খলিত তারকাছলে।
উচ্ছ্বসি' উঠিতেছিল নৈশ নভোস্তলে
নিমাইয়ের আকুল ক্রন্দন, স্তব্ধ করি
দশ দিশি, অন্তর দেবতা লাগি'। হেরি
সেই প্রণয়লহরী প্রগাঢ় সরল,
প্রেমে উচ্ছ্বসিত বুক চক্ষে ভরা জল
ভক্তেরা নাচিতেছিল ঘিরিয়া তাঁহায়;
উচ্চকণ্ঠে কাঁপাইয়া সাগর-বেলায়
সুমধুর হরি নামে। সাগর-সলিলে
নিমাই দেখিতেছিল ভাসি আঁখিজলে
চির আকাঙ্ক্ষিত মূর্ত্তি, শ্যামল সুন্দর

সেই ত্রিভঙ্গিম ঠাম, বিলাস মন্থর
সে লাবণ্যরাশি, কণ্ঠে সেই অনুপম
বনকুসুমের মালা সুন্দর শোভন
কিরণ-উজ্জ্বল ঊর্ম্মিমালাসম। শিরে
সেই অপূর্ব্ব মুকুট, সাগরের তীরে
বিচিত্র পল্লবজাত। মধুর বাঁশরী
হ'তে পুণ্য সুধাসম—সে স্বরলহরী
পড়িছে ঝরিয়া অবিরাম বারিধির
মধুর কল্লোলরূপে। আকুল অধীর
সুন্দর বদন,—যেন ভক্তের বেদনা
লাগি'। চঞ্চল নয়নতটে অতুলনা
স্নেহধারা ভক্তেরে খুঁজিছে যেন চির
আকিঞ্চন ভরে। প্রতি কথা সেই কাহিনীর
আজিও অঙ্কিত যেন পাষাণহৃদয়ে
তব, অম্লান অক্ষরে, লৌহ সূচী দিয়ে।
আজো যেন প্রতিধ্বনি তার সে গানের,
হৃদয় উন্মত্তকারী সে সুর তানের,
উচ্ছ্বসি গাহিছে সিন্ধু। আজিও বাতাস
অপূর্ব্ব সৌরভে তার ভরিছে আকাশ
আকুল আবেগ ভরে। পাখী জলচর
আজিও ফিরিছে খুঁজি অক্লান্ত অন্তর
লহরে লহরে সেই বরবপু বিধু
তার লক্ষ কর দিতেছে প্রসারি শুধু
উজ্জ্বল করিতে তারি রম্য উপবন।
ধরিয়া রেখেছ বক্ষে তুমি নীলাচল,
এ সুখ আশ্বাসবাণী, এই সুবিমল
পবিত্র মিলনগাথা। দূর ভবিষ্যতে
কতপুণ্যধাম-যাত্রী খুঁজিতে খুঁজিতে

হৃদয়ের 'কাঙ্ক্ষিত রতন—এ আখ্যান
শুনি লভিবে উৎসাহ নব নব জ্ঞান
নূতন সান্ত্বনা। শুনি মানবের প্রতি
দেবতার অতুল করুণা কথা ; নতি
তাঁর করিয়ে চরণে—কৃতজ্ঞ অন্তর
হৃদয়ে প্রেমের ধারা পরাণ বিভোর
অসহ সুখের বশে। হে পুণ্য অচল,
সেই সঙ্গে তার ক্ষুদ্র হৃদয় বিভল
তোমারো চরণতলে হইবে আনত
এ অতুল শিক্ষাহেতু ভক্তি রত চিত।

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

সুবাক্য-ভাণ্ডার।

ভুজঙ্গ ধরিতে যদি সঙ্কল্প তোমার,
থতমত ছাড়ি ধর ঘাড়ে চাপি তার।

হস্তী কিংবা মশক চিত্রিতে অভিপ্রায়,
চিত্রের পত্তন দেখি শেষ বুঝা যায়।

পরে হিংসা কর তুমি হেরি তার ধন ;
জান না তোমারে হিংসা করে কত জন।

আছে বন্ধু, কাব্য, আর নিষ্পাপ হৃদয়,
অভাব বলিয়া তার আর কিসে ভয় ?

হস্ত, পদ, বল, বুদ্ধি আছে ত সকল,
পর-মুখ চাহি তবু কি হেতু বিকল ?

সদা ফেল দীর্ঘ শ্বাস ভাবি রাজ্য ধন,
ভাব না উচ্ছিষ্টে তব কৃতার্থ ক'জন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী।

রাম সদয়।

(১)

পদ্মমুখী আজ শ্বশুর-বাড়ী যাইবে, পদ্মমুখীর মা পদ্মমুখীকে সাজাইয়া দিল; নূতন সাড়ী, নূতন শাঁখা, রূপার তাবিজ, রূপার পৈঁচা, রূপার বাঁকা মল, সোণার নথ, একে একে সবগুলি পরাইয়া দিল। পান খাইয়া, টিপ্ কাটিয়া, আপনার অন্যান্য কাপড় চোপড়গুলি গুছাইয়া লইয়া পদ্মমুখী শ্বশুর-বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। মায়ের কাছে কাঁদিল, সঙ্গিনীর কাছে হাসিল; একদিকে তাহার সেই জলভারাবনত নয়নপল্লব, অন্যদিকে হাস্যময় অধর তাহার অব্যক্ত হৃদয়ের ভাষা ছত্রে ছত্রে প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহার সেই সময়ের মুখকান্তি শিশিরসিক্ত কমলদলের ন্যায় বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল।

শত্রু হউক, মিত্র হউক প্রতিবেশিনী-হৃদয়ে সহানুভূতি এবং সমবেদনা আছে। অন্তরে যদি দারুণ ঈর্ষা থাকে তাহাও চাপিয়া রাখিয়া, সুখের সময় তাহারা সকলে মিলিয়া আনন্দ প্রকাশ করে, দুঃখের সময় সমবেদনা প্রকাশ করিয়া চক্ষুজল মুছাইয়া দেয়। আজ পদ্মমুখীর শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় পল্লীবাসিনী রমণীগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। সমাগতা রমণীগণের মধ্যে সকলেই প্রায় পদ্মমুখীর সমশ্রেণীয়া, (পাঠক স্মরণ রাখিবেন, বঙ্গীয় কৈবর্ত্ত-কুলে পদ্মমুখীর জন্ম হইয়াছে) উচ্চ শ্রেণীয়ার মধ্যে কেবল পদ্মমুখীর বামুণ পিসি! পদ্মমুখী এবং পদ্মমুখীর মা তাহারা উভয়েই বামুণ পিসিকে বড় ভক্তি করে। কেবল তাহারা কেন পল্লীর সকল ঘরেই বামুণ পিসির বড় আদর। বামুণ পিসি ষষ্ঠীর পূজা করেন, মনসার কথা বলেন, কোন্ মাসে কয়টা দশমী তাহা মুখে মুখে বলিয়া দেন, শ্রীমদ্ভাগবতের যত কথা সব যেন তাঁহার কণ্ঠস্থ! পল্লীবাসিনীরা বলে বামুণ পিসির পেটে মা সরস্বতী আছেন। তিনি পদ্মমুখীর মায়ের প্রধান মন্ত্রী!

তিনি আসিবামাত্র পদ্মমুখী তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল। তিনি "এস মা এস, সুখে থাক, সাত বেটার মা হও, পাকা চুলে সিন্দুর পর" ইত্যাদি আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিয়া স্বস্তিবাচন করিলেন; পরে অন্যান্য

কথাবার্ত্তার পর বলিলেন "পদ্ম! আমার কথাগুলি মনে আছে তো? দেখ্‌বো এবার কেমন মেয়ে! এবার যখন ফিরে আস্‌বি তখন যেন গা ভরা গয়না দেখ্‌তে পাই, সাধ আহ্লাদ ক'র্‌বি ব'লেই তো দোজবরে বিয়ে দেওয়া; এবার গিয়ে তেমন হাবা হ'য়ে থাকিস্‌নে, আপনার ঘরসংসার কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিস্‌।" পদ্মের মা বলিল "সত্যিই তো এমন হাবা মেয়ে দেখি নাই, আমি কত বলি একটু সেয়ানা হ', আপনার ভাল মন্দ বুঝে নে, সে রাবণের পালের মধ্যে পড়ে খেটে খেটে তোর হাড় মাটি করিস্‌ কেন? জামাইকে একটু বুঝিয়ে বল্লেই সেত আর মুরুখ্‌খু নয়, আপনিই আলাদা হয়ে ঘর-সংসার কর্‌বে, তখন আপনিই দশখানা সোণা দানা হবে; তোর সোয়ামীর রোজগার দশজনে লুটে খাবে কেন?"

পাড়ার মেয়েরা সকলেই একবাক্যে বামুণ পিসি ও পদ্মের মায়ের কথায় সায় দিল; এ বিষয় লইয়া বড় একটা বাদ প্রতিবাদ হইল না; ইহার পূর্ব্ব হইতেই পদ্মমুখী বামুণ পিসি ও জননীর নিকট সুশিক্ষিতা হইতেছিল, আজ পদ্মমুখী কথাগুলি স্মরণ রাখিবার জন্য মনে মনে আপনার পরিহিত বসনাঞ্চলে একটি গ্রন্থি দিল, তাহার পর ডুলিতে চড়িয়া পদ্মমুখী শ্বশুরবাড়ী গেল।

(২)

পদ্মমুখীর স্বামীর নাম রামসদয় বিশ্বাস; রাম সদয়েরা পাঁচ সহোদর; তাহার নিজের কোন সন্তান সন্ততি নাই; প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে দ্বিতীয় পক্ষে পদ্মমুখীকে বিবাহ করিয়াছে। অন্যান্য ভ্রাতার প্রত্যেকেরই চার পাঁচটী করিয়া সন্তান সন্ততি আছে; হৃদয়পুরের কৈবর্ত্তকুলের মধ্যে রাম সদয় বড় ভাগ্যবান, তাহার কুড়ি গোলা ধান, দশখানা লাঙ্গল, ত্রিশটা বলদ, দুইশত বিঘার জোত, বাড়ীতে নারায়ণের সেবা, অতিথিসেবার গৃহ। রাম সদয় সেই হৃদয়পুরের গোমস্তা। তাহার কুটুম্বেরা বলে লক্ষ্মী সরস্বতী রাম সদয়ের গৃহে অচলা। রাম সদয় লেখা পড়া শিখিয়াছে বলিয়া সে আর হাল বহে না, অন্যান্য ভ্রাতারা হাল বহে। ভ্রাতারা অনুগত, রাম সদয়ের স্নেহও সকলের প্রতি সমান। রাম সেদয় বলিত আমার ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব ভাই, ভ্রাতারা বলিত "দাদা আমার যুধিষ্ঠির।" রামসদয়ের ব্যবহারে সে বৃহৎ পরিবারের ভিতর অশান্তির লশমাত্র নাই, গরুর রাখালটী পর্য্যন্ত তাহার ব্যবহারে সন্তুষ্ট। পাছে ভ্রাতৃবধূগণের

মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয় বলিয়া রাম সদয় নিজেই গৃহিণীপণা করে। সকল সামগ্রী সকলকে সমান ভাগে বণ্টন করিয়া দেয়। সকল ছেলেপিলেকেই সমান আদর করে, সমান বসন ভূষণ দিয়া সকলকে সন্তুষ্ট রাখে। গৃহ-কার্য্যের পালাবন্দী করিয়া দিয়াছে, কাজেই সে সম্বন্ধেও কোন কলহ নাই। রাম সদয় নিজে সরল, অপক্ষপাত ও ধর্ম্মভীরু, তাহার বৃহৎ সংসারও সেইজন্য শান্তিনিকেতন! সে নিজের স্নেহ ও অমায়িকতার বিনিময়ে প্রতি হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তির অধিকারী হইয়াছে, ভীমার্জ্জুনের ন্যায় ভ্রাতৃগণপরিবৃত হইয়া রাম সদয় যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সুখে আছে।

(৩)

দ্বিতীয় পক্ষের কি গুণ আছে জানি না, কিন্তু পক্ষটা বড় মধুর! ভুক্তভোগী পাঠক তাহা অবগত আছেন। রাম সদয় পদ্মমুখীকে বড় ভালবাসে; তাহার স্বকৃত এই কবিতাটি যথা—"পদ্মমুখী হদ্দ মেয়ে, সদ্য ফোটা গোলাপ ফুল, সৌরভে তার প্রাণ আকুল।" এইটি আবৃত্তি করিয়া পদ্মমুখীকে সোহাগ করে। পদ্মমুখী মান করিলে, সে 'দ্রেহি পদ পল্লব মুরারে' বলিয়া তাহার মান ভঙ্গ করে; আগে আগে এইরূপ ভাবেই মান ভঙ্গ হইত, কিন্তু এবার পদ্মমুখীর মানের মাত্রাটা কিছু অধিকতর, রাম সদয়ের সোহাগাদি সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে। পদ্মমুখী বাষ্পগদগদ কণ্ঠে বলিতেছে "তুমি পৃথক হও, তোমার এত রোজগার অন্যে খাবে কেন? তোমার স্ত্রী হইয়া খাটিয়া খাটিয়া হাড় মাটী করি কেন? তোমার এক বৎসরের রোজগারে যত গহনা হইবে, তত আমার গায়ে ধরিবে না।" রামসদয় নীরবে সে কথাগুলি শুনে, কোন উত্তর করে না। কোন কোন দিন রাম লক্ষ্মণের কথা, পাণ্ডবদের কথা, বিজয় বসন্তের কথা, তুলিয়া পদ্মকে বুঝাইবার চেষ্টা করে; পদ্ম তাহা বুঝে না, তাহার সেই এক কথা, 'আমার মাথা খাও, তুমি পৃথক হও।' রাম সদয় বুঝিল সাগরে তরঙ্গ উঠিয়াছে; তখন পদ্মকে প্রবোধ দিল, ভয় কি পৃথক হইব। পদ্মমুখীর বুকের বল বাড়িল, শান্তিপূর্ণ সংসারের ভিতর কলহের বিষ প্রবেশ করিল। কিন্তু আজ কাল আজ কাল করিয়া চারি মাস কাটিয়া গেল, রাম সদয় পৃথক হইল না, অবশেষে এক দিন পদ্মমুখী বলিল, কালই যদি তুমি পৃথক না হও, আমি গলায় দড়ী দিয়া মরিব। রাম সদয় বলিল, কালই পৃথক হইব, পদ্মমুখীর আহ্লাদ-সমুদ্র উথলিয়া উঠিল।

(৪)

সন্ধ্যা বেলায় রাম সদয়ের ভ্রাতৃগণ কৃষিক্ষেত্র হইতে গৃহে ফিরিয়াছে; রাম সদয় ভ্রাতৃ-পুত্রকন্যাগুলির কাহাকে বুকে কাহাকে কোলে করিয়া গোয়ালে গোয়ালে গরুগুলির তত্ত্বাবধান করিল, ঠাকুরঘরে গিয়া নারায়ণকে প্রণাম করিয়া আসিল, তাহার পর তাহার ক্লান্তদেহ ভ্রাতৃগণ যেখানে সান্ধ্য-জ্যোৎস্নালোকে পুলকিতহৃদয়ে বসিয়া বর্ত্তমান কৃষির অবস্থা, ক্ষেত্র-সমূহের আপেক্ষিক উর্ব্বরতা—প্রভৃতি বিষয় আন্দোলন করিতে করিতে পল্লীর অপর দশজন কৃষকের সহিত নিবিষ্টচিত্তে তামাকু সেবন করিতেছিল, সেই-খানে আসিয়া বলিল। দুইচারিটা অন্য আলাপের পর, সহাস্যবদনে ভ্রাতৃগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল "দেখ, এখন তোমরা মানুষের মত হয়েছ, আর কেন, আপন ঘরসংসার দেখে শুনে লও। আমি আর তোমাদের সহিত একত্র বস-বাস করছি না। আমার পরিবার বলে, আর তোমাদের সঙ্গে বনিবনাও হওয়া কঠিন। আমি ঠিক করেছি কাল হতে আমি পৃথক হব।" রাম সদয়ের মুখে এই প্রস্তাব শুনিয়া সরলমতি ভ্রাতৃগণ যেন আকাশ হইতে পড়িল। তাহারা ভাল মন্দ জানে না, ঘরগৃহস্থালীর কোন খবর রাখে না, তাহারা খাটিয়াই খালাশ, দাদা যা করে তাই হয়; রাম সদয়ের কাছে এখনও তাহারা যেন শিশু। তাহারা তো কোন অপরাধ করে নাই, কবে রাম সদয়ের মুখে এ কঠিন কথা কেন? তাহারা বলিল 'দাদা আমাদিগকে ভাসিয়ে দেওয়া কি তোমার উচিত? বড় বৌয়ের সঙ্গে কে অবনিবনাও করেছে, তাতো আমরা জানি না, যেই করুক, আমরা এখনই তাকে বিধিমতে শাসন করছি।' রাম সদয় সে সকল কথায় কর্ণপাত করিল না। অনেক বাগবিতণ্ডার পর পৃথক হওয়াই স্থির হইল; অগত্যা অকপট ভ্রাতৃগণ পৃথক হইতে স্বীকৃত হইল; শত্রুরা হাসিল, মিত্রেরা ক্ষুণ্ণ হইল। যখন কথা শেষ হইয়া গেল, তখন তাহার মধ্যম ভ্রাতা "তবে আমার যুধিষ্ঠির দাতা কাল হতে পর হল", এই বলিতে বলিতে হাতের হুকাটা আছড়া-ইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তাহার গণ্ডস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হইতেছিল।

(৫)

রামসদয় পৃথক্ হইল; ব্যবস্থা করিল ভাল; সে চাকরী করে, বিশেষ কোন সন্তান সন্ততি নাই, সেই জন্য সে বিষয় সম্পত্তির কোন অংশ লইল না;

অপর ভ্রাতারা সমস্ত বিষয় সম্পত্তির মালিক হইল, কিন্তু রামসদয়ের আদেশ তাহারা কেহ পৃথক্ হইতে পারিবে না। চাষ, বাস, কাজকর্ম্ম—যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিবে। আপাততঃ একখানিমাত্র ঘর রামসদয় লইল, ইহার পর সে নিজের বাটী করিয়া লইবে, এই ব্যাপারে দশখানা গ্রাম যুড়িয়া রামসদয়ের বড় সুখ্যাতি হইল। পদ্মমুখীর আ'জ বড় আহ্লাদ, স্বামী সমস্ত বিষয় ছাড়িয়া দিয়াছে তবু তাহার আহ্লাদ! সে যে ঘরখানি ভাগে পাইল, সে ঘরখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া আপনার জিনিসপত্রগুলি আনিয়া সেই ঘরে গুছাইয়া রাখিল। বেলা প্রহরেকের সময় স্নান করিয়া আসিয়া সকাল সকাল রন্ধনের আয়োজন করিয়া আপনার মনোমত করিয়া রন্ধন করিল। রামসদয় প্রতিদিন যে সময় স্নান করে সেই সময় স্নান করিল; বহির্ব্বাটীতেই তাহার জলযোগের ব্যবস্থা সেই খানেই জলযোগ হইল, কি জানি কেন পদ্মমুখীর প্রকোষ্ঠে গেল না। বেলা প্রায় আড়াই প্রহরের সময় যখন দেখিল তাহার ভ্রাতৃগণের গৃহে ভোজনের সময় উপস্থিত হইয়াছে, তখন ধীরে ধীরে ভ্রাতৃগণের রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিয়া অনাহূত হইয়াই ভ্রাতৃগণের সহিত ভোজনে বসিল। ভ্রাতৃগণের, ভ্রাতৃবধূগণের আহ্লাদের সীমা নাই। ভোজনান্তে বৈঠক ঘরে গিয়া প্রতিদিন যেমন শয়ন করে সেইরূপ শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিল। পদ্মমুখী সমস্ত উদ্যোগ করিয়া ছট্ ফট্ করিতেছে, বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়া গেল স্বামী আসিল না। বেলা অবসানে রামসদয় বৈকালিক নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া একটি ভ্রাতুষ্পুত্রকে কোলে লইয়া হাস্যবদনে পদ্মমুখীর প্রকোষ্ঠে দর্শন দিল। পদ্মমুখী প্রথম অভিমান করিল, কৃত্রিম প্রণয়কোপ প্রকাশ করিয়া দুই একটা চড়া কথা বলিল তাহার পর ভোজনের অনুরোধ! রামসদয় বলিল "আ'জ আর ওরা ছাড়িল না, তাই আ'জ ও বাড়ীতেই খাইয়াছি।" পদ্মমুখীর পদ্মনেত্র দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইল।

(৬)

সেদিন গেল, তাহার পরদিনও গেল, দিনের পর দিন গিয়া প্রায় একমাস অতীত হইল, রামসদয় একটি দিনের জন্যও পদ্মমুখীর কাছে বসিয়া আহার করিল না। পদ্মমুখীর রন্ধনস্থালীতে বাসি ভাতের স্তূপ হইল। তাহার

উপর পদ্মমুখী আর একটি দিনের জন্যও স্বামীকে শয্যাপার্শ্বে পায় না। রামসদয় দিনান্তে একবারমাত্র হাস্যবদনে পদ্মমুখীর প্রকোষ্ঠে দর্শন দিয়া, দুই একটা রহস্যালাপ করিয়া পদ্মমুখীর মুখ ভার করিয়া দিয়া বাহির হইয়া যায়, আর আসে না, বহির্ব্বাটীতেই শয়ন করে। এইবার পদ্মমুখী প্রমাদ গণিল; রাশি রাশি আক্ষেপ অভিমানে তাহার হৃদয়ের অভ্যন্তরভাগ পরিপূর্ণ হইতে লাগিল; একদিন রামসদয় দেখা দিতে আসিলে সে দুঃখে শোকে স্বামীর কাছে কাঁদিয়া ফেলিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "এ তোমার কি ব্যবহার ?"

রামসদয় পদ্মমুখীর চক্ষুদুটি আদর করিয়া মুছাইয়া দিয়া বলিল "কি মন্দ ব্যবহার দেখ্‌লে ?"

"আমাকে তুমি এত কষ্ট কেন দিচ্ছ ?"

"তোমার কিসের কষ্ট, আমি তো জানি তুমি সুখে আছ।"

"এই কি আমার সুখ ? যদি এত মনে তবে পৃথক্ হ'লে কেন ?"

"আমি তো পৃথক্ হই নাই, একত্রে থাক্‌তে তোমার কষ্ট হ'ত সেইজন্য তোমারই অনুরোধে তোমাকে পৃথক্ ক'রে দিয়েছি; আমার পৃথক্ থাক্‌তে কষ্ট হয় বলে আমি তাদের সঙ্গে একত্রে আছি।"

"তোমাকে ছেড়ে পৃথক্ হ'য়ে আমি কি ক'র্‌বো ?"

"যদি মত হয় তবে আবার একত্র হও।"

পদ্মমুখী মত দিল; পদ্মমুখী বুঝিতে পারিল সে বড় কুকর্ম্ম করিয়াছে, তাহার নিজের মন ভাল, সে লোকের কথায় স্বামীকে পৃথক্ হইতে উপদেশ দিয়াছিল। এখন সে স্বামীর ব্যবহারে শিক্ষা পাইল যে তাহার শত শত অপরাধ হইয়াছে। সে রামসদয়ের পায়ে ধরিয়া সজলনয়নে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিল; রামসদয় সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া পদ্মমুখীকে অঙ্কে বসাইয়া সস্নেহে তাহার পদ্মমুখ চুম্বন করিল। সেই দিনই হৃদয়পুরবাসী সকলে শুনিতে পাইল রামসদয়েরা আবার একত্র হইয়াছে। তাহার ভ্রাতৃদের যে কি আহ্লাদ তাহা বর্ণনা করা যায় না। রামসদয়ের গৃহের সুখশান্তি দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল, পদ্মমুখী সেই বৃহৎ পরিবারের কর্ত্রী হইয়া রামসদয়ের ন্যায় অপক্ষপাতে গৃহস্থালী করিতে লাগিল। রামসদয় মরিয়াছে, পদ্মমুখী মরিয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের স্মৃতি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। শ্রাবণ। 'মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস' ও 'প্রসঙ্গ কথা' সমালোচনাত্মক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বলিয়া বোধ হইল। উহাতে অনেক মূল্যবান কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে: 'বস্ত্ররঞ্জন বিদ্যার' প্রবন্ধমাত্র পড়িয়া ফল নাই; কেহ যদি আমাদের বস্ত্ররঞ্জন বিদ্যার গৌরবরক্ষার্থ চেষ্টা করেন তবেই লেখকের শ্রমসফল হইবে। কিন্তু এদেশে কেহ এতটা অধ্যবসায় ও শ্রমস্বীকার করিবেন কি ? 'দেবীপ্রতিমা' একটি গল্প, ইহার আখ্যানবস্তু অল্প, একবিন্দু শিশির যেমন শষ্পশ্যামল প্রান্তরপ্রান্তে ঝিক্‌মিক্ করে, ইহাও প্রায় সেইরূপ। ইহার ভাষাই ইহাকে সে ঔজ্জ্বল্য প্রদান করিয়াছে; কিন্তু এ ভাষা সকলের মনোজ্ঞ হইতে পারে না; সমস্তটা পড়িয়া শেষ করিয়াও অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—'কি লিখিয়াছে' ? আমরা এরূপ প্রবন্ধের প্রশংসা করিতে পারি না। কিন্তু গায়ে পড়িয়া নিন্দা করিতেও পারি না। মাসিকপত্র পাঁচ ফুলের সাজি; কোনটী অঙ্গরাগে, কোনটী বা সৌরভগৌরবে মনোজ্ঞ। তবে ডালি সাজাইবার সময়ে শাল্মলীগুলি তাহাতে স্থাপন না করিলেও চলিতে পারে।

সাহিত্য। শ্রাবণ। কবিতাকুঞ্জ সমেত আটটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে; তন্মধ্যে 'কুশীনগর' প্রবন্ধে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণনগরীর স্থাননির্দ্দেশের জন্য যে প্রবন্ধের সূচনা হইয়াছে তাহাতে এ পর্য্যন্ত কোন নূতন কথা দেখিতে পাইলাম না। কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় 'ভানুমতী' নামক গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। ইহা পদ্যে গদ্যে সরস বর্ণনায় সরল ভাষায় সুসজ্জিত, শেষ দেখিবার জন্য আশা রহিল। কবিতাকুঞ্জে বর্ষাকালেও কোকিলকূজন চলিতেছে। শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'সাহিত্য পঞ্জী' নামক একটি নক্সা আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বক্তব্য বিষয়ের শিরোদেশে "কোন গ্রহ হৈল রাজা কেবা মন্ত্রিবর। বঙ্গসাহিত্যের পাঁজি কহ পূর্ব্বাবর।" এই কবিতা দেখিয়া যাহা ভাবিয়াছিলাম, শেষ পর্য্যন্ত গিয়াও দেখিলাম—তাহাই। অনেক ভাল কথাও বলিবার দোষে কেমন কেমন বোধ হইয়া থাকে, আবার অনেক মন্দ কথাও সাজাইয়া গুছাইয়া বলিতে পারিলে লোকে কাণ পাতিয়া শুনে। ঠাকুরদাস বাবু মাসিকপত্রে তাহার

অনেকগুলি উদাহরণ দেখাইয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধটিও এইরূপ একটি উদাহরণ বটে।

সাহিত্য। ভাদ্র। এই সংখ্যায় আট ছত্র মাসিক সাহিত্য সমালোচনা সমেত দ্বাদশটি প্রবন্ধ পত্রস্থ হইয়াছে। কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'ভানুমতী' নামক গদ্য পদ্যময় ক্রমশঃপ্রকাশ্য প্রবন্ধ এবারেও শেষ হইল কিনা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এই প্রবন্ধে কবি অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর খণ্ডচিত্রের সমাবেশ করিয়াছেন, ঝটিকা ও জলপ্লাবনে কবির প্রিয়তম জন্মভূমি চট্টলপ্রদেশ যে সময়ে সময়ে কিরূপে 'প্রকৃতির কুরুক্ষেত্র' রূপে শবসমাকীর্ণ প্রেতভূমিতে পরিণত হয় তাহারও মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্যপট উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিশ্বাস মহাশয়ের 'আশ্চর্য্য বৃষ্টি' প্রবন্ধে অনেক আশ্চর্য্য বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। চুণারে কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া আমাদিগের দিঘাপতিয়া রাজবংশের তৃতীয় কুমার কুমার শরচ্চন্দ্র রায় যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা নূতন লেখকের পক্ষে সবিশেষ গৌরবজনক; ভাষাপ্রয়োগকৌশলের সহিত বিষয়নির্ব্বাচন ও তথ্যসংকলনের অধ্যবসায় সংযোগ করিতে পারিলে রাজকুমার বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবেন। 'মহারাষ্ট্র সাহিত্য' বিষয়ে শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের প্রবন্ধ সাগ্রহে পাঠ করিয়াছি, তৃপ্তিলাভ করি নাই; আমরা তাঁহার নিকট এ বিষয়ে আরও বেশী করিয়া শুনিতে চাই। বর্ত্তমান সময়ে মহারাষ্ট্রে ও বঙ্গদেশেই দেশীয় সাহিত্যের যথাযোগ্য উন্নতি সাধনের চেষ্টা চলিতেছে; সে চেষ্টা বঙ্গদেশে কি ভাবে চলিতেছে, কি ফল প্রসব করিতেছে, তাহা সকলেই দেখিতেছি। মহারাষ্ট্রেও এ বিষয়ে আমাদের ন্যায় ফল (!) ফলিতেছে কিনা তাহাই বিশেষ করিয়া জানা আবশ্যক। স্বর্গীয়া প্রমীলা নাগের একটি কবিতা এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে; বোধ হয় মৃতের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের জন্যই উহা পুনরায় 'সাহিত্যে' স্থানলাভ করিয়াছে। কারণ, ১৩০৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে এই কবিতাটীর অধিকাংশভাগ ক্ষুদ্রাক্ষরে সাহিত্যপত্রেই একবার প্রকাশিত হইয়াছিল; এবার তাহাই কিছুকিঞ্চিৎ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত কলেবরে পুনরায় সাহিত্যপত্রেই স্থানলাভ করিয়াছে; অথচ সম্পাদকীয় টীপ্পনী না থাকায় ইহার কারণ স্পষ্ট বোধগম্য হইতেছে না। সংশোধন ও পরিবর্দ্ধনকার্য্য কাহার? কবে উহা সম্পাদিত হইয়াছিল? এ সকল কথা জানিতে পারিলে সাহিত্যসমাজ কবিজীবনের আরও একটু আভাস পাইতে পারিত। বোধ হয় সম্পাদক মহাশয় তাহা কাহাকেও জানিতে দিতে চাহেন না!

আশা।

এ জীবনসূর্য্য যবে অস্তে গেল চলি,
হে বঙ্গজননী মোর, "আয় বৎস," বলি
খুলি দিলে অন্তঃপুরে প্রবেশ-দুয়ার,
ললাটে চুম্বন দিলে; শিয়রে আমার
জ্বালিলে অনন্ত দীপ। ছিল কণ্ঠে মোর
একখানি কণ্টকিত কুসুমের ডোর
সঙ্গীতের পুরস্কার, তারি ক্ষত জ্বালা
হৃদয়ে জ্বলিতেছিল,—তুলি সেই মালা
প্রত্যেক কণ্টক তার নিজ হস্তে বাছি
ধূলি তার ধুয়ে ফেলি শুভ্র মাল্যগাছি
গলায় পরায়ে দিয়ে লইলে বরিয়া
মোরে তব চিরন্তন সন্তান করিয়া।
অশ্রুতে ভরিয়া উঠি খুলিল নয়ন;
সহসা জাগিয়া দেখি—এ শুধু স্বপন!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দেশীয় শিল্প।

নূতন শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনের উন্মেষ হইতে আরম্ভ করিয়া প্লীহা-ফাটা পর্য্যন্ত নানা কারণে আমাদিগের যতটা চেতনা জন্মিয়াছে তাহাতে আমরা বুঝিয়াছি যে কুলক্রমাগত কেরাণীগিরিতেই অখণ্ড মনোযোগ প্রদান করিলে ক্রমে অন্নাভাবে আমাদিগের দুর্ব্বল হস্তে দরখাস্ত লিখিবার বলেরও অভাব হইবার সম্ভাবনা অত্যন্তই অধিক। সেই জন্য আমরা দেশীয় শিল্পের উন্নতিবিধানে চেষ্টিত হইতেছি। এ চেষ্টায় যে বিশেষ ফলোদয় হইয়াছে, এমন কথা বলিতে পারি না; বরং কাপড়ের

কল হইতে দেশলাইয়ের কল-পর্য্যন্ত অনেকগুলি যৌথকারবারে সহস্রারম্ভে এরূপ হাস্যাস্পদ লঘুক্রিয়া হইয়া গিয়াছে যে, আশঙ্কা হয়—ক্রমে আর সেরূপ কারবার করিবার কথা বলিতেও সাহসে কুলাইবে না। অপ্রিয় সত্য হইলেও এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, এদেশে যত কল কারখানা বিদেশীয়ের হস্তেই উন্নতিপ্রাপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে, হাতের কাছে মালমসলা পাইলেও এবং এদেশে শ্রমজীবিগণের পারিশ্রমিক অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও আমরা কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই। বোধ হয় মিষ্টার টি, এন মুখোপাধ্যায় ভিন্ন আর কেহ দেশীয় শিল্পের উন্নতিবিধানে তেমন সফল চেষ্টাও করেন নাই।

এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে দোষ দেওয়াও সম্পূর্ণ সঙ্গত নহে। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে উদাসীন নহেন। তবে দেশীয় শিল্পের উন্নতিবিধানে গবর্ণমেণ্টের সমধিক চেষ্টা করিবার দুইটি বিশেষ অন্তরায় আছে—ইংলণ্ডের ব্যবসাদার জুজুর ভয় ও অবাধ বাণিজ্যের প্রতি অসাধারণ অধিক শ্রদ্ধা। ম্যাঞ্চেষ্টারের জুজুর ভয়ে এ দেশের সূতা সম্বন্ধীয় বিধির কথা অবিদিত নহে। এখানে অবাধ বাণিজ্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক হইবে।

ইংরাজের পক্ষে অবাধ বাণিজ্য একান্তই আবশ্যক। কলে আর যাহাই হউক ধান্য বা যব বা গম উৎপন্ন হয় না। আবার শরীর-ধারণ-জন্য ঐ দ্রব্যগুলির আবশ্যক হয়; কাজেই দেশে উৎপন্ন শস্য দেশবাসীদিগের পক্ষে যথেষ্ট না হইলেই তাহা বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। যাহাদিগকে বিদেশ হইতে শস্য আমদানী করিতে হয়, তাহাদিগের পক্ষে অবাধ বাণিজ্য যে একান্তই আবশ্যক এ কথা বোধ করি আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। কল কারখানার কাজেই ইংরাজের প্রাধান্য। আশ্রিত ও অনুগত দেশসমূহে সেই সকল শিল্পজাত বিক্রয় করিয়াই ইংরাজ এত ধনশালী। সে সকল বিক্রয়ের জন্যও অবাধ বাণিজ্যবিশেষ আবশ্যক। যে সকল দেশের অবস্থা ইংলণ্ডের অবস্থা হইতে ভিন্ন প্রকারের সে সকল দেশে বিদেশ হইতে আমদানী মালের উপর কর আদায় করা হইয়া থাকে;—দৃষ্টান্ত স্বরূপে জার্ম্মাণী ও রুশিয়ার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অবাধ বাণিজ্য-

বিরোধী হওয়া সম্ভবপর নহে। অথচ কোন নূতন শিল্পের উন্নতির জন্য বিদেশ হইতে আনীত সেই শিল্পজাতের উপর কর বসান নিতান্তই আবশ্যক; কেন না বহুকাল কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া পুরাতন ব্যবসায়ী যে দক্ষতা অর্জ্জন করেন, নব ব্রতীর পক্ষে তাহা সহজপ্রাপ্য নহে। কথিত আছে কেম্ব্রিজের তৃণমণ্ডিত সুন্দর প্রান্তরাংশের কথায় সেখানকার মালী বলিয়াছিল তাহা কেবল শত শত বৎসরের "Mowing and rolling, rolling and mowing"এর ফল। ব্যবসায় সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা বলা যাইতে পারে—দক্ষতা বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফল, এক দিনে তাহা লাভ করিবার কোন উপায় নাই। রেশমের কথাই ধরা যাউক। এক রেশম হইতেই নানা বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। এক চালান রেশমের উৎকৃষ্ট অংশ হইতে উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি, মধ্যমাংশ হইতে মধ্যম প্রকারের বস্ত্রাদি ও অবশিষ্ট নিকৃষ্ট অংশ হইতে নিকৃষ্ট প্রকারের বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়; যে গুলি নিতান্তই উজ্ঝিত হয় সেগুলিও পাটের সহিত মিশিয়া বর্ণ-বৈচিত্র্যবহুল Rug প্রভৃতিতে পরিণত হয় ও অনায়াসেই দুই চার টাকায় বিক্রয় হইয়া যায়। এই যে উপস্থিত মালমসলার সকল অংশই সমান ভাবে অর্থে পরিণত করিবার কৌশল এইটিই শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ। পাকা ব্যবসাদার এইটুকুই বিশেষ বুঝে—সে কোন দ্রব্যই সহজে ত্যাগ করিতে চাহে না, এবং সস্তা জিনিস হইতেই মূল্যবান জিনিস প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করে। তুমি আমি প্রভাতী সংবাদপত্রখানি পাঠ করিয়া ফেলিয়া রাখি, অপরাহ্নে তাহা গৃহকোণে আবর্জ্জনার মধ্যে আশ্রয় পায়। পর দিন ভৃত্য সেখানি লইয়া যাইয়া ঘর পরিষ্কার করিয়া দেয়। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না যে আমরা আফিসে বা আদালতে চলিয়া গেলে ভৃত্য ঐ কাগজগুলি সের দরে বিক্রয় করে এবং সে গুলি যখন কোন কাগজের কলে যাইয়া পুনরায় সাদা রং লইয়া আসে, তখন আমরাই আবার মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লিখিবার জন্য সেই কাগজ দিস্তা দরে ক্রয় করি। পাকা ব্যবসাদার যথাসম্ভব সস্তা দ্রব্য হইতেই মূল্যবান দ্রব্য প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করে।

এইরূপে, সস্তা দ্রব্য ব্যবহার করিতে শিখিতে ও মালমসলার সকল অংশ নানারূপে ব্যবহার করিবার উপায় জানিতে আমাদিগের অনেক দিন

যাইবে। তত দিন আমরা কিছুতেই বিদেশ হইতে আমদানী মালের সঙ্গে সস্তা দরের প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিব না। এই জন্যই কোন নূতন শিল্পের উন্নতির জন্য বিদেশ হইতে আমদানী মালের উপর কর ধার্য্য করা আবশ্যক। কিন্তু পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে জাতীয় স্বার্থনাশের আশঙ্কায় ও ইংলণ্ডের ব্যবসাদার জুজুর ভয়ে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বিদেশ হইতে আমদানী মালের উপর কর ধার্য্য করিতে অসমর্থ। তবে উপায় কি? উপায় যে নাই এমনও নহে। এখন কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে হইলে আমাদিগকে দুইটি কাজ করিতে হইবে; প্রথমতঃ যে বিশ্বাস ও ব্যবসায় সাধুতা ভিন্ন যৌথকারবার চলিতে পারে না তাহার অনুশীলন করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ কিছু অধিক মূলধন লইয়া ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে যে, প্রথম দুই চারি বৎসর লাভ না পাইলেও ব্যবসায় চালান যায়—একেবারে হাল ছাড়িয়া দিতে না হয়। এইরূপ কোন প্রকারে কিছু দিন টিকিয়া থাকিতে পারিলে ব্যবসায়ের নানা বিভাগে যে দক্ষতা জন্মিবে তাহার ফলে মালমসলার সম্যক্ সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। তখন বিদেশ হইতে আমদানী মালের সঙ্গে প্রতিযোগিতা সম্ভব হইবে। এদেশে শ্রমজীবিগণের পারিশ্রমিক যেরূপ সুলভ তাহাতে বিদেশীয় ব্যবসায়ী-দিগের অপেক্ষা এক বিষয়ে যে আমাদিগের অধিক সুবিধা হইবে তাহা নিঃশঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

কিছু অধিক মূলধন লইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার আর একটা কারণ এই যে, তাহা হইলে বাজারের আবশ্যক মত মাল সরবরাহ করা যায়। প্রথম চালানের দ্রব্যগুলির বিক্রয়লব্ধ অর্থ লইয়া দ্বিতীয় চালান-দ্রব্য প্রস্তুত হইবে এইরূপ স্থির করিলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষেরই বড় অসুবিধা। আবশ্যকোপযোগী মাল সরবরাহ করিতে না পারাও আমাদিগের দেশে ব্যবসায়ের বিশেষ ক্ষতি করে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রধানতঃ দুই কারণে গবর্ণমেণ্ট বিদেশ হইতে আমদানী মালের উপর কর ধার্য্য করিতে অসমর্থ। সে দুইটি কারণ ভিন্ন আরও একটি কারণ আছে যেজন্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সেরূপ কর ধার্য্য করা অসম্ভব। যত দিন পয়সায় পঁচিশ সুচ ও তিন দেশলাইয়ের জন্য

আমাদিগকে অপর দেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে তত দিন সেরূপ কর ধার্য্য হইলে আমাদিগের উপায় কি হইবে তাহাও ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। এক টাকার জিনিস আঠার আনায় কিনিতে হইলে তুমি আমি দুই চার বৎসর সংসার চালাইতে পারি, কিন্তু সকলে পারে কি? সমাজের একটা অংশ আছে যেখানে সাময়িক পত্র বা সাবান, কোট বা কাব্য-আলোচনা, চাপকান বা চাপান কিছুই নাই—নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলির দর চড়িলে সে অংশের কি উপায় হইবে? মহাজনের নিকট ঋণে আকণ্ঠনিমজ্জিত যে কৃষকগণ পান্ত ও কড়কড় ভাতে অর্দ্ধাশনে পরিশ্রম করিয়া তোমার আমার অন্ন জুগাইতেছে, তাহারা দারিদ্র্যের যে সীমায় উপনীত হইয়াছে সেখানে দুর্ভিক্ষের প্রথম তপ্ত বায়ুতেই তাহারা দলবদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের দর চড়িলে তাহাদিগের উপায় কি হইবে? অথচ তাহারাই সমাজের একটা প্রধান অংশ—তাহাদের একটা বিশেষ Passive force আছে। তাহাদিগের দুর্দ্দশায় সমাজের দুর্দ্দশা। উদর ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিবাদের গল্প বোধ করি আর বলিয়া দিতে হইবে না—সে কথা সর্ব্বজনবিদিত। উদরের দুর্দ্দশায় যেমন সর্ব্ব শরীরের দুর্দ্দশা, "মাসের" দুর্দ্দশায় তেমনই সমাজের দুর্দ্দশা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আমাদিগের দিক হইতে দেখিলেও বিদেশ হইতে আমদানী মালের উপর কর ধার্য্য করার অনুমোদন করা যায় না।

অনেকে বলেন যে, ইংরাজ-বণিক কেবল ব্যবসাদারের স্বার্থের জন্য ভারতবর্ষ রাখিয়াছে; ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের পণ্যজাত বিক্রয় হয় ইহাই স্বার্থ। কথাটা পূর্ব্বে সত্য ছিল বটে, কিন্তু এখন আর সত্য নহে। ভারত-বর্ষে ইংরাজের পণ্য বিক্রয় ত হইয়াই থাকে, তদ্ভিন্ন এদেশে অনেকগুলি ইংরাজের উদরান্নের উপায় হয়। ইহা ভিন্ন আরও একটা কথা আছে; ব্যবসাদারের ছেলে যেমন কিছু টাকা পাইয়া জমিদারী কিনিয়া জমিদার হয়, ইংরাজ জাতি এখন তেমনই ব্যবসায়ের জন্য নানা দেশে যে সকল স্থান ক্রমে ক্রমে অধিকার করিয়া বসিয়াছে সেগুলি লইয়া একটা অতি বৃহৎ সাম্রাজ্য ফাঁদিয়াছে। ভারতবর্ষ সে সাম্রাজ্যের একটা প্রধান অংশ, ইংরাজের গর্ব্বের বিষয়। প্রজার প্রণাম যে একবার পাইয়াছে, সে আর

সহজে তাহা ছাড়িতে চাহে না। John Bull and his Island প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা "ম্যাক্স ওরেল" ইংরাজের কথায় বলিয়াছেন "From Aden on the other side of the Indian Ocean, he can quietly contemplate the finest jewel in his crown, the Indian Empire, an Empire of two hundred and eighty-five millions of people ruled by princes literally covered with gold and precious stones who black his boots and look happy."

এই ভারত সাম্রাজ্য এক দিনেও সংস্থাপিত হয় নাই, অল্প চেষ্টাতেও অধিকৃত হয় নাই। কাজেই ইহা সহজে ছাড়িবারও নহে ;——

"——মাটি কাটি লভি কহিনুর,
ফেলিয়া সে রত্ন হায়!
কে ঘরে ফিরিয়া যায়,
বিনিময়ে অঙ্গে মাটি মাখিয়া প্রচুর?"

সমস্ত ভারতবর্ষটাকে দোহনাতিশয্যে দারুণদারিদ্র্যপীড়িত করিয়া মহীশূর রাজ্যের মত কাহাকেও প্রত্যর্পণ করা যে ভারত গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে তাহা বোধ করি আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। দেশ রাখিতে হইলে দেশের লোকের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক এটুকু আমাদের মত ভারত গবর্ণমেণ্টও বিলক্ষণ বুঝেন। বুঝেন বলিয়াই ইংরাজ জাতির স্বার্থহানী ও ব্যবসাদার জুজু—এতদুভয়ের ভয় সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্টের যেটুকু সাধ্য গবর্ণমেণ্ট সেটুকু করিয়াছেন। দেশীয় শিল্পের উন্নতির দিকে আমাদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে (দোকানদার শ্বেতাঙ্গের মত কাণ ধরিয়াই বটে), গবর্ণমেণ্ট চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। অন্য উপায়ে এবং সময়ে অসময়ে গালি দিয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা এ বিষয়ে আমাদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছেন। প্রথম ধাক্কা গবর্ণমেণ্টই দিয়াছেন। সে ধাক্কাতেও যদি আমাদিগের চৈতন্য না হয় তবে দোষ আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের নহে।

যদি আমরাই পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে না পারি, যদি আমাদিগের ভিক্ষার ঝুলিতে গবর্ণমেণ্টের শ্রদ্ধায় বা অশ্রদ্ধায়, দয়ায় বা বিরক্তিতে প্রদত্ত

এক মুষ্টি চাউল না পড়িলে কিছুতেই আমাদিগের উদরান্নের উপায় না হয়, যদি আমাদিগের জাতীয় হৃদয় হইতে মনুষ্যত্বের শেষ শক্তিও এমনই বিলুপ্ত হইয়া যাইয়া থাকে যে অপরের স্কন্ধে ভর না দিয়া আমরা আর দাঁড়াইতে অসমর্থ হই,—তবে আর সভা সমিতিতে ভিখারীর করুণ ক্রন্দনে আমাদিগের শৈলাবাসপ্রিয় রাজপুরুষদিগের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দোৎসবরস না ডুবাইয়া ও আপনাদিগের হীনতা আরও সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত না করিয়া আমাদিগের পক্ষে বলবদ্ধ হইয়া উৎসন্ন হওয়াই বিধি।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

বিশ্ব-রচনা।

শুধু চক্ষে যে সকল তারা দেখা যায় তাহাদের মধ্যে একটি মাত্রে যতখানি আকাশ অধিকার, অর্থাৎ এরূপ একটি তারা হারাহারী যতখানি আকাশের মধ্যে আছে, সেই পরিমাণে সূর্য্যকে মাঝারে রাখিয়া একটি গোল মনে মনে অঙ্কিত কর। কথাটা এই হইল যে তারা-জগতের যে অংশ ছয় হাজার উজ্জ্বলতর তারা দ্বারা ব্যাপৃত, সেই অংশকে যদি ছয় হাজার ভাগ করা যায়, তবে এরূপ এক ভাগ আকাশ সূর্য্যপরিতঃ উক্ত কল্পিত গোলের সমান হইবে। উজ্জ্বলতর বলিবার তাৎপর্য্য এই যে আরও অনেক তারা আছে সেগুলি তত উজ্জ্বল নহে বলিয়া আমরা শুধু চক্ষে দেখিতে পাই না, এবং সে গুলির কথা এ প্রস্তাবে সম্প্রতি পাড়া যাইতেছে না। এখন উক্ত কল্পিত গোলের ব্যাস পরিমাণ কত ধরিতে পারা যায়? সকল তারা অপেক্ষা যে তারাটি আমাদের খুব নিকট, সেই তারার দূরত্ব উক্ত গোলের ব্যাসার্দ্ধ হইতে বড় তফাৎ হওয়া সম্ভবপর নহে। এই দূরত্ব বা ব্যাসকে আমাদের গজ মনে কর, অর্থাৎ ইহাকে একক বলা যাউক। অনন্তর পূর্ব্ববৎ রবিকে

মধ্যস্থলে রাখিয়া উক্ত এককের হিসাবে ৩, ৫, ৭, ৯ ইত্যাদি পরিমিত ব্যাসার্দ্ধ লইয়া, উত্তরোত্তর বৃহত্তর গোল অঙ্কিত কর। গোলের ঘনফল তদীয় ব্যাসের ঘনের অনুপাতী; অতএব প্রথম গোলের ব্যাস ১ ধরা হইয়াছে উহার ঘনফল ১এর ঘন ১ই হইল। এই গোলের সংজ্ঞা কর, একক গোল এবং অপর গোলগুলিকে ক্রমান্বয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি গোল বল। অতএব প্রথম গোল হইবে ৩×৩×৩= ২৭, অর্থাৎ একক গোলের ২৭ গুণ, সুতরাং এই গোলটি ২৭ তারার পক্ষে পর্য্যাপ্ত স্থান হইতে পারে। দ্বিতীয় গোল হইবে ৫×৫×৫=১২৫, অর্থাৎ ইহা একক গোল অপেক্ষা ১২৫ গুণ বড়, সুতরাং ইহাতে ১২৫ তারা থাকিবার স্থান হইতে পারে। উত্তরোত্তর বৃহত্তর গোলের ঘনফল এইরূপ হিসাবে পাইবে।

পার্শ্বস্থ চিত্র ১১ ব্যাসার্দ্ধ পরিমিত গোল পর্য্যন্তের পরিলেখের কিয়দংশ। মাঝারের উপর দিকে দুই দুই গোলের অন্তর্গত স্থানে ভিন্ন ভিন্ন তারা শ্রেণীর নাম অঙ্কিত হইয়াছে। মাঝারের অধোভাগে সদৃশ স্থানে যে গোলে যত তারা ধরিতে পারে তাহার সংখ্যা দেওয়া গেল। সংখ্যার হিসাব এইরূপ ধরিতে হইবে, যথা যে, গোলের ৭মিত ব্যাস তাহাতে ৭×৭×৭=৩৪৩ তারার জায়গা, কিন্তু ভিতরের গোলে ৫×৫×৫=১২৫ তারার স্থান বাদ দিলে, বাকি রহিল ২১৮ তারা; এই ২১৮ তারা ৫ ও ৭ ব্যাসার্দ্ধ মিত গোলদ্বয়ের অন্তর্গত।

হর্সেলের দূরত্বের ক্রমব্যঞ্জক-ছেদ্যক।

এই ভিন্ন ভিন্ন তারাস্তরের ব্যবধানকে হর্সেল শ্রেণী নাম দিয়াছিলেন, এবং প্রথম ও তৃতীয় গোলের মধ্যগত তারাগণের দূরত্বকে প্রথম শ্রেণীর দূরত্ব, তৃতীয় ও পঞ্চম গোলের মধ্যগত তারাগণের দূরত্বকে দ্বিতীয় শ্রেণীর দূরত্ব, এবং এইরূপে অন্যান্য গোলদ্বয়ের অন্তর্গত তারাগণের দূরত্ব যথাক্রমে

শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন গোলের অন্তর্গত তারাগণের স্থানের সহিত তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সংখ্যা তুলনা করিয়া হর্সেল দেখিয়াছিলেন যে,

দূরত্বের ক্রম	যত তারার জায়গা হইতে পারে তাহার সংখ্যা।	ঔজ্জ্বল্যের শ্রেণী।	তত্তৎ শ্রেণীর তারার বাস্তব সংখ্যা।
১	২৬	১	১৭
২	৯৮	২	৫৭
৩	২১৮	৩	২০৬
৪	৩৮৬	৪	৪৫৪
৫	৬০২	৫	১১৬১
৬	৮৬৬	৬	৬১০৩
৭	১১৭৮	৭	৬১৪৬
৮	১৫৩৮		

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে তারাগণের গণিত দূরত্বের ক্রম, আর সাধারণ নিয়মানুসারে তারাগণের উজ্জ্বলতার তারতম্যের পরিমাণ দেখিয়া তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করা, এই উভয়ের কোন সামঞ্জস্য নাই। পরন্তু হর্সেল বলেন যে, যে পদ্ধতি অবলম্বন পূর্ব্বক তিনি দূরত্বের হিসাব করিয়াছেন, সে পদ্ধতি তারাগণের উজ্জ্বলতা অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করার পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; এবং তজ্জন্য এই অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। তাঁহার ব্যবহৃত দূরত্বের ক্রম যোগশ্রেঢ়ী অনুসারী, আর ঔজ্জ্বল্যের ক্রম গুণশ্রেঢ়ী অনুসারী; সেই জন্য ষষ্ঠ শ্রেণীর তারাগণের, অষ্টম নবম বা দশম শ্রেণীর দূরত্বের সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ দীপ্তি সম্বন্ধে প্রথম শ্রেণীর তারাকে তদীয় বাস্তব দূরত্ব হইতে আট, নয়, বা দশ গুণ তফাতে অন্তরিত করিলে ষষ্ঠ শ্রেণীর তারার মত দেখাইতে পারে।

মন্দাকিনী ঊর্দ্ধে কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাহার ইয়ত্তা করিবার অভিপ্রায়ে হর্সেল পূর্ব্বোক্ত দূরত্ব পরিমাণের উপায় অবলম্বন করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, তাহার ২০ ফুট দূরবীক্ষণের পক্ষে মন্দাকিনী অনবগাহ্য। তাঁহার দূরবীক্ষণ ৯০০ তম শ্রেণীর দূরত্ব পর্য্যন্ত ভেদ করিতে পারে, অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর তারাগণ যতদূরে আছে তাহার ৯০০ গুণ দূর পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিতে সক্ষম। বোধ হয় তিনি তাঁহার ৪০ ফুট দূরবীক্ষণ দ্বারা দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত পরীক্ষণ করেন নাই। যাহা হউক তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, মন্দাকিনীর গভীরতা পরিমাণ পক্ষে ২০ ফুট দূরবীক্ষণ, আর ৪০ ফুট দূরবীক্ষণ, উভয়ই অকিঞ্চিৎকর।

যিনি সমস্ত প্রাচীন আচার্য্যগণ অপেক্ষা ব্রহ্মাণ্ডের গুহ্যতর প্রদেশ ভেদ করিয়া অচিন্তিত-পূর্ব্ব তারারত্নিচয়ের পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, সেই দেবোপম অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিদ কেবল এই মাত্র সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহার দূরবীক্ষণের দেখিবার শক্তি যত দূর আছে, তাহা অতিক্রম করিয়া প্রভূত দূর পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত আছে। অন্ততঃ মন্দাকিনীর দিকে যে ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপ্তি অপরিমেয় তাহার সন্দেহ নাই। তারা-জগতের সীমা সম্বন্ধে কোন সুপরিচ্ছিন্ন মত অভিব্যক্ত না করিয়া তিনি এই মাত্র বলিয়া স্বীয় পরিশ্রমের পর্য্যাবসান করিলেন। হর্সেলের বিশ্বাস অনুসারে অন্তরিক্ষ ভেদ করিয়া যতদূর পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি গিয়াছিল, ততদূর হইতে আলোকের ভূমণ্ডলে উপনীত হইতে ১৪ হাজার বৎসর, বা তদপেক্ষা অধিক কাল লাগে। অর্থাৎ পূর্ব্বে বলা হইয়াছিল যে, তারাজগতের উপান্ত হইতে আলোকের এখানে আসিতে ৭০০০ বৎসর লাগে, এখন দেখা গেল তাহার দ্বিগুণ ১৪ হাজার বৎসর লাগে। পরিদৃশ্যমান সুদূরবর্ত্তী জগতের সীমা হইতে আলোক ভূলোকে আগমন করিতে করিতে যে সহস্র সহস্র বর্ষ অতিবাহিত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। পরন্তু স্বীকার করিতে হইবে যে, সমস্ত তারা প্রকৃত পক্ষে সমান উজ্জ্বল, হর্সেলের এ অনুমান ভ্রমাত্মক, এবং এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তিনি যে মন্দাকিনীর বিস্তৃতি ধরিয়াছেন তাহা বাস্তব বিস্তৃতি অপেক্ষা অত্যধিক। দূরবীক্ষণের ভিতর দিয়া যে সকল ধূলি কণার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারা দেখা যায়, সে গুলি যদি সত্য সত্যই হারা-

রী উজ্জ্বলতর তারার সঙ্গে সমান হইত তাহা হইলে হর্সেলের অনুমান সুসম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করা যাইত। কিন্তু যদি বিশ্বের একটা সীমা কল্পনা কর আর হর্সেলের উপন্যাস গ্রহণ কর তবে উক্ত তারাগণের ক্ষুদ্রত্বের কারণ তাহাদিগের প্রভূত দূরত্ব বা তাহাদের আকার মানের বাস্তব স্বল্পতা ইহার কোন্‌টি ঠিক তাহা বলা যায় না। এবম্ভূত সংশয় সত্ত্বেও প্রক্টরপ্রমুখ কতিপয় জ্যোতির্ব্বিদ বলেন যে, তারাজগতের অর্থাৎ মন্দাকিনীর রচনা প্রণালী সম্বন্ধে তারামানের দ্বিতীয় পদ্ধতি দ্বারা হর্সেলের মত আমূলতঃ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমূলতঃ পরিবর্ত্তনের কোন প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। যদিও এ বিষয়ে হর্সেল স্বীয় মত স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন নাই, তথাপি তারা-বিন্যাস সম্বন্ধে তাঁহার শেষ পত্রে [১৮১৭ অব্দের] অনেক স্থলের লেখা দেখিয়া বোধ হয় যে তিনি তখন বিশ্বাস করিতেন যে, তারা-জগৎ পূর্ব্ব-বর্ণিত মৎস্যাকার এবং তদনুসারে তিনি অনুমান করিতেন যে, তারা-স্তূপ গুলি মন্দাকিনীর শাখা প্রশাখা ব্যঞ্জকা, অবশ্য তিনি গবেষণার জন্য পন্থান্তর অবলম্বন করিয়াছিলেন পরন্তু নব প্রণালীর ফল স্থূলতঃ প্রাচীন প্রণালীর ফল হইতে অভিন্ন ছিল।

শ্রীমাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের ইংরাজী।

অনবগাহ্য,	Unfathomable.		
আমূলতঃ	Radically.	ভূমি,	Base.
উপন্যাস,	Hypothesis.		
		যোগশ্রেঢ়ী,	Arithmetical progress.
কলা,	Minute (angular)		
		বিন্দু,	Apex.
গুণশ্রেঢ়ী,	Geometrical Progression		
ছেদ্যক,	Illustration.		

পরলোক।

১

বলোনা মিথ্যা, বলোনা ভাই,
মিনতি তোমারে করি।
দারুণ তপ্ত, তিয়াসী জনের—
স্নিগ্ধ শীতল বারি।
অনল-দহনে শীতল প্রলেপ ;
চন্দ্র-কিরণ-রাশি,
নিশি-সীমন্তে দিক্ দিগন্তে
ফুটিছে আঁধার নাশি।
দূরে যায় তাপ, দূরে যায় পাপ
দূরে যায় দুঃখ শোক।
মুগ্ধ নয়নে হেরিছে জগৎ
কি মহান্ পরলোক!

২

ফুলটি যখন শুকাইয়া ঝরে,
কিছু কি থাকে না তার?
পবন সনে কি, মিশায় পাখীর
সঙ্গীত সুধাধার?
কত অখ্যাত জীবন-কাহিনী,
কতই বেদনা রাশি,
সুখে দুঃখে কত নয়নের জল,
কত অশ্রু, কত হাসি,
কত প্রাণ নিতি, উঠিছে ফুটিয়া,—
ফুল সম যায় ঝরি

বলোনা মিথ্যা, বলোনা ভাই,
মিনতি তোমারে করি।

৩

ক্ষুদ্র ধূলি কণা, হিমবিন্দু, আর
উচ্চ হিমালয় গিরি,
সকলি যতনে রেখেছে প্রকৃতি
বিশ্ব ঝুলিতে পূরি।
নদী, তারা, শশী, রবি, ঊষা, নিশি,
অরণ্য, লোকালয়,
প্রকৃতির সবি গৃহ-সামগ্রী
কিছুই বৃথা নয়।
একালে সেকালে যত কিছু সব
ভাগে ভাগে স্তরে স্তরে
কৃপণ জনের ধনের মতন
গুছান তাহার ঘরে!
বিজ্ঞানে কহে ধূলি বৃথা নহে
বৃথা নহে এই দেহ,
বৃথা কি কেবল অমর জীবন,
অবিনাশী প্রেম, স্নেহ?

৪

ছেলে কেঁদে এলে চুমিয়ে বদন
মা মুছান আঁখি-নীর।
এপারে নদীর রহেছি দাঁড়ায়ে,
নাহি কি অপর তীর?
হল ধূলাখেলা, ফুরাইল বেলা
শ্রান্ত হয়েছি ভাই,
ঘুমাতে পাবনা জননীর ক্রোড়ে
গৃহ কি মোদের নাই?

প্রকৃতি মায়ের কি গুছান ঘর
কিছুরি অভাব নাই ;
তৃষ্ণায় মিলে শীতল সলিল,
ক্ষুধায় আহার পাই।
কত দয়া স্নেহ কত ভালবাসা
কত হাসি—অশ্রুধার,
যত ব্যয় তত আয় চিরদিন
অক্ষয় এ ভাণ্ডার।
মায়ের নিকটে দারুণ তৃষ্ণায়
পাবনা শীতল বারি?—
বলোনা ওকথা, বলোনা ভাই,
তোমারে মিনতি করি।

৫

আয় অনাথিনী, আয় কাঙ্গালিনী
কে তোরা আছিস্ আয়
চিরবাঞ্ছিত সে সুখের দেশ
ওই দেখ্ দেখা যায়।
কল্পনা নহে নহে উপহাস
নহে অসত্য বাণী ;
ফিরে পাবে পুনঃ বাঞ্ছিত নিধি—
অনাথিনী কাঙ্গালিনী।
হারানো বাছারে দিবি মা চুম্বন
ভরিবে শূন্য ক্রোড়।
দুঃখিনী যে পদ করিস্ ধেয়ান
পাবি সে চরণ তোর।
দেখ চেয়ে দেখ পোহালো রজনী
মধুর অরুণালোক—

তরী বেয়ে চল দূরে দেখা যায়
কি মহান্ পরলোক!
নহে অসত্য, নহে কল্পনা
নয়নে দেখেছি আমি,
শুনেছি শ্রবণে সেথাকার বাঁশী
শুনিতেছি দিবা যামী!
ত্যজি ধরাতল, ওঠ ভাই বোন্
দূরে গেল দুঃখ শোক,
চির পবিত্র আনন্দময়
প্রেমময় পরলোক!

শ্রীসরলাবালা দাসী।

ইবন বতুতের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।*

খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহম্মদ তোগলক দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি সুশিক্ষিত ও নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। দর্শন শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানী ও মুসলমান ধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাসী বলিয়া লোকে তাঁহার সুখ্যাতি করিত। কিন্তু তাঁহার ন্যায় অস্থিরমতি ও কল্পনামত্ত নৃশংস সম্রাট্ দিল্লীর সিংহাসনে কখনও আরোহণ করেন নাই। তাঁহার রাজত্ব-কালে মুসলমানের অত্যাচারের মাত্রা চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল।

যে সময় সুলতান মহম্মদ তোগলকের অমানুষিক অত্যাচার-স্রোতে ভারতবাসীর সুখশান্তি ভাসিয়া যাইতেছিল তৎকালে ইবন বতুত নামক একজন পর্য্যাটক এদেশে আগমন করেন। ইবন বতুত আফ্রিকার অন্তর্গত ট্যানজিয়ারসের অধিবাসী। তিনি এসিয়ার অধিকাংশ স্থান দর্শন করিয়া অবশেষে ভারতবর্ষে উপনীত হন। এবং স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আপন ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভারত-

* Elliot's History of India, Vol. III.

বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহার পক্ষে কোন বিষয় অতিরঞ্জিত অথবা গোপন করিবার কারণ বিদ্যমান ছিল না। যাঁহারা সুলতান মহম্মদ তোগলকের বিবরণ নিরপেক্ষ ভাবে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের ইবন বতুতের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠ করা কর্ত্তব্য।

মুসলমান ইতিহাসবেত্তাগণের ন্যায় এই বিদেশী পর্য্যাটকও মহম্মদকে নানা শাস্ত্রে পারদর্শী সুপণ্ডিত, কিন্তু কল্পনামত্ত নৃশংস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের পার্শ্বেই যে অরাজকতার বর্ণনা করিয়াছেন তাহা তাদৃশ নরপতির রাজত্বেই সম্ভবপর। যদিচ এই সময় দেশ অরাজক ছিল তথাপি সীমান্ত প্রদেশ হইতে রাজধানী পর্য্যন্ত ঘোড়া ও আড়িন্দা (foot) ডাকের সুবন্দোবস্ত দেখিয়া ইবন বতুত চমৎকৃত হন।

ইবন বতুত সুলতান মহম্মদ তোগলকের দরবারে পরম সমাদরে গৃহীত হন। এই অপব্যয়ী দানশীল সম্রাট্ তাঁহার প্রতি অজস্র ভাবে রাজানুগ্রহ বর্ষণ করিলেও তিনি তাঁহার কঠোর ব্যবহার হইতে একবারে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার আগমন কালে সম্রাট্ দিল্লীতে উপস্থিত ছিলেন না। এ জন্য রাজমাতা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া মূল্যমান পরিচ্ছদ ও দ্বিসহস্র ডিনার (১) মুদ্রা উপহার দেন এবং তাঁহার অবস্থান জন্য একটি অট্টালিকা নির্দ্দেশ করেন। সম্রাট্ দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইবনকে আরও সমাদর করেন। এই সময় তাঁহাকে বার্ষিক পাঁচ হাজার ডিনার আয়ের কয়েকখানি গ্রাম, দশ জন ক্রীতদাসী, নগদ পাঁচ হাজার ডিনার ও সম্রাটের অশ্বশালার একটি সুসজ্জিত অশ্ব প্রদান করা হয়। ইহাই রাজানুগ্রহের শেষ নহে। ইবন বার্ষিক দ্বাদশ সহস্র ডিনার বেতনে একজন বিচারক নিযুক্ত হইয়া এক বৎসরের বেতন অগ্রিম প্রাপ্ত হন। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও দ্বাদশ সহস্র ডিনার উপহার স্বরূপ লাভ করেন। ইবন বতুত নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে রাজপ্রদত্ত উপহারের দশমাংশ কর্ত্তন করা হইত। কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে এই বিদেশী পর্য্যাটক পয়তাল্লিশ হাজার ডিনারের জন্য ঋণগ্রস্ত হইয়া আপন আর্থিক অসচ্ছলতার বর্ণনা করিয়া

(১) ডিনার এক প্রকার কল্পিত স্বর্ণ মুদ্রা; এক ডিনারের পরিমাণ তৎকালীন আড়াই শিক্কা।

একটি আরবী কবিতা সুলতানকে উপহার দিলে তিনি তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে প্রতিশ্রুত হন। তৎপর সুলতান দিল্লী পরিত্যাগকালে তাঁহার প্রতি আরও বদান্যতা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। কিন্তু ইহার পর ইবন একজন রাজানুগ্রহবঞ্চিত সেখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিয়া সুলতানের কোপ-দৃষ্টিতে পতিত হন। তিনি নিজের এই বিপদের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কৌতুকাবহ। আমরা নিম্নে তাহার অনুবাদ দিলাম।

"সুলতান চারিজন ক্রীতদাসকে দরবারগৃহে আমাকে দৃষ্টির বহির্ভূত না করিতে আদেশ করেন। এইরূপ আদেশ প্রচারিত হইলে কোন ব্যক্তি কদাচিৎ পরিত্রাণ লাভ করিয়া থাকে। আমি যে দিন ক্রীতদাসগণ কর্ত্তৃক প্রথম নজরবন্দী হই সে দিন শুক্রবার। "ঈশ্বরই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট; কি মহান্ পরিত্রাতা!" কোরাণোক্ত এই শ্লোকাংশ আবৃত্তি করিবার জন্য ঈশ্বরের আদেশ লাভ করি। সেদিন এই শ্লোকাংশ ৩৩০০০ হাজার বার আবৃত্তি ও সমস্ত রাত্রি দরবারগৃহে যাপন করি। প্রত্যহ আমি সমগ্র কোরাণ পাঠ করিয়া রাত্রিকালে কিঞ্চিৎমাত্র জল পান করিয়া উপবাস ভঙ্গ করিতাম। ষষ্ঠ দিন আমি কিঞ্চিৎ খাদ্য গ্রহণ করি। তার পর আরও চারি দিন ক্রমাগত উপবাস করি। সেখের মৃত্যুর পর আমি মুক্তি পাই। সর্ব্বশক্তিমান প্রভুকে ধন্যবাদ।" ইবন এই আকস্মিক বিপদপাতে এত দূর বিচলিত হন যে তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মালোচনায় জীবন যাপন করিতে নির্জ্জন স্থানে গমন করেন। কিন্তু সুলতান তাঁহাকে পুনর্ব্বার আহ্বান করিয়া দৌত্যকার্য্যে বরণ করতঃ চীন রাজ্যে প্রেরণ করেন।

আমাদের এই পর্য্যাটক ১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ১২ই তারিখে সিন্ধুনদের তীরে উপনীত হন। পঞ্চনদের তটদেশই সুলতান মহম্মদ তোগলকের রাজ্যের শেষসীমা ছিল। তৎকালে ভারতবর্ষে দুই প্রকার ডাক প্রচলিত ছিল। প্রথমতঃ ঘোড়ার ডাক। লোকে ঘোড়ার ডাককে উলক বলিত; রাজকীয় অশ্বের সাহায্যেই ইহার কাজ নির্ব্বাহ হইত এবং প্রত্যেক ৪ মাইল অন্তর অশ্ব পরিবর্ত্তন করিবার নিয়ম ছিল। তার পর আড়িন্দা ডাক (Foot post)। ইহার কাজ যে নিয়মে সম্পাদিত হইত ইবন তাহা বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রত্যেক ক্রোশ সম-

তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। লোকে ইহার এক এক ভাগকে "দাওয়া" বলিত। প্রত্যেক "দাওয়ার" শেষে জনাকীর্ণ পল্লী ও তাহার বহির্ভাগে তিনটি করিয়া তাম্বু ছিল। তথায় বাহকগণ তাহাদের কুক্ষিদেশ জড়াইয়া বাঁধিয়া এবং অগ্রভাগে পিতলের ঘণ্টাসংযুক্ত দুই হাত লম্বা লাঠি হাতে লইয়া রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিত। বাহকগণ এক হাতে ঘণ্টাসংযুক্ত লাঠি ও অপর হাতে পত্র লইয়া যথাসাধ্য বেগে দৌড়াইত। পরবর্ত্তী তাম্বুর লোক এই ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া প্রস্তুত হইত এবং পত্রবাহক তথায় পৌঁছামাত্র তাহাদের একজন তাহার হাত হইতে চিঠি লইয়া তাড়াতাড়ি দৌড়াইতে আরম্ভ করিত। সেও আবার পরবর্ত্তী তাম্বুতে না পৌঁছা পর্য্যন্ত শব্দ করিতে করিতে চলিত। নির্দ্দিষ্ট স্থানে না পৌঁছাতক ডাক-বাহকগণের এই ভাবেই চলিবার নিয়ম ছিল। উলক অপেক্ষা আড়িন্দা অধিকতর দ্রুতগামী ছিল। তখন ভারতবর্ষে খোরসান-জাত ফলের বড় আদর। খোরসানী ফলও অধিকাংশ সময়ে এই উপায়েই আমদানী করা হইত। বড় বড় কয়েদীদিগকেও এক স্থান হইতে আর এক স্থানে লইয়া যাইবার ইহা ব্যতীত অন্য বন্দোবস্ত ছিল না। তাহাদিগকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আসনে উপবেশন করাইয়া বাহকগণ মাথায় লইয়া গমন করিত। (১)

সংবাদদাতাগণ কোন অপরিচিত বৈদেশিকের আগমন-বার্ত্তা দিলে সুলতান তৎসম্বন্ধে সমস্ত বিষয় অবগত হইতেন। লেখকগণ আগন্তুক সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিবরণ প্রদান জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। তাঁহার আকৃতি

(১) একজন ঐতিহাসিক লেখক এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সংবাদ প্রেরণ করিবার আর এক প্রকার অদ্ভুত রীতির উল্লেখ করিয়াছেন। সুলতান মহম্মদ তোগলকের রাজত্বকালে দেবগিরি (দৌলতাবাদ) দিল্লীর সাম্রাজ্যের অন্যতম রাজধানী বলিয়া পরিগণিত ছিল। সুলতান এই দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী প্রত্যেক ডাকখানায় ঢক্কা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কোনও নগরে অত্যাবশ্যকীয় ঘটনা সংঘটিত অথবা উহার দ্বার উদ্ঘাটিত কি বন্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ ঢক্কানিনাদিত হইত। এই শব্দ শুনিয়া পরবর্ত্তী ঢক্কাতে শব্দ করা হইত। এই ভাবে সুলতান প্রত্যহ অত্যন্ত দূরবর্ত্তী নগর সমূহেরও দ্বার উদ্ঘাটন অথবা বন্ধের ঠিক সময় অবগত হইতে পারিতেন।

ও পরিচ্ছদের বর্ণনা, অনুচর ও ভৃত্যের সংখ্যা, ভ্রমণ ও অবস্থানের প্রণালী ও ব্যয়াদির বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গৃহীত হইত। কোনও বৈদেশিক পর্য্যটক ভ্রমণার্থ ভারতবর্ষে উপনীত হইলে সিন্ধুপ্রদেশের তদানীন্তন রাজধানী মুলতাননগর পর্য্যন্ত পৌঁছিলেই তাঁহাকে রাজদরবারে গমন করিবার জন্য সম্রাটের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত। সুলতান তাদৃশ আদেশ প্রদান করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা সম্বন্ধীয় উপদেশ না দিলে তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিতেন না। আমরা ইবনের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারি যে সুলতান মহম্মদ তোগলকের রাজত্বকালে বিদেশীয়দিগের প্রতি সম্মান ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবার এবং শাসন অথবা অন্য কোন বিভাগীয় উচ্চ পদে নিযুক্ত করিয়া অভিনব প্রণালীতে তাঁহাদের পদমর্য্যাদা রক্ষা করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। তাঁহার অধিকাংশ পারিষদ, গৃহাধ্যক্ষ, উজির, শান্তিরক্ষক ও শ্যালক (Brother-in-law) বিদেশী ছিলেন।

কোন বৈদেশিক রাজদরবারে প্রবেশের অনুমতি পাইলে সুলতানের সঙ্গে পরিচয় জন্য উপঢৌকন প্রদান করা তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্য ছিল। কিন্তু সুলতান এই উপঢৌকন প্রাপ্ত হইয়া বিদেশীয়কে তদপেক্ষা মূল্যবান সামগ্রী উপহার দিয়া পরিতুষ্ট করিতেন। ইবন সিন্ধুপ্রদেশে উপনীত হইয়া এই প্রথার বিষয় অবগত হন এবং সম্রাটকে উপঢৌকন দিবার জন্য কতকগুলি অশ্ব, উষ্ট্র ও ক্রীতদাস আনয়ন করেন।

ইবন বতুত দিল্লীর যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে উহার তদানীন্তন অবস্থা পরিস্ফুট হইয়াছে, আমরা সে চিত্র এখানে পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

"শোভা ও শক্তির আধার সুপ্রসিদ্ধ বৃহদায়তন দিল্লী নগরীতে উপনীত হইলাম। ইহা চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত; তাদৃশ প্রাচীর পৃথিবীর আর কোথায়ও দৃষ্টিগোচর হয় না। দিল্লী ভারতবর্ষের বৃহত্তম নগরী; কেবল ভারতবর্ষ কেন, ইহা মুসলমানাধীন প্রাচ্যজগতের বৃহত্তম নগরী। বর্ত্তমান সময়ে ইহা পরস্পরসংযুক্ত চারিটি স্বতন্ত্র নগরে বিভক্ত।

"১। প্রকৃত দিল্লী হিন্দুরাজগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ১১৮৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ দিল্লী বিজয় সম্পন্ন করিয়াছে।

"২। সিরি অথবা দার-উল-খিলাফত। খলিফা আব্বা সৈয়দ-আল মুস্তানসিরের পৌত্র (grand son) গিয়াস উদ্দীন সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করিলে তিনি তাঁহাকে এ অংশ প্রদান করেন। সুলতান আলাউদ্দীন ও তদীয় পুত্র কুতুব উদ্দীন এখানে বাস করিতেন।

"৩। তোগলিকাবাদ। বর্ত্তমান সম্রাটের পিতা সুলতান তোগলক এই অংশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা তাঁহার নামানুসারে অভিহিত হইয়াছে।

"৪। জাহান পান্না (Refuge of the World). এই অংশ বর্ত্তমান সম্রাটের বাসের জন্য বিশেষ ভাবে নির্দ্দিষ্ট। মহম্মদ নিজে এ অংশ সংস্থাপন করিয়াছেন। তিনি এই বিভিন্ন নগর চতুষ্টয়কে একমাত্র প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করিতে ইচ্ছা করিয়া উহার কিয়দংশ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কার্য্য সম্পন্ন করা বহু ব্যয়সাধ্য বলিয়া সুলতান আপন সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন।

"দিল্লী চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত। এরূপ প্রাচীর পৃথিবীর আর কোথায়ও দেখা যায় না। ইহার গভীরতার পরিমাণ ১১ হাত। প্রাচীর-গাত্রে প্রহরী ও দ্বার-রক্ষকগণের জন্য বাসগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল গৃহে নানাবিধ যুদ্ধোপকরণ সঞ্চিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত মেঙ্গোলেস্ (১) (Mangoles) এবং র-আদস্ (২) নামক যুদ্ধাস্ত্র রাখিবার জন্য প্রাচীর-গাত্রে গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই সকল প্রাচীর-গাত্র-সংলগ্ন গৃহে শস্যও সঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহাতে শস্যের কোন প্রকার অনিষ্ট অথবা পরিবর্ত্তন হয় নাই। আমি একটি ভাণ্ডার হইতে কতক গুলি চাউল বাহির করিতে দেখিয়াছি, উহার রঙ্গ কাল, কিন্তু স্বাদ উত্তম। আমি কতক গুলি ঘাসের দানাও বাহির করিয়া লইতে দেখিয়াছি। এই সকল দ্রব্য নব্বই বৎসর পূর্ব্বে সুলতান বলবন সঞ্চিত করিয়াছিলেন। পদাতিক ও

(১) পূর্ব্বে প্রস্তর নিক্ষেপ ও প্রাচীর আক্রমণ করিবার জন্য যে এক রূপ যন্ত্র ব্যবহৃত হইত তাহার নাম মেঙ্গোলেস্।

(২) র-আদস্ শব্দের অর্থ বজ্রনিক্ষেপকারী। দুর্গাদি অবরোধকালে ব্যবহৃত এক প্রকার যন্ত্রের নাম র-আদস্।

অশ্বারোহী সৈন্য প্রাচীরের অন্তর্ভাগে নগরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারে। আলো প্রবেশ জন্য প্রাচীরের অন্তর্ভাগে নগর-মুখে গবাক্ষ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। প্রাচীরের নিম্নভাগ প্রস্তর ও উর্দ্ধ ভাগ ইষ্টকনির্ম্মিত। তদুপরি অসংখ্য বরুজ ঘন ঘন ভাবে সংস্থাপিত। দিল্লী নগরীর আটাইশটি প্রবেশ-দ্বার; তন্মধ্যে বদায়ুন নামক দ্বারই প্রথম ও প্রধান। (১)।

মহম্মদ তোগলকের দুর্ব্বুদ্ধি ও হঠকারিতায় শোভা ও সম্পদের আধার দিল্লী নগরী জনশূন্য ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিল। ইতিহাসবেত্তাগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে মহম্মদ শাসন-সৌকার্য্যার্থ দিল্লী সাম্রাজ্যের মধ্য-বিন্দু দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। এ জন্য তিনি দিল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে দেবগিরিতে গমন করিবার জন্য বাধ্য

(১) সাহাবুদ্দীন আব-উন-আব্বাস আহম্মদ নামক জনৈক দামস্কাস-নিবাসী নানা বিদ্যা-পারদর্শী ঐতিহাসিক লেখক (ইনি মহম্মদ তোগলকের সমসাময়িক) দিল্লীর যে বর্ণনা করিয়াছেন আমরা এখানে তাহা ইবন-অঙ্কিত চিত্রের অনুবর্ত্তী অংশরূপে প্রকাশ করিলাম। "দিল্লী কতিপয় নগরের একত্রীভূত সমষ্টি মাত্র; প্রত্যেক নগরের স্বতন্ত্র নাম আছে, তন্মধ্যে একটির নাম দিল্লী বলিয়া তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য নগর গুলিও ঐ নামে পরিচিত। সমগ্র দিল্লী নগরীর পরিধি ২০ ক্রোশ। গৃহ সকল প্রস্তর ও ইষ্টক-নির্ম্মিত, কিন্তু ছাদ কাষ্ঠময়। মর্ম্মর প্রস্তরবৎ এক প্রকার শুভ্র বর্ণ প্রস্তর দ্বারা গৃহচত্বর নির্ম্মিত হয়। দিল্লীতে ত্রিতল গৃহ দেখিতে পাওয়া যায় না, অধিকাংশ গৃহই দ্বিতল, কোন কোন গৃহ বা একতল মাত্র। সুলতানের প্রাসাদ ব্যতীত আর কোথায়ও গৃহ-চত্বর মর্ম্মরপ্রস্তর-গ্রথিত নহে। কিন্তু অধুনা যে সকল গৃহ প্রস্তুত হইতেছে তাহার নির্ম্মাণপ্রণালী স্বতন্ত্র। দিল্লী গড়ে একুশটি বিভিন্ন নগরের সমষ্টি। ইহার তিন দিক উদ্যানশোভিত; পশ্চিম পার্শ্ব পর্ব্বতসংলগ্ন বলিয়া সে দিকে কোন উদ্যান নির্ম্মিত হইতে পারে নাই। দিল্লীতে এক সহস্র পাঠশালা ও সত্তরটি সাধারণ চিকিৎসালয় বিদ্যমান রহিয়াছে। নগর ও উহার উপকণ্ঠের ধর্ম্মমন্দির ও আশ্রমের সংখ্যা দ্বিসহস্র। সুবৃহৎ মঠ, প্রশস্ত বিচরণ-ভূমি এবং অগণিত স্নানাগার

করিয়াছিলেন। ইহাতেই দিল্লী নগরী জনশূন্য শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিল। (১)। কিন্তু ইবন বতুত ইহার অন্যবিধ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। "সুলতানের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অভিযোগ এই যে, তিনি দিল্লীর অধিবাসীদিগকে তাহাদের বাসভবন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। দিল্লীর অধিবাসিগণ সুলতানকে ভৎর্সনা ও অপমানসূচক কয়েক খানি পত্র লিখাতেই তিনি এরূপ কার্য্যের অনু-

---

সংস্থাপিত দেখিতে পাওয়া যায়; দিল্লীর অধিবাসিগণ অনতি গভীর কূপের জল ব্যবহার করিয়া থাকে; এই সকল কূপ কদাচিৎ সাত হাত অপেক্ষা অধিক গভীর। অধিবাসিগণ বৃহৎ বৃহৎ চৌবাচ্ছায় বৃষ্টির জল সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া পান করে। একটি তীর নিক্ষেপ করিলে যত দূরে পতিত হয়, তত দূর অন্তর অন্তর এই সকল চৌবাচ্ছা সংস্থাপিত। দিল্লীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মসজিদ উহার অভ্রভেদী চূড়ার জন্য বিখ্যাত। তাদৃশ সমুচ্চ চূড়া পৃথিবীর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। উহা ছয় শত হস্ত পরিমিত উচ্চ।"

(১) The second project of Sultan Muhammad * * * was that of making Deogir his capital, under the title of Daulatabad. This place had a central situation; Dehli, Gujrat, Lakhnauti, Satganw, Sunarganw, Silang, Mabar, Dhar, Samundar and Kampila were about equidistant from thence, there being a slight difference in the distances. Without any consultation and without carefully looking into the advantages and disadvantages on every side he brought ruin upon Delli, that city which for 170 or 180 years had grown in prosperity and rivalled Baghdad and Cairs. The city, with its sarais, and its suburbs and villages spread over four or five Kos. All was destroy-d. So complete was the ruin that not a cat or dog was left among the buildings of the city, in its palaces, or in its suburbs. The Sultan was bounteous in his liberality and favours to the emigrants both on their journey and on their arrival, but they were tender and they could not endure the exile and suffering, * * * of all the multitudes of emigrants few only survived to return to their home. Tarikh-i- Firoz shahi.

স্থানে প্রযুক্ত হন। তাহারা পত্রগুলি বন্ধ করিয়া রাত্রিযোগে দরবার-গৃহে নিক্ষেপ করিয়াছিল। এই সকল পত্রের শিরোনামায় যে বাক্যটি লিখিত ছিল, তাহা আমরা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। "পৃথিবীশ্বরের মাথার দিব্য, তিনি ছাড়া যেন আর কেহ এই পত্র পাঠ না করেন।" সুলতান খুলিয়া দেখেন যে পত্রগুলি তাঁহার বিরুদ্ধে ভৎর্সনা ও অপমানসূচক বাক্যে পূর্ণ। তিনি দিল্লী নগরী বিনষ্ট করিতে সঙ্কল্প করিয়া প্রথমতঃ সমস্ত গৃহ ও সরাই মূল্য দ্বারা ক্রয় এবং তৎপর নগরবাসীদিগকে দৌলতাবাদে (দেবগিরি) গমন করিতে আদেশ করেন। প্রথমে তাহারা রাজাদেশ প্রতিপালন না করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। কিন্তু রাজপ্রচারকগণ ঘোষণা করে যে তিন দিন পরে দিল্লীতে কেহই বাস করিতে পারিবে না। অধিকাংশ অধিবাসীই দিল্লী পরিত্যাগ করে, কেহ কেহ বা গৃহ মধ্যে লুক্কায়িত ভাবে ছিল। যাহারা গমন করে নাই তাহাদিগকে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিবার জন্য মহম্মদ আদেশ করেন। তাঁহার ক্রীতদাসগণ রাজপথে দুইজন লোক পাইয়াছিল, তাহাদের এক জন পঙ্গু, অপরটি অন্ধ। ইহাদিগকে সুলতানের নিকট উপস্থিত করিলে তিনি পঙ্গুকে একটি মঞ্জালিক হইতে গুলি করিয়া নিক্ষেপ করিতে এবং অন্ধটিকে দিল্লী হইতে চল্লিশ দিনের পথ দৌলতাবাদে টানিয়া লইয়া যাইতে আদেশ করেন। এই নিরুপায় দুর্ভাগার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভ্রমণকালে খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়, কেবল মাত্র এক খানি পা দৌলতাবাদে পৌঁছিয়াছিল। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই দিল্লী হইতে গমন করে; তাহারা পণ্য দ্রব্য ও গৃহসামগ্রী তথায় পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। এই ভাবে দিল্লী সম্পূর্ণ জনশূন্য হয়।

"আমার বিশ্বাসভাজন এক ব্যক্তির নিকট হইতে অবগত হইয়াছি যে সুলতান একদা প্রাসাদোপরি আরোহণ পূর্ব্বক অগ্নি, ধূম ও আলোকবর্জ্জিত দিল্লীর চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এত দিনে আমার হৃদয় পরিতৃপ্ত ও জিঘাংসাবৃত্তি শান্ত হইল।" কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে মহম্মদ অন্যান্য প্রদেশীয় প্রজাবর্গকে দিল্লীতে আগমন করিয়া উহা পুনর্ব্বার জনপূর্ণ করিতে আদেশ করেন। কিন্তু দিল্লী নগরী এত বৃহৎ যে তাহারা আপনাদের দেশের অনিষ্ট করিয়াও উহা পূর্ব্ববৎ

সৌষ্ঠবসম্পন্ন করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ দিল্লী পৃথিবীর একটি বৃহত্তম নগরী। দিল্লী শোভা ও সম্পদের কেন্দ্রস্থল; উহার কারু-কার্য্য-খচিত মসজিদ ও সুগঠিত প্রাচীর পৃথিবীতে অতুলনীয়। যদিচ সুলতান দিল্লী নগরীকে পুনর্ব্বার জনপূর্ণ করিতেছেন, তথাপি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরী লোক সংখ্যায় একান্ত নগণ্য। আমি যে সময় রাজধানীতে উপনীত হই তখন উহার যেরূপ অবস্থা দেখিয়াছি তাহা বর্ণনা করিলাম। দিল্লী নগরী জনশূন্য ও পরিত্যক্ত এবং উহার লোকসংখ্যা অতি সামান্য।"

ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিলে সুলতান গিয়াস উদ্দীন তোগলক তথায় গমন করেন। সুলতান স্বকার্য্য সাধন করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তদীয় পুত্র মহম্মদ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য একটি কাষ্ঠমঞ্চ নির্ম্মাণ করেন। এই মঞ্চ হইতে পতিত হইয়া গিয়াস অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইবন বতুত নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে মহম্মদের কৌশলেই তাঁহার পিতার অপঘাত মৃত্যু ঘটিয়াছিল। ইতিহাসবেত্তা জিয়া উদ্দীন বর্ণি ইহাকে আকস্মিক ঘটনা বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। মহম্মদ কাজিম ফেরিস্তা এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে মহম্মদের বিরুদ্ধে এরূপ গুরুতর অভিযোগ বিশ্বাসযোগ্য নহে। কিন্তু ইবনের কথা যথার্থ বলিয়াই অনুমিত হয়। তিনি সম্ভ্রান্ত ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট যাহা অবগত হইয়াছিলেন তাহাই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইবনের বৃত্তান্তে সত্যপ্রাণতা জাজ্বল্যমান রূপে প্রতিভাত বলিয়া পাঠক সহজেই উহার পক্ষপাতী হন। যাহা হউক, আমরা এখানে ইবন-লিখিত এতদ্বিষয়ক বৃত্তান্তের সার মর্ম্ম প্রদান করিতেছি।

গিয়াস উদ্দীন তোগলকের রাজত্বকালে দিল্লীতে নিজাম উদ্দীন বদায়ুনি নামক এক জন মহাপুরুষের বাস ছিল। সুলতান পুত্র মহম্মদ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। বদায়ুনির ভাবাবেশে মোহ হইত। একদা আবেশ উপস্থিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমরা মহম্মদকে সিংহাসন অর্পণ করিলাম।" তাঁহার মৃত্যু হইলে মহম্মদ নিজে তদীয় মৃতদেহ বহন করেন। গিয়াস উদ্দীন এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সন্দিগ্ধচিত্তে পুত্রকে ভয় প্রদর্শন

করেন। মহম্মদের কার্য্যপরম্পরায় পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার হৃদয়ে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল। বক্ষ্যমাণ ও অন্যান্য ঘটনায় তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপিত হয়। সুলতান বঙ্গদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দিল্লীর নিকটবর্ত্তী হইলে মহম্মদ একটি মঞ্চ নির্ম্মাণ করিতে আদিষ্ট হন। তদনুসারে তিনি রাজকীয় অট্টালিকা সমূহের পরিদর্শক মালিকজাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে একটি কাষ্ঠময় মঞ্চ নির্ম্মাণ করান। মালিকজাদ কালক্রমে সুলতান মহম্মদের প্রধান মন্ত্রি-পদে অভিষিক্ত এবং খাজাই-জাহান উপাধি প্রাপ্ত হন। মহম্মদ এবং মালিকজাদ মঞ্চ নির্ম্মাণকালে এরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন যে ক্রীড়াচ্ছলে হস্তীগুলি কোন এক নির্দ্দিষ্ট অংশ স্পর্শ করিলেই যেন উহা সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়ে। সুলতান গিয়াস উদ্দীন মঞ্চের নিকট উপনীত হইয়া জনসাধারণকে ভোজ দিয়া পরিতৃপ্ত করেন। সমবেত জনমণ্ডলী চলিয়া গেলে মহম্মদ পিতার নিকট সুসজ্জিত হস্তীর ক্রীড়া প্রদর্শন করিবার জন্য অনুমতি চাহেন। সেখ রোকণ উদ্দীন নামক জনৈক ব্যক্তি ইবন বতুতকে বলিয়াছিলেন যে এই সময় তিনি এবং সুলতানের প্রিয় পুত্র মাহমুদ তাঁহার নিকটে ছিলেন। কিন্তু তিনি মহম্মদের আদেশ অনুসারে বৈকালিক নমাজ পড়িবার জন্য মঞ্চ হইতে অবতরণ করেন। সেখ মঞ্চ হইতে অবতরণ করিলে মহম্মদ ও তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচরের পূর্ব্ব নির্দ্দেশ মত হস্তীগুলিকে উহার কোন এক নির্দ্দিষ্ট পার্শ্বে আনয়ন করা হয়। হস্তীগুলি সেই পার্শ্ব অতিক্রম করিলেই মঞ্চটি সুলতান ও তাঁহার পুত্র মাহমুদের উপর ভাঙ্গিয়া পড়ে। সেখ রোকণ উদ্দীন নমাজ পড়িবার পূর্ব্বেই মঞ্চের পতন-শব্দ শ্রবণ পূর্ব্বক তথায় গমন করিয়া দেখিয়াছিলেন যে উহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সুলতানপুত্র মহম্মদ সাবল ও কুঠার দ্বারা খনন পূর্ব্বক পিতার অনুসন্ধান করিতে আদেশ করেন। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে তাড়াতাড়ি না করিবার জন্য ইঙ্গিত করেন। এবং সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে এই সকল যন্ত্র আনয়ন করা হয় নাই। তার পর তাহারা খনন করিয়া দেখে যে সুলতান পুত্রকে মৃত্যু-মুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য আগুলিয়া রহিয়াছেন। খাজা-ই-জাহানের গঠনকৌশলে মঞ্চ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল; ইহাই তাঁহার উন্নতির মূল সূত্র বলিয়া ইবন নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সুলতানের মৃত্যুর পর মহম্মদ নির্ব্বিবাদে পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম জুনা; তিনি সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া মহম্মদ উপাধি ও আবু-ল-মুজাহিদ পদবী গ্রহণ করেন। ইবন বতুত ভারতবর্ষের সুলতানগণের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই তিনি তৎকালীন প্রধান কাজি বুরহাণ উদ্দীনের পুত্র কমল উদ্দীনের নিকট অবগত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত মহম্মদ সম্বন্ধীয় অধিকাংশ বিবরণই প্রত্যক্ষ দর্শনের ফল। কারণ তিনি মহম্মদের রাজত্বকালে এদেশে উপনীত হইয়া সেই সময়ে যাহা কিছু স্বচক্ষে ঘটিতে দেখিয়াছিলেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ইবন বতুত মহম্মদের চরিত্র সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন আমরা এখানে তাহা প্রদান করিলাম। "সুলতান মহম্মদ তোগলক সর্ব্বোপরি উপহার প্রদান ও রক্তপাত করিতে ভাল বাসেন। তাঁহার দ্বারদেশে দরিদ্র ব্যক্তিকে হঠাৎ ধনশালী অথবা জীবিত ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে সর্ব্বদাই দেখা যাইতে পারে। তাঁহার বদান্যতা ও সাহসিকতা এবং নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের কাহিনী জনসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই সকল সত্ত্বেও তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বিনীত ও ন্যায়পর বলিয়া পরিচিত। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান তাঁহার একান্ত প্রিয় কার্য্য; তিনি ঈশ্বরোপসনায় সাতিশয় নিষ্ঠাবান এবং তদ্বিষয়ক শিথিলতা-দমনে কঠোরহস্ত। যে সকল রাজা সৌভাগ্যের বরপুত্র এবং যাঁহাদের সাফল্য অসামান্য, মহম্মদ তাঁহাদের একজন। কিন্তু বদান্যতাই তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব।

"সুলতানের দিল্লীর প্রাসাদ দারসরা নামে খ্যাত; ইহার বহু সংখ্যক দ্বার। প্রথম দ্বারে এক দল দ্বারপাল নিযুক্ত আছে। প্রথম দ্বারের বহির্ভাগে নরঘাতকদের অবস্থান জন্য মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে। সুলতান কাহারও প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলে এই ঘাতকসম্প্রদায় তাহাকে দরবার-গৃহের দ্বারদেশে বধ করে। এবং তাহার মৃতদেহ তিন দিন পর্য্যন্ত তথায় পড়িয়া থাকে। হাজার ছতুন (সহস্র স্তম্ভ) নামক সুপ্রশস্ত দরবার-গৃহ তৃতীয় দ্বারের সংলগ্ন। এই সকল কাষ্ঠনির্ম্মিত ও অত্যুজ্জ্বল তৈলনিসিক্ত, তদুপরি কারুকার্য্য-খচিত কাষ্ঠময় ছাদ। এই স্থানে জনসাধারণ সমবেত হয়

এবং সুলতান প্রকাশ্য দরবার করিয়া থাকেন।

"সমগ্র ভারতবর্ষ ও সিন্ধুপ্রদেশে অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন শস্য এতদূর দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল যে এক মণ গম ছয় ডিনার মূল্যে বিক্রীত হইত। এই দুঃসময়ে সুলতান দিল্লীর অধিবাসীদিগকে ছয় মাসের উপযোগী আহার সামগ্রী রাজকীয় শস্য-ভাণ্ডার হইতে প্রদান করেন। বিচারকগণ দিল্লীর বিভিন্ন রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী অধিবাসীদিগের তালিকা প্রস্তুত করিয়া প্রেরণ করিলেই প্রত্যেক ব্যক্তি ছয় মাসের উপযোগী আহার সামগ্রী প্রাপ্ত হইত।

"সুলতানের বিনয় নম্র ব্যবহার, ন্যায়ানুরাগ, দয়াদাক্ষিণ্য ও অপরিসীম উদারতার বিষয় আমি যাহা বলিয়াছি তাহা সত্ত্বেও তিনি নরশোণিত-লোলুপ ছিলেন। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির মৃতদেহ কদাচিৎ রাজপ্রাসাদের দ্বারদেশে দৃষ্ট হইত না। আমি তথায় প্রায়শঃ নরহত্যা হইতে এবং তাহাদের মৃতদেহ পতিত থাকিতে দেখিয়াছি। একদা রাজপ্রাসাদে প্রবেশকালে আমার অশ্ব চমকিয়া উঠিয়াছিল। আমি চাহিয়া দেখি যে, যেন কোন সাদা জিনিষ আমার সম্মুখে স্তূপাকারে রহিয়াছে। তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া আমার একজন অনুচরের নিকট অবগত হই যে, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কোন মানবদেহ তিন খণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্তূপাকৃতি ধারণ করিয়াছে। মহম্মদ লঘু অপরাধেও গুরু দণ্ডের বিধান করিতেন; তাঁহার হস্তে পণ্ডিত, ধার্ম্মিক ও সম্ভ্রান্ত কাহারও নিষ্কৃতি ছিল না। প্রত্যহ শত শত ব্যক্তিকে তাহাদের হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দরবার-গৃহে আনয়ন করা হইত; তন্মধ্যে কেহ কেহ জীবন বিসর্জ্জন করিত, কেহ কেহ বা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অথবা প্রহৃত হইয়া পরিত্রাণ পাইত। এক শুক্রবার ব্যতীত প্রত্যহ সমস্ত কয়েদীকে সুলতানের সম্মুখে উপস্থিত করার নিয়ম ছিল। শুক্রবার তাহাদের বিশ্রামের দিন; এ দিনে তাহারা গাত্র পরিষ্কার ও বিশ্রাম করিত।

"সুলতানের মসায়ূদ নামে এক ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার মাতা সুলতান আলা উদ্দীনের কন্যা। মসায়ূদ অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন, এ পর্য্যন্ত যে সকল রূপবান পুরুষ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে মসায়ূদ এক জন। মহম্মদ তাঁহাকে বিদ্রোহোন্মুখ বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিলে তিনি কঠোর দণ্ডের ভয়ে আত্মাপরাধ স্বীকার করেন। বস্তুতঃ সুল-

তান যাহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনয়ন করেন, তাহাদের মধ্যে যে কেহ আত্মদোষ স্খালনে প্রবৃত্ত হয় তাহাকেই কঠোর দণ্ড দেওয়া হইয়া থাকে এবং অধিকাংশ ব্যক্তিই যন্ত্রণা ভোগ করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ বলিয়া বোধ করে। সুলতানের আদেশে রাজ-প্রাসাদে মসায়ুদের শির-শ্ছেদন করা হয় এবং প্রচলিত নিয়মানুসারে তাঁহার মৃতদেহ তিন দিন পর্য্যন্ত তথায় পড়িয়াছিল। ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মাতা ব্যভিচারিণী বলিয়া অভিযুক্ত হওয়াতে ঠিক এই স্থানে প্রস্তরাঘাতে নিহত হন।

"দিল্লীর নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশের হিন্দুগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সুলতান, মালিক ইউসুফ বোগরার অধীনে সৈন্য নিয়োজিত করিলে তিনি অধিকাংশ সৈন্য সহ প্রস্থান করেন। কিন্তু কতিপয় সৈন্য ইউসুফের সহগামী না হওয়াতে তিনি তদ্বিবরণ সুলতানকে অবগত করান। সুলতান এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া সমগ্র দিল্লী অনুসন্ধান পূর্ব্বক যে সকল সৈন্য মালিক ইউসুফের অনুসরণ করিয়াছিল না তাহাদিগকে ধৃত করিবার জন্য আদেশ করেন। রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনকারী তিন শত সৈন্য ধৃত হয়। তিনি তাহাদিগকে বধ করিবার জন্য আদেশ করেন; রাজাজ্ঞা প্রতিপালিত হইয়াছিল।"

কল্পনামত্ত মহম্মদ চীন দেশ জয় করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হন। হিন্দুস্থান ও চীনদেশের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে বিজয়পতাকা উড্ডীন করিতে পারিলে সৈন্য প্রেরণ করা সহজসাধ্য হইবে বিবেচনা করিয়া সুলতান মহম্মদ তোগলক প্রথমতঃ হিমালয় পর্ব্বত-সংলগ্ন করাজল রাজ্য অধিকার করিতে মনন করেন। এ জন্য তিনি রাজকোষের কোটী কোটী মুদ্রা ব্যয় করিয়া বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু সুলতান যে অগণিত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া করাজল রাজ্য হরণ করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা প্রাকৃতিক পীড়নে বিনষ্ট হওয়াতে দিল্লীর আফগান সাম্রাজ্য-ভিত্তিমূলে প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হয়। এতৎসম্বন্ধে ইবন বতূত স্বকীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্তে যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন আমরা এ স্থানে তাহার অনুবাদ দিতেছি।

"সে সময় যে সকল ক্ষমতাশালী হিন্দুরাজা শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ

করিতেছিলেন করাজলের অধিপতি তাঁহাদের মধ্যে এক জন। সুলতান মহম্মদ তোগলক মস্যাধার ধারকগণের অধিনেতা মালিক লাকবিয়াকে সেনাপত্যে বরণ করতঃ এক লক্ষ অশ্বারোহী ও বহু সংখ্যক পদাতিক সৈন্য করাজল রাজ্য অধিকার করিতে প্রেরণ করেন। মুসলমানসৈন্য হিমালয়ের পাদদেশে জিদিয়া নগর ও পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য স্থান অধিকার করতঃ দেশ লুণ্ঠন, সহস্র সহস্র গৃহ অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত এবং অধিবাসীদিগকে বন্দী করিয়াছিল। হিন্দুগণ গো-মেষপাল ও রাজ-কোষ শত্রুহস্তে পরিত্যাগ করিয়া সমতল ভূমি হইতে পর্ব্বতোপরি পলায়ন করে। পর্ব্বতারোহণের একমাত্র পথ; নিম্নে উপত্যকা ভূমি, উপরে পর্ব্বত। এই পথে অশ্বারোহী সৈন্য কেবল একে একে গমন করিতে পারে। মুসলমানসৈন্য এই পথে পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিয়া ওয়ারঙ্গল অধিকার পূর্ব্বক তত্রত্য অধি-বাসিবর্গের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছিল। সুলতান আপন সৈন্যের বিজয়বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া এক জন কাজি ও এক জন ধর্ম্ম-প্রচারক প্রেরণ করতঃ তাহা-দিগকে তথায় অবস্থান করিতে আদেশ করেন।

"বর্ষাকাল সমাগত হইলে মুসলমান-সৈন্য রোগাক্রান্ত হইয়া অতিশয় দুর্ব্বল হয়, বহুতর অশ্ব বিনষ্ট হয় এবং অতিবৃষ্টিতে ধনুর জ্যা শিথিল হইয়া পড়ে। এজন্য আমিরগণ পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া পাদ-দেশে অবস্থান এবং বর্ষান্তে পুনর্ব্বার বিজিত দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সুলতানের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁহারা অবতরণ করিতে সুলতানের আদেশ প্রাপ্ত হন। হিন্দুগণ মুসলমানসৈন্যকে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া তাহাদের আগমনের পূর্ব্বেই সঙ্কীর্ণ পথ অবরোধ করতঃ পর্ব্বতের প্রবেশ-দ্বারে প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহারা পুরাতন বৃক্ষ কর্ত্তন করিয়া মুসলমান-সেনার মাথায় নিক্ষেপ করাতে উহার আঘাতে অনেকের প্রাণনাশ হই-য়াছিল। অধিকাংশ সৈন্যই কালগ্রাসে পতিত হয়, যাহারা অবশিষ্ট ছিল তাহাদিগকেও শত্রুগণ বন্দী করে। অগণিত মুসলমানসৈন্য মধ্যে কেবল মাত্র তিন জন (সেনাপতি লাকবিয়া, বদর উদ্দীন মালিক, দৌলত শাহ এবং আর এক জন) দিল্লীতে ফিরিয়া আইসেন। (১)

(১) কিন্তু ইতিহাসবেত্তা জিয়া উদ্দীন বলেন যে দশ জন দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন

"এই দুর্ঘটনায় মুসলমান-সৈন্য অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং উহা প্রত্যক্ষ ভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ইহার কিয়ৎকাল পরে পার্ব্বত্য অধিবাসিগণ রাজকর প্রদান করিতে স্বীকৃত হওয়াতে সুলতান তাহাদের সঙ্গে শান্তি সংস্থাপন করেন। বস্তুতঃ পর্ব্বতের পাদদেশে যে ভূমি তাহাদের অধিকারে ছিল তাহা সুলতানের বিনা অনুমতিতে ভোগ করা সম্ভবপর ছিল না।"

সুলতানের অভূতপূর্ব্ব অত্যাচারে যেন ভারতবাসীর দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল না বলিয়াই ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছিল। মহম্মদ মালবারে বিদ্রোহদমনে ব্যাপৃত ছিলেন। এদিকে অনাবৃষ্টিনিবন্ধন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া ভীষণাকার ধারণ করে। এক মণ গমের মূল্য ষাইট দিরহাম অপেক্ষাও বেশী হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষ সর্ব্বব্যাপী ও প্রজার অবস্থা একান্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। এই সময় ইবন বতুত এক দিন উজিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য নগর হইতে বহির্গত হইয়া দেখিয়াছিলেন যে তিনটি স্ত্রীলোক একটি পর্য্যুষিত অশ্বের চামড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া খাইতেছে। চামড়া সিদ্ধ করিয়া বাজারে বিক্রয় করা হইত। গোহত্যাকালে ক্ষুধিত জনসাধারণ রক্ত সংগ্রহ করিবার জন্য দলবদ্ধ হইয়া সবেগে ধাবিত হইত এবং জীবনরক্ষার্থ উহাই পান করিত। দুর্ভিক্ষ অসহনীয় হইলে মহম্মদ দিল্লীর সমস্ত অধিবাসীর মধ্যে ছয় মাসের উপযোগী খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করিবার জন্য আদেশ করেন। বিচারক প্রভৃতি রাজপুরুষগণ সমস্ত রাজপথ ও বাজার পরিদর্শন এবং মুগরিবি ওজনে দেড় পাইণ্ড খাদ্যসামগ্রী ছয় মাসের উপযুক্ত বলিয়া প্রত্যেক নগরবাসীকে প্রদান করিতেন।

কিরূপে সুশিক্ষিত হস্তীর সাহায্যে নরহত্যা সাধিত হইত আমরা তদ্বিবরণ প্রদান করিয়াই এ প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। যে সকল হস্তীকে একার্য্যে নিযুক্ত করা হইত তাহাদের দন্ত তীক্ষ্ণধার লৌহ দ্বারা বাঁধান ছিল। ইহারা কোন লোককে আপনাদের সম্মুখে নিক্ষিপ্ত হইতে

করিয়াছিল। The whole force was thus destroyed at one stroke and out of all these chosen body of men only ten horsemen returned to spread the news of its discomfiture.

দেখিলেই তাহাকে শুড় দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া সবেগে ঘূর্ণন পূর্ব্বক দন্তের সাহায্যে সজোরে নিক্ষেপ করিত; তার পর তাহার বক্ষোপরি পা তুলিয়া দিত। ইহার পর সুলতানের আদেশক্রমে মাহুতের নির্দ্দেশমত কাজ হইত। যদি সুলতান দণ্ডিত ব্যক্তিকে খণ্ড খণ্ড করিতে আদেশ করিতেন তাহা হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত তীক্ষ্ণধার লৌহাস্ত্র দ্বারা সে কার্য্য সম্পাদিত হইত।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

রাজা রামানন্দ রায়।

(৪)

বৈষ্ণব-গ্রন্থ আলোচনা করিলে রামানন্দকে বাঙ্গালী বলিয়াই মনে হয়। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট আমরা প্রথম রামানন্দের পরিচয় প্রাপ্ত হই (১)। স্বদেশীয় পণ্ডিত না হইলে "মহাপ্রভাব বিচক্ষণ সর্ব্বগুণান্বিত নানা দেশবাসী ছাত্রব্রজের" অধ্যাপক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ভারতবর্ষের স্বনামধন্য অন্য শিষ্যগণের পরিচয় না দিয়া রামানন্দের পরিচয় দেন কেন? কড়চা-লেখক গোবিন্দদাস, রামানন্দ ও গৌরাঙ্গের গভীর তত্ত্বালোচনা যেন সম্যক্ বুঝিয়াই তাহার সারমর্ম্ম কড়চায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের ভাষায় সেই তত্ত্বালোচনা না হইয়া থাকিলে কি গোবিন্দদাস কড়চায় তাহার সারসংগ্রহ করিতে সক্ষম হইতেন? বিদ্যানগর হইতে শ্রীক্ষেত্রে তাঁহাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সঙ্গেই দেখিতে পাওয়া যায়। স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেবের অন্ত্যলীলার শেষ পর্য্যন্ত অনুসঙ্গী। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও জয়দেবের প্রেমোদ্দীপক পদনিচয় রামানন্দ কীর্ত্তন করতঃ শ্রীচৈতন্য দেবের সন্তোষসাধন করিতেন। ইহা হইতে স্বতঃই প্রতীত হয় যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও জয়দেব যে মাতৃভূমির কৃতী সন্তান, রায় রামানন্দও সেই প্রেমসঙ্গীত জননী গৌড়ভূমির কবিত্বামোদী সুসন্তান।

(১) উৎসাহ। দ্বিতীয় বর্ষ, আষাঢ়।

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, ও গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদকর্ত্তৃগণের রচিত পদের সহিত রায় রামানন্দ বিরচিত 'পহিলহি' পদটির ভাষা সাদৃশ্য এবং তাহাতে 'উড়িয়া' বা অপর কোন দাক্ষিণাত্য ভাষার সংস্পর্শশূন্যতা পর্য্যালোচনা করিলে রায় রামানন্দকে বাঙ্গালী ভিন্ন ভারতবর্ষের অপর কোন প্রদেশীয় কবি বলিয়া আদৌ উপলব্ধ হইবে না। এস্থলে স্বনামপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-কবিগণের রচিত কয়েকটি পদের সহিত রামানন্দের বাঙ্গলা পদটি তুলনা সৌকর্য্যার্থে উদ্ধৃত হইতেছে :——

বিদ্যাপতি।

শুন শুন এ ধনি বচন বিশেষ।
আজু হাম দেয়ব তোঁহে উপদেশ॥
পহিলহি বৈঠবি শয়নকি সীম।
হেরইতে পিয়ামুখ মোড় বিগীম॥
পরশিতে দুহুঁ করে বাড়বি পাণি।
মৌন করবি পহুঁ করইতে বাণী॥
যব হাম সোঁপব করের আপি।
সাথলে ধরবি উলটি মোহে কাঁপি॥
বিদ্যাপতি কহ ইহ রস ঠাট।
কামগুরু হই শিখায়ব পাট॥

গোবিন্দদাস।

পহিলহি রাধামাধব মেলি।
পরিচয় দুলহ দূরে রহু কেলি॥
অনুনয় করইতে অবনত বয়নি।
চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধরণী॥
অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কাম।
রাই করল পদ আধ পয়ান॥
বিদগধ মাধব অনুভব জানি।
রাইক চরণে পসারল পাণি॥

করে কর বাড়াইতে উপজল প্রেম।
দারিদ ঘট ভরি পাওল হেম॥
হাসি দরশ মুখ আগোরস গোরি।
দেই রতন পুন লেয়ল চোরি॥
ঐছন নিরূপম পহিল বিলাস।
আনন্দ হেরত গোবিন্দদাস॥

জ্ঞানদাস।

সহজে নলিক পুতলি গোরি।
জারল বিরহজানলে তোরি॥
বরণ কাঞ্চন এ দশ বাণ।
শ্যামরি সোঙরি তোঁহারি নাম॥
শুনহ মাধব কহলুঁ তোয়।
সুমতি না দেই দিন রজনী রোয়।
অরুণ অধর বাঁধুলি ফুল।
পাণ্ডুর ভৈ গেল ধুতুর তুল॥
ফুয়ল করবী উরনি লোল।
সুমেরু উপরে চামর ডোল॥
অঙ্গুলে অঙ্গুরী বলয়া ভেল।
জ্ঞানদাস কহে দুঃখ মদন দেল॥

রাধামোহন।

মানিনী মিলল কুঞ্জক মাঝ।
আনন্দে নিমগন নাগর রাজ॥
আগুসরি বিনয় করউ কত ছন্দঃ।
কতবিধ সেবন যাহে নিরবন্ধ॥
তবহুঁ বিমুখ ভেল মানিনী রাই।
কত পরকারে বুঝায়ল তাই॥
কো কিছু বচন করহ অবধান।
রাধামোহন পঁহু মো কর গান॥

রামানন্দ।

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভাব পেশল জানি॥
এ সখি সে সব প্রেম-কাহানি।
কানুঠামে কহবি বিছুরহ জানি॥
না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন।
দুহুঁ কর মিলন মধত পাঁচ বাণ॥
অব সোই বিরাগে তুঁহ ভেলি দূতী।
সুপুরুখ প্রেমকি ঐছন রীতি॥
বর্দ্ধন রুদ্র নরাধিপ মান।
রামানন্দ রায় কবি ভাণ॥

এই কয়টি পদের শব্দপ্রয়োগ, ক্রিয়ার রূপ, কারকের বিভক্তি ও সাধারণ রচনা-প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য রাখিলে কেহই উক্ত পদকর্ত্তৃগণকে একদেশবাসী ও একভাষাভাষী ভিন্ন অন্যরূপ মনে করিতে পারিবেন না।

রামানন্দ রায় বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও জয়দেবের পদাবলীর রস সততই যে আস্বাদন করিতেন, এবং চৈতন্যদেবের নিকট ঐ সকল পদ কীর্ত্তন করতঃ রামানন্দ রায় যে তাঁহার শ্রুতিসুখ উৎপাদন করিতেন, তাহার প্রমাণ-চৈতন্য চরিতামৃতে পাওয়া যায় (১)। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব এই কবিত্রয়ের মধ্যে জয়দেব ও চণ্ডীদাস খাঁটি বাঙ্গালী কবি। আবার জয়দেব ও চণ্ডীদাস এই দুই জনের মধ্যে কোমলকান্ত পদাবলীর রচয়িতা জয়দেব, সংস্কৃত গীতিকাব্যের শোভা সম্পাদন করিলেও তাঁহার

(১) চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ॥
মধ্যলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ।

গীতগোবিন্দকে অনেকে বাঙ্গালা পয়ার ও ত্রিপদীর মূল উৎস মনে করেন। প্রকৃত পক্ষেই জয়দেবের রচিত মধুর পদাবলী যেন সংস্কৃত বসনের অন্তরালে কোমল বাঙ্গালা কবিতাকে লুক্কায়িত রাখিয়াছে। রামানন্দের সংস্কৃত পদও জয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলীর অনুকরণে রচিত,—যেন ঠিক সংস্কৃতাবরণে আবরিত বাঙ্গালা সঙ্গীত। দৃষ্টান্তস্বরূপ এস্থলে রামানন্দের দুইটি সংস্কৃত পদ উদ্ধৃত করিতেছি:——

(১)

বিদলিত সরসিজ-দলচয়-শয়নে।
বারিত সকল সখী জল নয়নে॥
বলতি মনোমম সত্বর রচনে।
পূরয় কামমিমং শশিবদনে॥
অভিনব বিষ-কিশলয়চয়বলয়ে।
মলয়জ রস পরিষেচিত নিলয়ে॥
সুখয়তু রুদ্রগজাধিপ চিত্তং।
রামানন্দ রায় কবিভণিতং॥

(২)

কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতং।
পঙ্কজমিব মারুত চলিতং॥
কেলিবিপিনং প্রবিশতি রাধা।
প্রতিপদ সমুদিত মনসিজ বাধা॥
বিনিদধতী মৃদুমন্থরপাদং।
রচয়তি কুঞ্জরগতিমনুবাদং॥
জনয়তুরুদ্রগজাধিপমুদিতং।
রামানন্দ রায় কবি গদিতং॥

পুনশ্চ—

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পঢ়ে রায় রামানন্দ॥
অন্ত্যলীলা, ১৭শ পরিচ্ছেদ।

এইরূপ সংস্কৃত পদরচনা হইতে রচয়িতা রামানন্দকে জয়দেবের স্বদেশীয় ও স্বভাষী ধরিলে বোধ হয় অনুমান বিশেষ অসত্যদুষ্ট হইবে না।

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব এই তিন জনের মধ্যে চণ্ডীদাস খাঁটি বাঙ্গালী কবি। সংস্কৃত, মৈথিল, ব্রজবুলি ইত্যাদি ভাষায় তাঁহার রচিত পদ দেখা যায় না। ইঁহার পদগুলি খাঁটি বাঙ্গালা ভাষায় রচিত। আমি পদকল্পতরু, পদামৃতসমুদ্র, গীতরত্নাবলী, পদকল্পলতিকা প্রভৃতি হইতে চণ্ডীদাস-রচিত প্রায় ১৫০ পদ পাইয়াছি, ইহার কোনটিতেই ব্রজবুলি, মৈথিলী বা সংস্কৃতের সংস্পর্শ নাই। রামানন্দ এই খাঁটি বাঙ্গালী কবি চণ্ডীদাসের পদ পাঠ ও কীর্ত্তন করিতেন এবং ভাবানুরূপ প্রয়োজনানুসারে কীর্ত্তন করতঃ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবকে শুনাইতেন। এরূপ স্থলে রামানন্দকে চণ্ডীদাসের সহিত প্রতিবেশিত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন মনে করিলে কি উন্মাদিনী কল্পনার আশ্রয় লওয়া হইবে?

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন। তথায়

"শ্রীনিবাস গেলা সার্ব্বভৌমের বাটীতে।
তথায় শ্রীরায় রামানন্দের গমন॥
দোঁহে বসি গায় গৌরচন্দ্র-গুণগান।
শ্রীনিবাস গিয়া দোঁহে দর্শন করিল। (১)

আবার স্থানান্তরে বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখি,——

বাসুদেব সার্ব্বভৌম রামানন্দ সনে।
নিরন্তর মগ্ন প্রভু-চরিত্র-কীর্ত্তনে॥ (২)

ইহা হইতে দৃষ্ট হইতেছে যে রামানন্দ রায় শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের অন্তর্দ্ধানের পরও বাঙ্গালী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত গৌরাঙ্গ-চরিত্রানুধ্যানে দিনযামিনী যাপন করিতেন; অথচ এই সময়ে শ্রীক্ষেত্রে অপর দেশীয় বৈষ্ণব সাধু বা সন্ন্যাসীর অসদ্ভাব ছিল না।

এ পর্য্যন্ত এই প্রবন্ধে যাহা আলোচনা করা হইল, তাহা হইতে স্বতঃই মনে উদিত হয় যে রামানন্দ রায়, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব,

(১) (২) ভক্তিরত্নাকর, তৃতীয় তরঙ্গ।

গোবিন্দদাস, রাধামোহন ঠাকুর প্রভৃতি একই সাহিত্য-সরোবরের কলকণ্ঠ রাজহংস এবং সার্ব্বভৌম প্রভৃতি বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের স্বদেশীয়। এই কারণেই অসংখ্য বৈষ্ণবকবি-প্রসূতি রাঢ়ভূমিকে আমি রায় রামানন্দেরও জন্মস্থান বলিয়া গ্রহণ করিতেছি এবং সম্ভবতঃ ইহাতে আমি গুরুতর ঐতিহাসিক ভ্রমে পতিত হইতেছি না।

---

(৫)

রামানন্দ রায় বাঙ্গালী হইলেও, তিনি যে কোন্ জাতীয় ছিলেন, বৈষ্ণবগ্রন্থে বা অপর কোন উপায়ে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। প্রকৃত বৈষ্ণবতায় রামানন্দ আপনাকে "শূদ্রাধম" বলিয়া মাত্র পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের সহিত প্রথম সাক্ষাতে রামানন্দ,

"কাঁহা মুঞি রাজসেবক বিষয়ী শূদ্রাধম।" (১)

বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন, এবং তাঁহার পিতা ভবানন্দ রায়ও,

"————আমি শূদ্র বিষয়ী অধম।" (২)

বলিয়া মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎকার সময়ে আপনার দীনতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইহা হইতে ভবানন্দ, রামানন্দ যে ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহারা যে "অধম শূদ্র" বা "নিম্ন শ্রেণীর শূদ্র" ছিলেন, ইহা অনুমান করা সঙ্গত হইবে না।

জগন্নাথ-বল্লভ নাটকে রামানন্দ আপন পিতা ভবানন্দ রায়কে যেরূপ বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে এক জন মহাপণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ হয় না; এবং বিশেষণগুলি হইতে এরূপও মনে হয় যে ভবানন্দ উড়িষ্যার কোন রাজকীয় উচ্চপদ সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠেও প্রতীত হয় যে ভবানন্দ রায়কে রাজা প্রতাপরুদ্র দেব "পূজ্য" এবং তাঁহার পুত্রগণকে পরম "প্রীতিপাত্র" বিবেচনা করিতেন (৩)।

রামানন্দ, গোপীনাথ এবং বাণীনাথ এই তিন ভ্রাতারই রাজপদে

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ।
(২) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১০ম পরিচ্ছেদ।
(৩) "ভবানন্দ রায় আমার পূজ্য গর্ব্বিত।"

নিযুক্ত থাকার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, ভবানন্দের উৎকল রাজ্যে উচ্চ-পদে অভিষিক্ত থাকা অসম্ভব বোধ হয় না। ভবানন্দ কোন উচ্চপদে নিযুক্ত না থাকিলে, তদীয় তনয়ত্রয়েরই কি বিদেশীয় হইয়া রাজসংসারে প্রবেশ-লাভ সহজ হইয়াছিল ?

বাঙ্গালী ভবানন্দ এবং তাঁহার তনয়ত্রয়ের বিদ্যাবত্তা এবং রাজকীয় পদপ্রাপ্তির বিষয় একটু চিন্তা করতঃ সেই সময়ের সামাজিক অবস্থার চিত্র অঙ্কিত করিলে, তাঁহাদিগকে কোন হীন শ্রেণীর শূদ্র জাতীয় বলিয়া বোধ হইবে না। আজ কাল ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উদার শাসনে শিক্ষামন্দির আচণ্ডাল সর্ব্বজাতীয় প্রজার জন্য উন্মুক্ত থাকিলেও বন্দ্যমুখ্যচট্টগণ ঘোষ বসু মিত্রগণের সহিত তাহা অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন, এবং রাজকীয় উচ্চপদ সমূহ জাতিবর্ণধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রদত্ত হইলেও বন্দ্যমুখ্যচট্ট এবং ঘোষ বসু মিত্রগণের সহিত প্রতিযোগিতা করতঃ অপর জাতীয় ব্যক্তিগণ ঐ সকল পদের দুই একটি ক্বচিৎ লাভ করিতে সমর্থ হইতেছেন। এমন অবস্থায় হিন্দু-সমাজে যখন স্মৃতিশাস্ত্রের প্রভুত্ব এবং বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের গৌরব ছিল, যখন এখনকার মত ব্রাহ্মণাদি জাতিসকল বর্ণধর্ম্ম বা জাতি-ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া দাসত্বোপজীবী হইবার প্রয়াসী হন নাই, তখন সম্ভবতঃ এক কায়স্থ জাতি ব্যতীত অপর কোন জাতি রাজসেবাকেই আপনাদের একমাত্র বৃত্তি বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাই আমার বিশ্বাস যে, রামানন্দ যখন স্বপরিচয় মতে শূদ্র, তখন তিনি কায়স্থ জাতীয় ছিলেন। রামানন্দের স্বপরিচয়ে শূদ্রতা স্থাপিত না হইলে তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান এবং উচ্চপদ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নিরূপণ করিত।

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের দক্ষিণাপথ যাত্রা সময়ে আমরা বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট রামানন্দের প্রথম পরিচয় পাই এবং তৎপরে

তার পুত্রগণে মোর সহজই প্রীত ॥
* * * * *
ভবানন্দের পুত্র সব মোর প্রিয়তম।
ইহা সবাকারে আমি দেখি প্রাণসম ॥
প্রতাপরুদ্রের উক্তি, চৈ, চ ; অন্ত্যলীলা, ১০ম পরিচ্ছেদ।

মহাপ্রভু গোদাবরী তীরে উপস্থিত হইলে তথায় গৌরাঙ্গ কৃপায় তাঁহার সহিত রামানন্দের সাক্ষাৎকারে আমাদেরও রামানন্দ-সাক্ষাৎকার ঘটিতেছে। রামানন্দ রায় এই সময়ে বিদ্যানগরে "অধিকারী" অর্থাৎ রাজ-প্রতিনিধি। এই সময়ে উৎকলের রাজা—ইন্দ্রদ্যুম্নপ্রতিম প্রতাপরুদ্রদেব।

উড়িষ্যার ইতিহাস-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে প্রতাপরুদ্র দেবের শাসনকালে বিজয়নগর রাজ্য তাঁহা কর্ত্তৃক পরাজিত হয় এবং তিনি সেতু-বন্ধ পর্য্যন্ত আপন প্রভাব বিস্তার করেন। বৈষ্ণব-কবিগণের গ্রন্থেও প্রতাপ-রুদ্র দেবের বিজয়নগর-বিজয়ের নিদর্শন পাওয়া যায় (১)। এই সময়ে রামানন্দ বিদ্যানগরে রাজ-প্রতিনিধি, এবং বৈদিক ব্রাহ্মণাদি প্রজাগণ কর্ত্তৃক "মহারাজ" সম্বোধনে সমাদৃত এবং "গভীর জ্ঞানী মহাপণ্ডিত" বলিয়া পরিচিত (২)। বিজয়নগরাদি সীমান্ত রাজ্যের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে উৎকল-রাজ ব্যাপৃত থাকায় সম্ভবতঃ এই সময়ে গোদাবরী তীরে রাজমহেন্দ্রী নগরে দক্ষিণ উৎকলের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র দেব রামানন্দ রায়কে "রাজা" উপাধি প্রদান করতঃ রাজমহেন্দ্রীতে প্রেরণ করেন (৩)।

চৈতন্যদেব দক্ষিণ ভ্রমণান্তে পুরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে রামানন্দও বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া চৈতন্যদেবের সহিত ভগবদ্‌প্রেমানুশীলন জন্য শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাগত হন, এবং সম্ভবতঃ এই সময় হইতেই রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন ; কারণ এই সময় অবধি তাঁহাকে সর্ব্বদাই চৈতন্য দেবের সহিত প্রেমভক্তির অনুশীলনে নিরত দেখিতে পাই। তবে এই

(১) যে সময়ে ঈশ্বর আইলা লীলাচলে।
তখনে প্রতাপরুদ্র নাহিক উৎকলে ॥
যুদ্ধরসে গিয়াছেন বিজয়নগরে।
চৈতন্য ভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৩য় অধ্যায়।

(২) এই মহারাজ মহাপণ্ডিত গম্ভীর।
চৈ, চ, ৮ম পরিচ্ছেদ, মধ্যলীলা।

(৩) রাজমহিন্দ্রার রাজা কৈনু রামরায়।
চৈ, চ, অন্ত্য, ১০ পরিচ্ছেদ।

সময়ে, অন্ততঃ প্রতাপরুদ্রদেবের জবৎকাল পর্য্যন্ত যে তাঁহাকে সময় সময় রাজকার্য্য-বিষয়ে আবশ্যক মত মন্ত্রণাদি দিতে হইত, তাহা তাঁহার বৈষ্ণব গ্রন্থে "রাজমন্ত্রী" (১) বলিয়া বর্ণনা থাকায়, অনুমান করিতে পারা যায়।

এইরূপে দেখা গেল, রামানন্দ দীনা পরাধীনা বঙ্গভূমির সন্তান হইয়াও পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজার প্রধান মন্ত্রী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মত একটি বৃহৎ জনপদের প্রধান শাসনকর্ত্তা ও সেনাপতি (২), ছিলেন।

শ্রীরাধেশচন্দ্র শেঠ।

সুবাক্য-ভাণ্ডার।

অনিদ্রা, নিশ্বাস, অশ্রু যত আছে ধনে,
কল্পনা ধরে না তাহা দরিদ্রের মনে।

ধন, পুণ্য, বিদ্যা, বন্ধু, স্বাস্থ্য আছে যার,
স্বর্গের বাসনা মনে কি হেতু তাহার?

ভাবিয়াছ বনে গেলে ঘুচিবে জঞ্জাল;
সঙ্গে যে চলিল মন তাই তব কাল।

বন-বাসে তরু-তল, হর্ম্ম্য রাজ্য-বাসে,
সর্ব্বত্র তৃষ্ণার গতি ভিন্ন ভিন্ন বেশে।

---

(১) রাজমন্ত্রী রামানন্দ ব্যবহারে নিপুণ।
চৈ, চ, মধ্যলীলা, ১২শ পরিচ্ছেদ।

(২) রামানন্দ রায়ের হস্তে যে সেনাপতিত্ব ভার অর্পিত ছিল, তাহা রামানন্দের গৌরাঙ্গ প্রতি নিম্নোদ্ধৃত উক্তি হইতে অনুমিত হইবে:——

"——প্রভু আগে চল নীলাচলে।
মোর সঙ্গে হাতী ঘোড়া সৈন্য কোলাহলে॥
দিন দশে ইহা সবার করি সমাধান।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব প্রয়াণ॥"
চৈ, চ, মধ্য, ৯ম পরিচ্ছেদ।

ভোলা বাবু ঘুম যায়।

ভোলা বাবু ঘুম যায়, ভোলা বাবু ঘুম যায়!
প্রেমদার কোলে শোয়া,
প্রেমের সাগরে ধোয়া,
আরেক নূতন শশী উঠিয়াছে পুনরায়!
ভোলা বাবু ঘুম যায়, ভোলা বাবু ঘুম যায়!

নীল জল নীলাকাশে,
তারি বুঝি ছায়া ভাসে?
দিশাহারা চকোরেরা গগনে ভূতলে চায়!
ভোলা বাবু ঘুম যায়, ভোলা বাবু ঘুম যায়!

প্রেমদার এলো চুলে,
কোলে কাখে কটি-মূলে,
ঝাঁপ দিছে নভ নীল ক্ষীরোদ সিন্ধুর গায়!
ভোলা বাবু ঘুম যায়, ভোলা বাবু ঘুম যায়!

কমল স্তনের বোঁটে,
দুধ খায় রাঙ্গা ঠোঁটে,
তরুণ কিরণে যেন অরুণ চুমিছে তায়!
ভোলা বাবু ঘুম যায়, ভোলা বাবু ঘুম যায়!

প্রেমদা আনত মুখে,
দেখিতেছে মহা সুখে,
পুলকে পলকহীন—চখে মুখে চুমো খায়!
ভোলা বাবু ঘুম যায়, ভোলা বাবু ঘুম যায়!

কানন কুসুম আঁখি,
মেলিয়া দেখিছে নাকি,
চাঁদের কোলেতে আহা চাঁদ কিবা শোভা পায়,
ভোলা বাবু ঘুম যায়, ভোলা বাবু ঘুম যায়!

'ঘু-ঘু-ঘু'র তালে তালে,
বুল্ বুল্ নাচে ডালে,
কোকিল, দয়েল, শ্যামা, সহদেব গীত গায়!
ভোলা বাবু ঘুম যায়, ভোলা বাবু ঘুম যায়!

উড়ায়ে ফুলের রেণু,
বাজাইয়া বন-বেণু,
নিজনে বিজন করে কোমল মলয় বায়!
ভোলা বাবু ঘুম যায়, ভোলা বাবু ঘুম যায়!

আবার উল্লাসে কেঁপে,
সজোরে হৃদয়ে চেপে,
সোহাগে সে সোণামুখী সোণা মুখে চুমো খায়!
ভোলা বাবু ঘুম যায়, ভোলা বাবু ঘুম যায়!

এ দৃশ্য দেখিয়া সুখে,
কি হিংসা জাগিল বুকে, ——
চুমিল উন্মাদ কবি ভোলা ও ভোলার মায়!
ভোলা বাবু ঘুম যায়, ভোলা বাবু ঘুম যায়!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

রাজা রামানন্দ রায়।

(৬)

কামিনীকাঞ্চনকামনাত্যাগ যে প্রকৃত বৈষ্ণবের লক্ষণ তাহা চৈতন্যচরিতালোচনায় সুস্পষ্ট প্রতীত হয়। কামিনীকাঞ্চনত্যাগ না করিলে

যে বৈষ্ণবধর্ম্ম যাজনা হয় না, এরূপ উপদেশামৃত মহাপ্রভু বহুবার প্রদান করিয়াছেন। কামিনীকাঞ্চন সর্ব্ববিধ ধর্ম্মাচরণেরই প্রতিবন্ধকস্বরূপ।

কীর্ত্তনিয়া ছোট হরিদাস মহাপ্রভুর একান্ত অনুরক্ত ভক্ত এবং মহাপ্রভুর সহিত ইষ্টগোষ্ঠীতে প্রেমানন্দরস-সম্ভোগের পক্ষে যে তাঁহার একান্ত অনুরক্ত সার্দ্ধ তিন জন ভক্ত ছিলেন (১), শিখি মাহিতির ভগিনী মাধবী দেবী তাহার অন্যতম। ইনি বৃদ্ধা, তপস্বিনী ও পরম বৈষ্ণবী ছিলেন। এক দিন মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র সখ্যভাবাপন্ন পরম বৈষ্ণব ভগবান্ আচার্য্য, মহাপ্রভুকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করেন ও মাধব দেবীর নিকট হইতে উত্তম তণ্ডুল কীর্ত্তনিয়া হরিদাসের দ্বারা আনাইয়া তদন্ন মহাপ্রভুকে অর্পণ করেন। মহাপ্রভু ভোজনকালে জিজ্ঞাসা করিয়া ছোট হরিদাসের মাধবীর নিকট গমন ও তাঁহার নিকট হইতে তণ্ডুল আনয়নবার্ত্তা অবগত হন এবং বাসায় প্রত্যাগত হইয়া ছোট হরিদাস যেন আর তাঁহার নিকট না আইসে, এইরূপ অনুজ্ঞা করেন। পরমানন্দপুরী ও স্বরূপ দামোদর প্রভৃতির সান্ত্বনা ও অনুরোধেও ছোট হরিদাসের উক্ত অপরাধ মহাপ্রভুর নিকট মার্জ্জনীয় হইল না, তিনি বলিলেন :——

"————বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিঞা।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥" (২)

---

(১) জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন॥
স্বরূপ গোসাঞি আর রায় রামানন্দ।
শিখি মাহিতি তিন আর ভগিনী অর্দ্ধ জন॥
চৈ, চ, অন্ত্যলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ।

(২) " চৈ, চ, অন্ত্যলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ।

সময়ান্তরে ঐ উপলক্ষে ঘৃণার সহিত বলিয়াছিলেন :——

"প্রকৃতি সম্ভাষী বৈরাগী না করোঁ স্পর্শন।" (১)

অনন্যচৈতন্যগতি ছোট হরিদাস দূরে দূরে থাকিয়াই মহাপ্রভু-সন্দর্শন-সুখ লাভ করিতেন। এইরূপে এক বৎসর বিগত হইলেও মহাপ্রভু হরিদাসের মাধবী সকাশে তণ্ডুল ভিক্ষারূপ সামান্য অপরাধ মার্জ্জনা করেন নাই। হরিদাস সেই জন্য মনস্তাপে প্রয়াগ ধামে গিয়া ত্রিবেণী সঙ্গমে ঝাঁপ দিয়া আপন জীবনে জলাঞ্জলি প্রদান করেন।

প্রতাপরুদ্র উৎকলের প্রবল পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজা ছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার রাজ্যে শ্রীক্ষেত্রে বাস করিতেছিলেন। প্রতাপরুদ্রের বাসনা—মহাপ্রভু কটকে গিয়া তাঁহাকে দর্শন দান করেন; কিন্তু মহাপ্রভু সন্ন্যাসী,—রাজসদনে রাজসাক্ষাৎকারে যাইতে ধর্ম্মহানি আশঙ্কায় অসম্মত। সার্ব্বভৌম, নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণও প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দিবার জন্য মহাপ্রভুকে সম্মত করিতে পারেন নাই। অবশেষে রামানন্দ মহাপ্রভুর মত পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন বিশ্বাসে, প্রতাপরুদ্রের সহিত মহাপ্রভুর মিলন-ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়। রামানন্দও যুক্তিবলে মহাপ্রভুর মত পরিবর্ত্তন জন্য সাধ্য পক্ষে চেষ্টা করেন। এই জন্য মহাপ্রভু ও রামানন্দ রায়ে যে কথোপকথন হয়, তাহা হইতে বিষয়ের প্রতি মহাপ্রভুর কিরূপ ভাব ছিল, এবং মহাপ্রভুর সহিত রামানন্দের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা সুস্পষ্ট প্রদর্শিত হইবে বিবেচনায়, উক্ত কথোপকথন কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনা হইতেই এ স্থলে গৃহীত হইল :——

"প্রভু কহে রামানন্দ কহ বিচারিয়া।
রাজাকে মিলিতে জুয়ায় সন্ন্যাসী হইয়া॥
রাজার মিলনে ভিক্ষুকের দুই কুল নাশ।
পরলোকে বহু লোকে করে উপহাস॥
রামানন্দ কহে তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
কারে তোমার ভয় তুমি নহ পরতন্ত্র॥

(১) চৈ, চ, অন্ত্যলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ।

প্রভু কহে আমি মনুষ্য-আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি॥
শুক্ল বস্ত্রে মসীবিন্দু যৈছে না লুকায়।
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়॥
রায় কহে কত পাপী করিয়াছ অব্যাহতি।
ঈশ্বর সেবক তোমার ভক্তগজপতি॥
প্রভু কহে পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দুপাতে কেহ না করে পরশ॥
যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্ব্বগুণবান্।
তাহারে মিলন কৈল এক রাজনাম॥
তথাপি তোমার যদি আগ্রহ হয়।
তবে আনি মিলাহ তুমি তাহার তনয়॥
আত্মবৈজায়তে পুত্র এই শাস্ত্র-বাণী।
পুত্রের মিলনে যেন মিলিলা আপনি॥" (১)

রায় রামানন্দ "ব্যবহারনিপুণ রাজমন্ত্রী" হইয়াও মহাপ্রভুর রাজনামের প্রতি ঘৃণা দূর করতঃ তাঁহাকে প্রতাপরুদ্রের সহিত মিলন জন্য সম্মত করিতে সক্ষম হইলেন না।

যে অপরাধে ছোট হরিদাসকে মহাপ্রভু ত্রিবেণী সঙ্গমে প্রাণ পরিত্যাগ রূপ প্রায়শ্চিত্তে বাধ্য করেন, রাজা রামানন্দ দৃষ্টিতঃ তদপেক্ষাও গুরুতর অপরাধে অপরাধী ছিলেন। কারণ মহাপ্রভু কৃষ্ণ কথার উপদেশ জন্য প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে রামানন্দের নিকট প্রেরণ করিলে, প্রদ্যুম্ন মিশ্র তাঁহার গৃহে গিয়া তাঁহার ভৃত্যগণের নিকট অবগত হন যে রামানন্দ রায় "নৃত্যগীত-নিপুণা কিশোরী সুন্দরী" দেবদাসীকে নিভৃত উদ্যানে রাখিয়া তাহাদিগকে স্বপ্রণীত নাটকের অভিনয় শিক্ষা দিতেছেন এবং প্রদ্যুম্ন মিশ্র আরও জানিলেন যে, রামানন্দ রায়

"———সেই দুই জন লঞা।
স্বহস্তে করেন তার অভ্যঙ্গ মর্দ্দন॥

(১) চৈ চ, মধ্যলীলা, ১২শ পরিচ্ছেদ।

স্বহস্তে করান স্নান গাত্র সম্মার্জ্জন।
স্বহস্তে পরান বস্ত্র সর্ব্বাঙ্গ মণ্ডন॥" (১)

ছোট হরিদাস বৃদ্ধা তপস্বিনী পরম বৈষ্ণবী চৈতন্য দেবের অন্তরঙ্গা ভক্তা মাধবী দেবীর নিকট মহাপ্রভুরই সেবার জন্য তণ্ডুল ভিক্ষা মাত্রাপরাধে মহাপ্রভু কর্ত্তৃক উক্তরূপে গুরুতম দণ্ডে দণ্ডিত হন, আর রাজা রামানন্দ নবীনা কিশোরীর সহিত নিভৃতে অবস্থান ও অসঙ্কোচে দর্শন, স্পর্শন ও গাত্র সম্মার্জ্জনাদি করিলেও মহাপ্রভু শূদ্র রামানন্দকে ব্রাহ্মণ প্রদ্যুম্ন মিশ্রের উপদেষ্টা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না, আর তদুপরি তিনি—

"রজনী দিবসে কৃষ্ণ-বিরহ-বিহ্বলে॥
স্বরূপ রামানন্দ এই দুই জন সনে।
রাত্রি দিনে রসগীত শ্লোক আস্বাদনে"॥ (২)

সময় ক্ষেপণে আনন্দ লাভ করিতেন। আবার রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর দর্শন জন্য ব্যাকুল, এমন কি তাঁহার দর্শন লালসায় রাজ্য সম্পদ্ ত্যাগ করিতে সমুদ্যত, অথচ মহাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন দিলেন না; অপর দিকে সেই মহাপ্রভুই রাজা রামানন্দকে বাদ্যভাণ্ড সহকারে দোলারোহণে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের সহিত ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিত ব্যক্তির ন্যায় গোদাবরী-স্নান করিতে দেখিলেন, সেই রাজা রামানন্দকে দর্শন ও তাঁহার সহিত আলাপ জন্য তাঁহার অনুরোধে বিদ্যানগরে দিনের পর দিন কর্ত্তন করিলেন এবং দক্ষিণ-পর্য্যটন কালে সুদূর দ্বারকা নগরী পরিত্যাগ সময়েও সেই রামানন্দকে স্মরণ করিয়া

"————এইবার নীলাচলে যাব।
নীলাচলে সবে মিলে আনন্দে কাটাব॥
চল বিদ্যানগরে যাইব সবে মেলি।
একা না যাইব পুরী রামরায়ে ফেলি"॥ (৩)

বলিয়া রামানন্দের সাহচর্য্য লাভ জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(১) চৈ চ, অন্ত্যলীলা, ৫ম পরিচ্ছেদ।
(২) চৈ চ অন্তলীলা, ২০ শ পরিচ্ছেদ।
(৩) গোবিন্দ দাসের করচা।

মহাপ্রভু কর্ত্তৃক কীর্ত্তনিয়া ছোট হরিদাসের দণ্ড বা রাজা প্রতাপ-রুদ্রের সাক্ষাৎ প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান কঠোর কাঠিন্যপ্রসূত নহে।' এই উভয়ই লোক শিক্ষার জন্য, আর অভিনয়শিক্ষক রামানন্দের প্রতি তাঁহার সম্মানবুদ্ধি এবং তৎসাহচর্য্যলিপ্সা রাজা রামানন্দের অলোকসামান্য চরিত্রবলের জন্য। রাজা রামানন্দ যে কিরূপ অসাধারণ চরিত্র বলসম্পন্ন ছিলেন, এবং প্রকৃত প্রেমিক ভক্তের কিরূপ কামিনীকাঞ্চনে বিতৃষ্ণা থাকা আবশ্যক, তাহা সর্ব্ব সাধারণকে প্রদর্শন জন্যই তিনি প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে রাজা রামানন্দের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। নৃত্য গীতনিপুণা কিশোরী কামিনীর কমনীয়া মোহিনী মুর্ত্তি ও হাবভাবলাস্যে নিভৃত উদ্যানেও রামানন্দের মন অনড় অটল অচল থাকিত, স্বহস্তে তাহাদিগের গাত্রাদিস্পর্শন মার্জ্জনেও

"————নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন"। (১)

এবং

"কাষ্ঠপাষাণ স্পর্শে হয় যৈছে ভাব।
তরুণী সংস্পর্শে রামানন্দের তৈছে স্বভাব"। (২)

এ হেন অলোক-সামান্য চরিত্রবলসম্পন্ন রামানন্দের সহিত মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেবের দিবা যামিনী যাপন কিছু অন্যায় হয় নাই। এই স্থানেও রামানন্দ-চরিত্রের মহিমা ও মধুরিমা প্রকটিত হইতেছে।

রামানন্দ রায় মহাপ্রভুর কথায় বিদ্যানগরের রাজপদ তুচ্ছ বিবেচনা পূর্ব্বক ত্যাগ করতঃ তাঁহার সাহচর্য্যে ও সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাজপদ ও ঐশ্বর্য্য ত্যাগে ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার আক্ষেপ হয় নাই, বা কোনরূপ "ইতস্ততঃ ভাব" দেখান নাই। রামানন্দের ন্যায় অত সহজে নির্ব্বিকার ভাবে রাজপদ ও ঐশ্বর্য্যত্যাগ অপর কাহারও পক্ষে সম্ভবপর কি?

গোপীনাথ পট্টনায়ক রামানন্দের সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। ইনি এক সময়ে উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্গত মালজাঠ্যা বিষয়ের আদায় তহশীল কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং তদুপলক্ষে গোপীনাথ পট্টনায়কের নিকট উৎকল রাজের বহু মুদ্রা বাকী পড়ে। এই উপলক্ষে গোপীনাথের সহিত কারণান্তরে

(১) চৈ চ, অন্ত্যলীলা, ৫ম পরিচ্ছেদ।
(২) চৈ চ, অন্ত্যলীলা, ৫ম পরিচ্ছেদ।

জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের কিছু মনোভঙ্গও হয়। তজ্জন্য গোপীনাথ পট্টনায়ককে চাঙ্গে চড়াইয়া তাঁহার প্রাণ দণ্ডের আদেশ হয়। এই উপলক্ষে গোপীনাথকে বাঁচাইবার জন্য মহাপ্রভু এবং প্রতাপরুদ্রের নিকট নীলাচলস্থ বহু ভক্তকে অনুনয় অনুরোধ ও প্রার্থনাদি করিতে দেখি। কিন্তু এক সময়ের রাজমন্ত্রী ও রাজার বহুমানাস্পদ বন্ধুস্থানীয় রায় রামানন্দকে গোপীনাথের জন্য একবারও প্রতাপরুদ্রের দ্বারস্থ বা মহাপ্রভুর নিকট স্ফুটবাক্ হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা হইতেই রামানন্দ হৃদয়ের অসাধারণ ধৈর্য্য, নীতিনিষ্ঠা ও মানসিক বলের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

রাজা রামানন্দ উড়িষ্যা রাজের মন্ত্রী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তুল্যায়তন একটি বৃহৎ জনপদের শাসনকর্ত্তা রাজপ্রতিনিধি ও সেনাপতি, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেবের অন্তরঙ্গভক্ত, সুগভীর জ্ঞানী ও মহাপণ্ডিত হইলেও বিনয় তাঁহার নিত্যসহচর ছিল। প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে কৃষ্ণ কথার উপদেশ দিয়া তাঁহার হৃদয় কৃষ্ণপ্রেমে উদ্ভাসিত ও দ্রবীভূত করিয়া, তাঁহাকে বলিলেন :—

"কৃষ্ণ কথা বক্তা করি না জানিহ মোরে।
মোর মুখে কথা কহে আপনে গৌরচন্দ্র॥
যৈছে কহায় তৈছে কহি যেন বীণা যন্ত্র।
মোর মুখে কথা ইহা করে পরচার॥
পৃথিবীতে কে জানিবে এ লীলা তাঁহার।
যে সব শুনিল কৃষ্ণ রসের সাগর॥
ব্রহ্মাদি দেবের এ সব না হয় গোচর।
হেন রস পান মোরে করাইলে তুমি॥
জন্মে জন্মে তোমার পায় বিকাইলাম আমি।" (১)

ইহাপেক্ষা রামানন্দের বিনয়, মহত্ত্ব ও মহানুভবতার উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের বোধ হয় আবশ্যকতা নাই।

শ্রীরাধেশচন্দ্র শেঠ।

---

(১) চৈ চ অন্ত্যলীলা, ৫ম পরিচ্ছেদ।

গোবিন্দ ভাগবত।

এই গ্রন্থখানি প্রাচীন। গোবিন্দ আচার্য্য নামক কোন ব্যক্তি সমুদায় ভাগবতের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করিয়াছেন। গুণরাজ খাঁর শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় অপেক্ষা শ্রীমদ্ভাগবতের সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। গুণরাজ খাঁ কেবল দশম স্কন্ধ অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন, কিন্তু গোবিন্দাচার্য্যের গোবিন্দ ভাগবতে সমুদায় ভাগবতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। সংস্কৃত ভাষায় ভাগবতের ন্যায় শ্রুতিমধুর গ্রন্থ অধিক নাই। গোবিন্দ ভাগবতও শ্রুতিমধুর কবিতায় পরিপূর্ণ। গ্রন্থের প্রথম ভাগ এইরূপ :—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নমঃ।

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকী-নন্দনায়চ।
নন্দ-গোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
তং বেদপরিনিতি শুদ্ধবুদ্ধিং।
চর্ম্মাম্বরং সুর মুনীন্দ্র নুতং কবীন্দ্রং॥
কৃষ্ণত্বিষং কনকপিঙ্গ জটাকলাপং।
ব্যাসং নমামি শিরসাতিলকং মুনীনাং॥
প্রহ্লাদ নারদ পরাশর ব্যাসাম্বরীষ
শুক শৌনকোদ্ধব ভীষ্মকঞ্চবাদ্যাঃ।
রুক্মাঙ্গদার্জ্জুন বসিষ্ঠবিভীষণাদ্যা
এতানহং পরম ভাগবতান্ নমামি॥
শ্রীগোবিন্দ ভাগবত শুন সর্ব্বজনে।
শ্রীগোবিন্দ আচার্য্য বোলে গোবিন্দ-চরণে॥
স্বপ্নে আজ্ঞা কৈল মোরে প্রভু নারায়ণ।
কথাচ্ছলে ভাগবত করিতে রচন॥
তবে আজ্ঞা দিলা গুরু চৈতন্য নিমাই।
সেই সে ভরসায় ভাগবত কথা গাই॥

অপার অগার ভবসিন্ধু তরিবারে।
কথারূপে ভাগবত করিএ প্রচারে॥
সংস্কৃত ভাগবত না বুঝে সর্ব্বজন।
লোকভাষা রূপে কহি শুন ভক্তগণ॥
শুনিলে শ্রবণ-সুখ দুখের বিনাশ।
প্রেমভক্তি বাড়ে বৈকুণ্ঠে হয় বাস॥
ভাষারূপে বলি কেহ হেলা না করিবে।
শুনিলে গোবিন্দলীলা বাঞ্ছিত পূরিবে॥
কামনা করিঞা ইহা শুনে যেই জন।
সর্ব্বসিদ্ধি করে তার প্রভু নারায়ণ॥
ভক্তি করি কৃষ্ণ কথা যে করে শ্রবণ।
তাহার পুণ্যের সীমা না যায় কথন॥
পাপ তাপ রোগ শোক খণ্ডে যম ভয়।
পুনরপি জন্মমৃত্যু সংসারে না হয়॥
অপুত্রের পুত্র হয় দরিদ্রের ধন।
কোটি যজ্ঞ ফল পায় বন্ধবিমোচন॥
যার গৃহে পাঠ হয় গ্রন্থের পূজন।
আপনে থাকেন তথা লক্ষ্মীনারায়ণ॥
ধন ধান্যে পুত্রে পৌত্রে হয় চিরজীবী।
অন্তকালে বাস তার হয় স্বর্গপুরী॥
বাসুদেব প্রসঙ্গে পবিত্র তিন জন।
যে শুনায় যেবা কহে যে করে শ্রবণ॥
যেন মতে বিষ্ণুপদে হৈলা সুরধনী।
স্বর্গমর্ত্তত্রিভুবন নিস্তারকারিণী॥
ভবসিন্ধু তরিতে আর নাহিক উপায়।
কৃষ্ণকথা শুনিলে সর্ব্ব এড়াইবে দায়॥
কৃষ্ণকথা শুনিতে যার শ্রদ্ধা না জন্ময়।
অসুর সমান সেই নরাধম হয়॥

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব গুরু জ্ঞাতিবন্ধু লৈঞা।
অষ্টাদশ দিবসাবধি নিয়ম করিঞা॥
বৈষ্ণবের মুখে ইহা করিবে শ্রবণ।
অনায়াসে হবে মনোবাঞ্ছিত পুরণ॥
যার যেই মনে থাকে বাঞ্ছিত করিঞা।
শুনিবে গোবিন্দ-কথা এক চিত্ত হৈঞা॥
বেদব্যাস ভাগবত করিলা রচিত।
শুকদেব কহেন শুনে রাজা পরীক্ষিৎ॥
চারি শ্লোকে ভগবান্ ব্রহ্মাকে কহিলা।
ব্রহ্মা কৃপা করি নারদেরে শুনাইলা॥
নারদ কহিলা তবে ব্যাসদেবের তরে।
ব্যাসদেব পড়াইলা শুক মুনিবরে॥
শুক মুনি শুনাইলা রাজা পরীক্ষিতে।
সেই ভাগবত নর শুন পৃথিবীতে॥
এই কথা পরীক্ষিৎ করিঞা শ্রবণ।
আপনি তরিল তরাইল ত্রিভুবন॥

ইহার পর পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর শুকদেবের মুখে পরীক্ষিতের ভাগবত-শ্রবণ আরম্ভ হইয়াছে।

গ্রন্থকার চৈতন্যদেবকে অবতার শ্রেণীর মধ্যে ফেলাইয়া তাঁহার সমস্ত লীলা সূত্রাকারে বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাতে বোধ হয় চৈতন্যের অন্তর্দ্ধানের পর গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র, অথচ ইহার পাঠে অষ্টাদশ দিবসের সঙ্কল্প করিতে হইবে, গ্রন্থকারের এইরূপ অনুজ্ঞা। গ্রন্থের মধ্যে মধ্যে অনেক উপাখ্যান সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। কথক দেবীতে বসিয়া সে গুলির ব্যাখ্যা করিলে অষ্টাদশ দিবস লাগিতে পারে।

গ্রন্থকারের সময় সত্য নারায়ণের পূজা প্রচলিত ছিল। অনেকের বিশ্বাস, মুসলমানদের সত্যপীরকে হিন্দুরা সত্যনারায়ণ করিয়া লইয়াছেন,

এ কথা সত্য কিনা বলিতে পারি না। গ্রন্থকার অবতার বর্ণনা কালে লিখিয়াছেন ;——

দান ব্রত তপোযজ্ঞ করিলা প্রকাশ।
চারি যুগে সত্যরূপে করেন নিবাস॥
তবে অংশরূপে হৈলা সত্যনারায়ণ।
নানারূপে সেবা তার কৈল মুনিগণ॥
অদ্যাপিহ সেই সেবা করে ত্রিভুবনে।
মনের বাঞ্ছিত পূর্ণ করেন আপনে॥

আমার বোধ হয় পূর্ব্ব হইতেই সত্যনারায়ণের পূজা প্রচলিত ছিল। পরধর্ম্মদ্বেষী মুসলমানদিগের নিকট সত্যনারায়ণ না বলিয়া সত্যপীর বলিয়া হিন্দুরা তাহাদের দৌরাত্ম্য হইতে উদ্ধার লাভ করেন।

কবি বুদ্ধাবতার বর্ণনা প্রসঙ্গে বামাচার শাক্তগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,——

একবিংশে কৈলা হরি বৌদ্ধ অবতার।
বামাচারী শাক্তধর্ম্ম করিলা প্রচার॥
নমুচি অসুর সঙ্গে করি দৈত্যগণ।
পুনঃ পুনঃ ইন্দ্রসনে করে মহারণ॥
তেকারণে তা সভারে করিতে দমন।
দেবীদাস নামে এক হইলা ব্রাহ্মণ॥
রক্ত মাংস বলি দিঞা পূজা আরম্ভিলা।
ছল করি ফল শ্রুতি তাহাকে শুনাইলা॥
বলপরাক্রম হবে শুনি দুষ্টগণ।
শিষ্য হঞা সেই মত করিল গ্রহণ॥
যেই যাকে বধে সেই পুনঃ বধে তারে।
পুনঃ জন্মে পুনঃ মরে অদ্যাপি সংসারে॥
পাষণ্ডের ধর্ম্ম প্রভু স্থাপিঞা আপনে।
সুস্থির করিলা ইন্দ্র আদি দেবগণে॥

কল্কি অবতার বর্ণনায় লিখিয়াছেন,——

দ্বাবিংশে হইবে প্রভু কল্কি অবতার।
কলিযুগে শেষে হইবে তাহার প্রচার॥
কলির প্রভাবে লোক হবে ম্লেচ্ছাকার।
ম্লেচ্ছ সংহারিতে প্রভু হবে অবতার॥

অতঃপর কথার ন্যায় বলিয়াছেন, যথা ঃ——

অল্পায়ুঃ হবেঃ ছোট দেহঃ ভক্ষণ বহুঃ ধর্ম্মহীন বৃত্তিহীন লোকঃ শাস্ত্র নিন্দাঃ মিথ্যা বাক্যঃ তপজপবেদহীন দ্বিজঃ ধনলোভী ছল গ্রথী রাজাঃ প্রজা দুঃখীঃ দুষ্টমতিঃ ধর্ম্ম সত্যহীনঃ, কন্দল কামক্রোধ লোভযুক্তঃ দুষ্টবুদ্ধিঃ পরপীড়া পরহিংসাঃ নিন্দাঃ প্রীতিহীনঃ ইষ্টমিত্র জ্ঞাতিবন্ধুত্যক্তঃ অল্প বলঃ বুদ্ধ্যল্পঃ ষটেশ্বর হবে রাজাঃ ধর্ম্ম একপাদঃ অন্তেক্ষয়ং এক বর্ণং ভবতি কলৌত্যন্তে। মূল পুস্তকে ছেদসূচক "ঃ" চিহ্ন আছে, উহা বিসর্গ নহে।

সমুল গ্রামেতে বিষ্ণুযশার মন্দিরে।
প্রকট হবেন প্রভু কল্কি মহাবীরে॥
অশ্ব উপরি চড়ি খড়্গ চর্ম্ম লৈঞা।
যত ম্লেচ্ছ রাজা হবে ফেলিবেন কাটিঞা॥
সত্যযুগ ধর্ম্ম লোকে স্থাপিঞা ভগবান্।
আপনার নিজ ধামে করিবেন পয়ান॥
শ্রীগোবিন্দ ভাগবত শুন ভক্তগণে।
শ্রীগোবিন্দাচার্য্য ভণে গোবিন্দ চরণে॥

রামাবতারের প্রায় অধিকাংশ সূচীর আকারে সংস্কৃত গদ্যে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা যে গ্রন্থ পাইয়াছি লেখকের দোষে তাহাতে এত অশুদ্ধি ঘটিয়াছে যে, অনেক স্থলের অর্থবোধ হওয়া দুর্ঘট।

কৃষ্ণলীলারও অধিকাংশ সূচীর আকারে সংস্কৃত গদ্যে রচিত। অতএব গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সংস্কৃতাংশ গদ্যময়;

বাঙ্গালা অংশ পদ্যময়। গ্রন্থের শেষভাগ এইরূপ——

চব্বিশ অবতারে হরি যে যে লীলা কৈল।
প্রথম স্কন্ধাবধি সম্যক্ ভাগবত হৈল॥

অস্যানুবাদ——

প্রথম স্কন্ধে পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ কথনং। দ্বিতীয় স্কন্ধে সৃষ্টি সৃজনং। তৃতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মাণ্ড নির্ণয়ং। চতুর্থ স্কন্ধে সমুদ্র মন্থনং। পঞ্চম স্কন্ধে প্রহ্লাদ চরিত্র বর্ণনং। ষষ্ঠ স্কন্ধে বামন চরিত্রকং। সপ্তম স্কন্ধে রঘুনাথ চরিত্রং। (অষ্টম স্কন্ধের উল্লেখ নাই)। নবম স্কন্ধে বংশাবলী চরিত্রং। দশম স্কন্ধে কৃষ্ণলীলা চরিত্রং। একাদশে ভক্তিযোগ কথনং। দ্বাদশ স্কন্ধে পরীক্ষিতের স্বর্গারোহণ। ইতি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে (পড়া যায় না)

উদ্ধৃত অংশের অশুদ্ধি সংশোধনের প্রয়াস পাই নাই। আদর্শ পুস্তকে যেমন আছে, তেমনি লিখিত হইল। আমরা প্রবন্ধের প্রথমে এই গ্রন্থকে ভাগবতের অনুবাদ বলিয়া বোধ হয় ভুল করিয়াছি। ভাগবতের উপাখ্যানের সারভাগ ইহাতে লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া ইহার আদর হওয়া উচিত।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

দয়ানন্দ আশ্রম।

(১)

ব্রজরাজ বলিলেন "সাবিত্রী আজ যাহা শুনিলাম তাহাতে আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছি না।"

সাবিত্রী। কি শুনিলে?

ব্রজরাজ। প্রতি গৃহ মৃত দেহে পূর্ণ, রাজপথে রাশীকৃত শব! প্রতিদিন শত শত রোগী শুশ্রূষা অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে; ভয়ে কেহ রোগিদেহ স্পর্শ করে না, ক্ষুধিত শিশু মৃত জননীর বক্ষঃস্থলের উপর শয়ন করিয়া স্তন হইতে রুধিরধারা পান করিতেছে, তাহারও পানে কেহ ফিরিয়া চাহিতেছেনা, যে যেদিকে সুবিধা পাইতেছে সে সেই দিকে পলায়ন

করিতেছে। যদি শীঘ্র এ রোগের উপশম না হয় তাহা হইলে গৌড় অচিরে জনশূন্য হইবে।

সাবিত্রী। সকলই সেই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা, তুমি আমি মানুষ, তাঁহার ইচ্ছার প্রতিরোধ কে করিবে?

ব্রজরাজ। তাঁহার ইচ্ছার প্রতিরোধে কাহারও শক্তি নাই কিন্তু তাঁহার আজ্ঞা পালনে তোমার আমার শক্তি আছে।

সাবিত্রী। কি করিতে চাও।

ব্রজরাজ। আমি যাই, তুমি কিছু দিন একাকিনী থাক, এ বিপদের সময় যদি একটি রোগীকে শুশ্রূষা দ্বারা বাঁচাইতে পারি, একটি মুমূর্ষুর প্রাণ রক্ষা করিতে পারি তাহা হইলে সেই অনাথনাথ যে উদ্দেশ্যে আমাদিগকে মনুষ্য রূপে সৃজন করিয়াছেন তাহার কথঞ্চিৎ স্বার্থকতা হইবে।

সাবিত্রী। যে স্থান সকলে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে সেখানে তুমি কেমন করিয়া যাইবে? যদি নিজের কিছু বিপদ ঘটে!

ব্রজরাজ। সাবিত্রি! তুমি এখনও বালিকা, নিজের বিপদের দিকে লক্ষ্য করিলে পরোপকারব্রত হয় না। প্রাণ যায় পরের জন্য যাইবে।

সাবিত্রী। একজনকে মারিয়া আর একজনের প্রাণ রক্ষা কি ধর্ম্ম?

ব্রজরাজ। একজনকে মারিব কেন?

সাবিত্রী। মারিবে না কিসে? আপনাকে মারিবে, আমাকে মারিবে, তবু একটি প্রাণও বাঁচাইতে পারিবে কি না জানি না।

ব্রজরাজ। তবে কি তুমি আমাকে যাইতে নিষেধ কর?

সাবিত্রী। নিষেধ করি না, তুমি আমাকে কখন সে শিক্ষা দাও নাই। তুমি পরের জন্য, ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিবে আমি তোমাকে নিষেধ করিব? তবে আমি তোমার সহধর্ম্মিণী, তুমি যে ধর্ম্মকার্য্য করিবে, আমি তোমার কাছে কাছে থাকিয়া সেই ধর্ম্মকার্য্যের সহায়তা করিব—ইহাতে আমার অধিকার আছে, পুণ্য আছে, স্বর্গ আছে।

ব্রজরাজ। সে কথা সত্য বটে, কিন্তু এ সময় নয়।

সাবিত্রী। ইহার আবার সময় অসময় কি? আমিতো তোমার

কেবল গৃহসজ্জার সামগ্রী নই—কেবলমাত্র বিলাসেরও উপকরণ নই, তুমিইতো এ শিক্ষা দিয়াছ নাথ!

ব্রজরাজ। তবে তুমি কি করিতে চাও?

সাবিত্রী। তুমি চল আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

ব্রজরাজ। ছি—

সাবিত্রী। নিষেধ করিওনা, নিষেধ থাকিবে না, কেন আমার পাপ বাড়াইবে। আমি জানি তুমি নিশ্চয় যাইবে, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। তুমি অনাথের রুগ্ন শয্যা পার্শ্বে বসিয়া থাকিবে আমি অঞ্জলি করিয়া তাহার তৃষ্ণার জল আনিয়া দিব।

ব্রজরাজ সবিস্ময়ে সাবিত্রীর মুখপানে চাহিলেন, দেখিলেন পুণ্য এবং পবিত্রতার সন্নিবেশ! তিনি মনে মনে আপনাকে ধন্য মানিলেন।

(২)

গৌড় নগরীর প্রান্ত দেশে ক্ষুদ্র একটি কানন! গৌড় যে মহামারীতে ধ্বংস হইতেছে সে কাননের কলকণ্ঠ পক্ষীগুলি তাহা জানে না; তাহারা এখনও প্রভাতে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায় কুসুমিত তরুশাখায় বসিয়া কল স্বরে গান করে। সেই কাননতলে, প্রকৃতির স্বহস্তনির্ম্মিত লতা-কুঞ্জ-পার্শ্বে ঘনসন্নিবিষ্ট বিটপিশ্রেণীর পত্রান্তরাবলীর সুস্নিগ্ধ ছায়াতলে দুইজন তরুণ সন্ন্যাসীর একখানি ক্ষুদ্র কুটীর! সন্ন্যাসী দুইটিকে দেখিলে মনে হয় জ্ঞান ও বৈরাগ্য একত্র হইয়া এ পৃথিবীতে আসিয়াছেন। সন্ন্যাসী দুইটির মধ্যে যাঁহার বয়স অনুমান পঞ্চবিংশতি বর্ষ, তাঁহার নাম জ্ঞানানন্দ; আর যাঁহার বয়স অনুমান সপ্তদশ বর্ষ—তাঁহার নাম দয়ানন্দ; জ্ঞানানন্দ দয়ানন্দকে 'দয়া' বলিয়া সম্বোধন করেন।

সন্ন্যাসিদ্বয়ের আশ্রম পূর্ব্বে এখানে ছিল না; এই দারুণ মহামারীর সময় আ'জ কয়দিন হইল যেন কোন দেবকার্য্যে ব্রতী দেবদূতের ন্যায় আসিয়া এই স্থানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই ঘোর বিপ্লবের সময় তাঁহারা দুইজনে যাহা করিতেছেন তাহা বুঝি দেবতারও অসাধ্য। দুইজনে প্রভাতে উঠিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করেন, প্রতি গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রতি রুগ্ন শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রোগীর শুশ্রূষা করেন, তরুতলশায়ী অনা-

থের রুগ্ন শয্যা পার্শ্বে বসিয়া জনক জননীর ন্যায় অশ্রু বিসর্জ্জন করেন, গলিত মৃত দেহ বুকে করিয়া লইয়া গিয়া গঙ্গার শান্তিময় গর্ভে ভাসাইয়া দিয়া আসেন। হতাশকে আশ্বাস দেন, রুগ্নকে অভয় দেন, তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলে রোগীর মৃত্যুযন্ত্রণা হ্রাস হয়, রোগিদেহে যেন বল সঞ্চার হয়। কাহারও তৃষ্ণার জল দিতেছেন, কাহারও পথ্য রন্ধন করিয়া দিতেছেন, কাহারও উচ্চ আর্ত্তনাদের অশ্রুজল দুইজনে সযত্নে মুছাইয়া দিতেছেন, কঙ্কালাবশিষ্টা জননীর প্রাণপ্রিয়তম পুত্রটিকে কোলে করিয়া ঘুম পাড়াইতেছেন। নগরের চারিদিকে আর্ত্তনাদ, চারিদিকে যেন বিকট বিভীষিকা নৃত্য করিতেছে, মহানগরী যেন মহাকালের সুসজ্জিত শ্মশানভূমি হইয়াছে, সন্ন্যাসিদ্বয়ের ভয় নাই, উদ্বেগ নাই, সর্ব্বদা হাস্যবদন, সর্ব্বদা দেবকার্য্যে ব্রতী!

আষাঢ় মাসের শেষ, রাত্রি হইতে টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে, প্রভাতে উঠিয়া জ্ঞানানন্দ বলিলেন "দয়া! আ'জ বড় দুর্দ্দিন, কুটীরে থাক, আমি আজ একাকীই যাইব।"

দয়া। প্রভুর সঙ্গই আমার সুদিন, যে টুকু সময় পৃথক্ থাকি, সেই টুকু সময়ই আমার দুর্দ্দিন বোধ হয়।

জ্ঞানানন্দ। না— তোমার শরীর দিন দিন ক্ষীণ এবং মলিন হইতেছে, শরীর নষ্ট করিয়া ব্রত সাধন করা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নয়।

দয়া। শরীর তো আমার নয়, ধর্ম্মও শরীরের নয়, তবে আর দেহনাশে ভয় কি?

জ্ঞানানন্দ। সে সব কথা তোমাকে পরে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিব, আ'জ আমার আদেশ, তুমি আ'জ কুটীরেই থাক।

দয়ানন্দ আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, জ্ঞানানন্দ আপনার কমণ্ডলুটি হস্তে করিয়া কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন। যতক্ষণ জ্ঞানানন্দকে দেখা গেল ততক্ষণ দয়ানন্দ নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার সেই মত্তমাতঙ্গ গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, যখন আর দেখা গেল না, তখন আপনার নবীন জটাভার খসাইয়া দিলেন, কুশাসন ছিল—পাতিয়া তাহার

উপর শয়ন করিলেন ; জ্ঞানানন্দের দয়া, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সত্য, সরলতা, স্নেহ-ভালবাসা স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার নয়ন দুটি অশ্রুপ্লাবিত হইল।

(৩)

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বৃক্ষপল্লবের অভ্যন্তরস্থ অন্ধকার ধরাতলে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে ; তখনও জ্ঞানানন্দ কুটীরে আসেন নাই, দয়ানন্দের মন বড় উদ্বিগ্ন হইল, তখনও আকাশের মেঘ পরিষ্কার হয় নাই, কুটীরের আশেপাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতাগুল্ম-পরিবৃত বনের ভিতর শৃগালগুলি ডাকিতে লাগিল ; ক্রমে অন্ধকার গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল, তথাপি জ্ঞানানন্দ আসিলেন না। দয়ানন্দ সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসীর আবার ভয় কি ? তবু দয়ানন্দের হৃদয়ে একটু একটু ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে কুটীরের বাহিরে আসিয়া এক এক বার পথ পানে চাহিয়া দেখিতেছিলেন, কিন্তু রাত্রি যখন গাঢ় হইল তখন তিনি আর কুটীরের বাহির হইতে পারিলেন না, কুটীরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দীপালোক সম্মুখে কুশাসনে উপবেশন করিয়া—জ্ঞানানন্দের কুশল জন্য সর্ব্ববিপদহারী ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন।

রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহরের সময় জ্ঞানানন্দ কুটীর দ্বারে আসিয়া ডাকিলেন "দয়া"।

দয়ানন্দ মৃতদেহে যেন প্রাণ পাইলেন, শশব্যস্তে দ্বার উন্মোচন করিয়া বলিলেন "বড় ভাবিতেছিলাম, এত বিলম্ব কেন ?"

জ্ঞানানন্দ। আজ হইতে জগদম্বা তোমাকে একটি নূতন ব্রতে ব্রতী করিলেন, এই দেখ সে ব্রতের একটি সামগ্রী আনিয়াছি। জ্ঞানানন্দ কুটীরে প্রবেশ করিলে দয়ানন্দ দেখিলেন স্ফুটনোন্মুখযৌবনা একটি চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া সুন্দরী বালিকা! একটু হাসিয়া বলিলেন "এ সামগ্রী কোথায় পাইলে ?"

জ্ঞানানন্দ। পথে কুড়াইয়া পাইলাম, কুমারী ব্রাহ্মণ কন্যা অনাদর করিও না ; ইহার নাম মালতী! ইহাকে সঙ্গে করিয়া ইহার জনকজননী গৌড় ত্যাগ করিয়া যাইবার সংকল্প করিয়া গৃহের বাহির হইয়াছিল। কিন্তু

পথিমধ্যে দুই জনেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ভগবান্ ইহার তোমার আমার হস্তে দিয়াছেন।

মালতীর মুখপানে চাহিয়া তাহার বিপদের কথা শুনিয়া দয়ানন্দের চক্ষুঃজল উছলিয়া পড়িল, আপন গৈরিক বসনাঞ্চল দিয়া সযত্নে মালতীর সিক্ত শরীর সিক্ত নয়ন দুটি বার বার মুছাইয়া দিতে লাগিলেন ; তাহার পর দিন হইতে জ্ঞানানন্দের কর্ম্মক্ষেত্র নগরে, দয়ানন্দের কর্ম্মক্ষেত্র হইল কুটীরে, জ্ঞানানন্দের ব্রত রুগ্নের সেবা, দয়ানন্দের ব্রত মালতীর সেবা!

(৪)

তিন মাস কাটিয়া গেল, মালতী জ্ঞানানন্দ ও দয়ানন্দের যত্নে স্নেহে পিতৃমাতৃশোক বিস্মৃত হইল। সে এখন নিতান্ত বালিকা নহে; তাহার আশ্রয়-দাতা দুইজন নবীন সন্ন্যাসীর উচ্চ হৃদয়ের উচ্চ আকাঙ্ক্ষাগুলি সে এখন বুঝিতে পারে! দিনে দিনে যতই তাঁহাদের কর্ম্মযোগের সাধনা দেখিতে লাগিল, ততই তাহার মনে মনে ধারণা হইতে লাগিল—ইঁহারা দুইজন মানুষ নহেন, বুঝি কোন দেবতা, মানুষের বিপদের দিনে মানুষ হইয়া ইঁহারা পৃথিবীতে আসিয়াছেন।

মালতী অর্দ্ধস্ফুটযৌবনা বালিকা, তাহার দেহলতা এখন ঈষৎ মুকুলিতা, হৃদয়-বৃত্তিও ঈষৎ মুকুলিত হইয়াছে, প্রথম যৌবনোচিত ব্রীড়া-বনত নয়ন দুটি তুলিয়া জ্ঞানানন্দ ও দয়ানন্দের পানে ভাল করিয়া চাহিতে পারে না। সকল অপেক্ষা তাহার অধিক লজ্জা দয়ানন্দের কাছে। জ্ঞানানন্দ অপেক্ষা দয়ানন্দ কিছু পরিহাসরসিক, জ্ঞানানন্দ অপেক্ষাও দয়ানন্দের কণ্ঠস্বর বড় কোমল বড় মিষ্ট! মালতীর কাছে জ্ঞানানন্দ যতটুকু গম্ভীর দয়ানন্দ ততটুকু নহেন, জ্ঞানানন্দের স্নেহ ভালবাসা জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায়, দয়ানন্দের স্নেহ ভালবাসা সমবয়সী সখার ন্যায়। জ্ঞানানন্দকে দেখিলে মালতীর ভক্তিরস উছলিয়া উঠে, দয়ানন্দকে দেখিলে তাহার ভাল বাসিতে সাধ যায়। দুইজন সন্ন্যাসীরই কান্তি সুন্দর, ইহারই মধ্যে মালতীর কাছে দয়ানন্দ আরও যেন সুন্দর! মালতী বড় বিপদে পড়িল, দিনে দিনে দয়ানন্দের কাছে তাহার লজ্জা বাড়িতে লাগিল, যতই লজ্জা বাড়িতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে দয়ানন্দেরও

উপর শয়কৌতুক বাড়িয়া উঠিল—জ্ঞানানন্দ মালতী হইতে ততই দূরে থাকিতে ভালবাসালেন।

যৌবনাঙ্কুর উদ্ভিন্ন হওয়ার পর হইতে মালতীর মন কি যেন অন্বেষণ করিতেছিল, কি অন্বেষণ করিতেছিল তাহা সে জানে না। যে রূপ, গুণ, সহৃদয়তা প্রণয়ের অস্থিপঞ্জর মালতী সে সবগুলিই দয়ানন্দে দেখিতে পাইল; সে পৃথিবীর কাহাকেও বলিল না; কিন্তু মনে মনে দয়ানন্দকে ভাল বাসিল, যাহা খুজিতেছিল তাহা যেন কুড়াইয়া পাইল।

মালতী বড় গোপনে এ নবীন অনুরাগ টুকু পোষণ করিতেছিল, কিন্তু দয়ানন্দ বড় চতুর, তাহার কাছে আর লুকাইয়া রাখিতে পারিল না; দয়ানন্দ মালতীর অনুরাগ লক্ষণগুলি নিঃশব্দে দেখিতেন, আর আপন মনে হাসিয়া আকুল হইতেন।

এক দিন তিনি হাসিতে হাসিতে জ্ঞানানন্দকে বলিলেন "আমার নূতন ব্রতে বড় কুফল ফলিল, মালতী বড় ভ্রমে পড়িয়াছে, সে আমাকে ভাল বাসিয়াছে, এইবার বুঝি আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম নষ্ট হয়।"

জ্ঞানানন্দ হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন "সন্ন্যাসী আবার না হয় গৃহী হইবে, কিন্তু মালতীর আশা মিটিবে কি?"

দয়ানন্দ। মিটাইতে পারিলে মিটিবে, কিন্তু তাহাতে আর কাজ নাই, আ'জ মানা করিয়া দিব।

জ্ঞানানন্দ। এখন নয় আরও কিছু দিন যা'ক। শোকসন্তপ্তা বালিকা একটা অবলম্বন পাইয়াছে। যখন আমাদের ব্রত উদ্‌যাপিত হইবে, তখন তাহার মঙ্গলের একটা বিধান করিয়া মানা করিয়া দিও।

দয়ানন্দ ও জ্ঞানানন্দের নয়নে নয়নে আবার সেই প্রেমাকর্ষণপূর্ণ হাস্য; জানি না এই দুই জন সন্ন্যাসী কে?

(৫)

আশ্রমহরিণীর ন্যায় মালতী সে কানন দেশে বিচরণ করিত; জ্ঞানানন্দ যখন কুটীর হইতে বাহির হইয়া যাইতেন, তখন মালতী পুষ্পিত তরুগুলি হইতে কুসুম চয়ন করিয়া আনিত। অতি যত্ন করিয়া মালা গাঁথিত, আর সেই মালা গাছটি দয়ানন্দের হাতে দিয়া বলিত "তুমি পর"।

দয়ানন্দ কুশাসনে শয়ন করিতেন মালতী নব নব তৃণ, নবীন পল্লব, পুষ্পগুচ্ছ আনিয়া দয়ানন্দের কুশাসন নিম্নে পাতিয়া দিত। দয়ানন্দ এক এক দিন মধ্যাহ্ন সময়ে কৃত্রিম নিদ্রায় নিদ্রিত হইতেন, তাঁহার ললাটদেশে স্বেদবিন্দু ফুটিয়া উঠিত; মালতী অতি সাবধানে পার্শ্বে বসিয়া অঞ্চলের বাতাস দিত। দয়ানন্দের কোন অঙ্গ ঈষৎ স্পন্দিত হইলেই অতি দ্রুত পদে পলায়ন করিত। এমনি ভাবে কয়েক দিন গেল, এক দিন কিন্তু মালতী আর পলাইতে পারিল না। সেদিন যেমন পলাইতে যাইবে, অমনি দয়ানন্দ তাহার অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করিলেন, বলিলেন "মালতি, পলাইওনা, শুন তোমাকে আমার কিছু বলিবার আছে।"

মালতী লজ্জায় যেন মরিয়া গেল।

দয়ানন্দ বলিলেন "দেখ মালতী, তুমি যে আমাকে ভাল বাসিয়াছ, তাহা আমি জানিয়াছি, আমার কাছে লুকাইওনা সত্য করিয়া বল, তুমি কি আমাকে বিবাহ করিবে?"

মালতীর বদনমণ্ডল আরক্ত হইল, নবপল্লবিনী লতিকার মত গ্রীবাদেশ ঈষৎ হেলাইয়া বলিল "হুঁ!"

দয়ানন্দ হাসিলেন, বলিলেন "আমি সন্ন্যাসী, আমাকে বিবাহ করিয়া তোমার কি সুখ? বিশেষ জ্ঞানানন্দ ঠাকুর বড় রাগ করিবেন।"

"কেন?"

"তাঁহার ইচ্ছা। তিনি তোমাকে বিবাহ করেন।"

মালতী জোর করিয়া অঞ্চল ছাড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেল, অবরুদ্ধ কণ্ঠে কুটীরের বাহিরে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল, কেন তাহা জানি না।

দুর্দ্দিন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী চির দিন থাকে না, ইহা সৃষ্টির নিয়ম; বর্ষোপগমের সঙ্গে সঙ্গে গৌড়ের মহামারী প্রশমিত হইল, কিন্তু গৌড় তখন প্রায় জনশূন্য হইয়াছে, আশ্বিন মাসের শেষে দয়ানন্দ জ্ঞানানন্দকে বলিলেন "আর কত দিন?"

জ্ঞানানন্দ। আর বিলম্ব নাই, ধ্বংসাবশেষ গৌড়ের মধ্যে এখন যাহারা আছে তাহারা সম্পূর্ণ নিরাপদ, আমাদের ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

দয়া। তবে আর কেন, এ আশ্রম ভঙ্গ হউক।

জ্ঞানানন্দ। আমারও ইচ্ছা তাহাই, মালতীর একটা কিছু করিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হই।

দয়া। মালতীর জন্য ভাবনা কি, সে তো আমাকে বিবাহ করিবে। আমি মালতীকে লইয়া গৃহস্থাশ্রম করিব।

জ্ঞানানন্দ। অতি সুন্দর পরামর্শ, কিন্তু ভাবনা এই আমার কমণ্ডলু পরিষ্কার করিবে কে? বিবাহ হইবে কোন মতে?

দয়া। গান্ধর্ব্ব মতে।

জ্ঞানানন্দ। হইবে কবে?

দয়া। আজই সন্ধ্যার পর, তুমি বরযাত্র!

জ্ঞানানন্দ। দেখিও সাবধান, শেষে যেন মালতী কাঁদিয়া না মরে।

দয়া। সে উপায় আমার হাতে আছে।

(৭)

সন্ধ্যা বেলায় অতি নির্জ্জনে দাঁড়াইয়া, দয়ানন্দ মালতীকে বলিলেন "দেখ মালতি, আ'জ বড় শুভ দিন, আ'জ তুমি আমায় বরমাল্য দাও।"

মালতী ফুল তুলিতে গেল, তাহার অধরান্তরালের মৃদু হাস্য তখন ঈষৎ ভ্রূকুটিত হইয়াছিল।

জ্ঞানানন্দ দয়ানন্দের কাছে আসিলেন, বলিলেন "তোমাদের বিবাহের আগে একটা শুভ সংবাদ শুন, মালতীর আর একজন বর আসিয়াছেন, তোমাদের বিবাহের আগে তিনি আমাদিগের কুটীরে আসিবেন,—আমি নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছি।

দয়া। এই বুঝি তোমার সুসংবাদ, আমার এত সাধের বিবাহের একটা কণ্টক তুমি আবার কোথা হইতে জুটাইলে? তাঁহার পরিচয় কি তুমি জান?

জ্ঞানানন্দ। জানিতাম না, সাক্ষাতের পর কথায় কথায় জানিলাম, তিনি মুর্শিদাবাদের একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবক, সুশিক্ষিত, সুরূপ। মহামারীর সময় রুগ্ন পিতাকে লইয়া দেশে গিয়াছিলেন, পিতা আরোগ্য লাভ করিয়া (গৌড় নগরে তাঁহাদের অনেক কারবার, তাই) গত কল্য এখানে

আসিয়া পঁহুছিয়াছেন। তিনি আপনা হইতেই মালতীর অন্বেষণ করিতেছিলেন, মালতীর পিতা মাতা নাকি তাঁহারই সহিত মালতীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন।

দয়া। মালতী তাঁহাকে জানে?

জ্ঞানানন্দ। তাঁহার মুখে যেরূপ শুনিলাম তাহাতে বোধ হয় জানা শুনা আছে, মালতীর প্রতি তাঁহার স্নেহ অনুরাগ আছে।

দয়া। এই বুঝি তোমার সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, আমার ধন কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে দিবে, মালতী যদি বিবাহ করে তাহা হইলে আমার এ সন্ন্যাসাশ্রম ঘুচিবে কি? জ্ঞানানন্দ ঈষদ্ধাস্য করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

মালতী ফুল তুলিয়া আনিল, দয়ানন্দ বলিলেন "মালা গাঁথ।"

মালতী মালা গাঁথিতে বসিল।

দয়ানন্দ মালতীর কাছে বসিলেন, বলিলেন দেখ মালতি, তুমি আমার মত সুন্দর পুরুষ আর কখন দেখিয়াছ কি?"

মালতী বলিল "না"

দয়া। ইহা অপেক্ষা আমার আরও সুন্দর মূর্ত্তি আছে তুমি তাহা দেখিবে?

মালতী তেমনি করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল "দেখিব!"

দয়ানন্দ একটি বৃক্ষের অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইলেন, কিছুক্ষণ পর বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া মালতীর সম্মুখে আসিয়া দেখা দিলেন; মালতী দেখিল—নব যৌবনশালিনী, হরিণীনয়না সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তি!!

মালতী বিস্ময় সাগরে নিমগ্না হইল।

(৮)

ব্রত উদ্‌যাপিত হইল; জ্ঞানানন্দ সন্ন্যাস ছাড়িয়া হইলেন—ব্রজরাজ, দয়ানন্দ হইলেন—সাবিত্রী! প্রথম প্রথম মালতীর বড় লজ্জা হইল, তাহার পর সাবিত্রীকে মা বলিয়া ডাকিতে লাগিল। ব্রজরাজ সাবিত্রীকে মালতীর যে বরের কথা বলিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত মালতীর বিবাহ হইয়া গেল। ব্রজরাজ ও সাবিত্রী মহামারীর সময় যে নিঃস্বার্থ পরোপকার করিয়া-

ছিলেন তাহা দেশের রাজার কাণে উঠিল, তিনি তাঁহাদের পরোপকার ব্রতের পুরস্কার স্বরূপ কয়েকখানি গ্রাম নিষ্কর তাঁহাদিগকে অর্পণ করিলেন। ব্রজরাজ গৃহে আসিয়া "দয়ানন্দ আশ্রম" নামে একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিলেন, সম্পত্তির সমস্ত আয় সেই অনাথ আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে নিয়োজিত হইল, মালতী শ্বশুর বাড়ী গেল। ব্রজরাজ ও সাবিত্রীর জন্য স্বর্গে আসন আছে; কিন্তু কালের কঠোর কুঠার-আঘাতে সে দয়ানন্দ আশ্রম এখন মহাবনে পরিবৃত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রাচীন গ্রাম্য-কবিতা।

[জয়গোবিন্দ গোস্বামী মহাশয়ের বাড়ী নাটোরের নিকটবর্ত্তী বাজুরভাগ গ্রামে ছিল। হাস্যরসের কবিতায় ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এ দেশে তাঁহার রচিত অনেক কবিতা মুখে মুখে প্রচলিত আছে। তাঁহার যে সকল কবিতা আমি সংগ্রহ করিয়াছি তন্মধ্য হইতে হারু নাপিতের কবিতা পাঠাইলাম। অনুমান ৩০ বৎসর হইল ইঁহার প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে।

রাজসাহীর অন্তর্গত উপৈলসর গ্রামে গোস্বামী মহাশয় তাঁহার ভগিনীর বাড়ীতে গিয়াছিলেন। হারু নাপিত তাঁহাকে যেরূপ ক্ষৌরি করে তাহাতে তিনি নরসুন্দরজিকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।]

উপৈলসরের নরসুন্দর নামটি তার হারু।
পাশস্পার্শ্বের (১) যত নাপিত সকল হতে মারু (২)
লোক মুখেতে নাম রটিল শব্দ গেল দূরে।
নিত্য রুধির ভোজন করে হারু নাপিতের ক্ষুরে॥

(১) নিকটবর্ত্তী স্থানের।
(২) দক্ষ।

ক্ষুর হয়েছে কালের খাঁড়া সর্ব্ব লোকের হন্তা।
নরুণ নিলে জ্ঞান হয় যেন ভালুকের হাতে খন্তা॥
হারু চুল ভিজাতে নখগুলি যেন বজ্র সমান লাগে।
যাকে কামায় তার জ্ঞান হয় যেন ধর্‌ল এসে বাঘে॥
হারু যখন মাথা ভিজায় নির্দ্দয় যেন ডাইন।
চাপড় শুনে বোধ হয় যেন মৃদঙ্গ বাজায় বাইন॥
হারু ক্ষুর গাছটি হাতে নিয়া চান অন্য পানে।
খর্‌খরাতে টান দিয়াছে যেন লাঙ্গল দিয়াছে ধানে॥
হারুর ক্ষুর গাছটি মরিচা পড়া কামান চোটে চোটে।
ঠেলায় পড়ে সব চুল গোড়া উপড়ে উঠে॥
হারু মাথার দিকে মোটে চায় না কেবল দেখেন কোঁচা।
চাম সমেতে (৩) চুল ফেলান যেন বাজির ফেলায় চোঁচা॥
হেদে দেখরে হারু নাপিত পীড়া পেলেম শক্ত।
ক্ষুরে কেটে গলৎধারে বেয়ে পড়ছে রক্ত॥
হাস্য করে বল্‌ছে হারু বাক্য অদ্ভুত।
ক্ষুরে কাট্‌লে রক্ত বিনা বাহির হয় কি দুধ?
যার মতিনাশ আছে কপালে নাকাল কর্ত্তে চায়।
বাহির করেন মন্না একগাছ যমদণ্ড প্রায়॥
নাকের ভিতর হানিয়া দিয়া প্রাণ সমেতে হানে।
লোমের সঙ্গে খোঁজ নাই তার মাংস ধরে টানে॥
যার মতিনাশ আছে কপালে মোছ (৪) কামাতে বলে।
মোছের কামান দূরে আস্তাং তিন দিন তার জ্বলে॥
গাঁয়ের মধ্যে যান হারু চক্ষুঃ করি তেড়া।
লক্ষ লক্ষ চেঙ্গরা (৫) পলায় যেন বাঘ দেখ্‌লে ভেড়া॥

(৩) সহিত।
(৪) গোঁফ।
(৫) বালক।

জুয়ান (৬) গুলিন যেমন তেমন ধড়পড় করে।
চেঙ্গরা পেলে হারু নাপিত বেগুণ ছেলা করে॥
যায় বলে আমার সুত যদি বাঁচে হারু নাপিতের ফাঁড়া।
রাত পোহালে কালীকে দিব দশ পাঁঠা এক পারা (৭)

শ্রীপ্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী।

ময়ূরভঞ্জের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

ময়ূরভঞ্জ নামটা অনেকের নিকটই নূতন বলিয়া বোধ হইতে পারে। পৃথিবীর কোন্ অংশে ইহার অবস্থিতি সে বিষয়েও হয়ত অনেকের জ্ঞান নাই। এই রাজ্যটি উড়িষ্যা প্রদেশের একটি অংশ এবং উড়িষ্যার উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত। উড়িষ্যায় যে ১৮টি করদ গড়জাত মহাল আছে ময়ূরভঞ্জ তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ করদরাজ্য। সমগ্র ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের পরিমাণ ৪২৪৩ বর্গ মাইল। সাধারণতঃ লোকে ইহাকে "বিশাশ্ কোশ্ রাজ্য" অর্থাৎ ১২০ ক্রোশ পরিমিত রাজ্য বলিয়া থাকে। রাজ্যের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই সুন্দর, বড়ই মধুর। সুবিস্তৃত বনভূমি এবং পর্ব্বতমালায় অলঙ্কৃত ময়ূরভঞ্জ কবির চিত্তে বড়ই আমোদ প্রদান করিয়া থাকে। যে দিকে তাকাও প্রাংশু শাল পিয়াল প্রভৃতি বৃক্ষসমাকুল বনভূমি স্তরে স্তরে যেন অনন্ত ভাবে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্য দিয়া সুদীর্ঘ পর্ব্বতশ্রেণী শিরোত্তলন করিয়া গর্ব্বিত প্রহরীর ন্যায় যেন রাজ্যের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিতেছে! ছোট ছোট পার্ব্বতীয় নদী ক্রূরগতি সর্পের ন্যায় আঁকিয়া বাঁকিয়া বুকে নানা বর্ণের উপলখণ্ড এবং বালুকা ধারণ করিয়া ঝির্ ঝির্ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, আবার বৃষ্টি-সমাগমে স্ফীতবক্ষঃ হইয়া যৌবনের উদ্দাম তেজে ছুটিয়া চলিতেছে। পর্ব্বতপ্রদেশে নানা প্রকার মৃগকুল বিচরণ করিয়া নয়নানন্দ বিধান করিতেছে। কোথায়ও বা পক্ক মহুয়া বৃক্ষে

(৬) যুবক।
(৭) মহিষ।

অগণিত ভল্লুকগণ উদর-ব্যবসায়ে কোলাহল করিতেছে। স্থানে স্থানে বন্য হস্তিযূথ দরিদ্র সাঁওতাল কৃষকের শস্যক্ষেত্রে পড়িয়া তাহার শ্রমফল সমস্ত বিফল করিয়া দিতেছে, কোথায়ও বা তমোময়ী রজনীর কৃষ্ণ আস্তরণে আবৃত হইয়া ভয়াল শার্দ্দূল কৃষকের সর্ব্বস্বধন গোমহিষাদির প্রাণবধে ব্যাপৃত রহিয়াছে। শস্যক্ষেত্রে সাঁওতাল রমণীগণ শ্রমপুষ্ট দেহশোভা বিস্তার করিয়া সমস্বরে গান করিতে করিতে শস্যসমূহের পারিপাট্যসাধনে ব্যাপৃতা রহিয়াছে। বস্তুতঃ প্রাকৃতিক শোভা সম্বন্ধে ময়ূরভঞ্জ অতীব রমণীয়, চিত্তহারী।

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের ঠিক মধ্য ভাগ দিয়া একটি পর্ব্বত-শ্রেণী চলিয়া গিয়াছে; বোধ হয় যেন ময়ূরভঞ্জ-রাজলক্ষ্মী প্রাকৃতিক পর্ব্বতমেখলাতে স্বীয় কটিদেশশোভা বর্দ্ধিত করিয়াছেন। এই পর্ব্বতমালাকে সাধারণতঃ "ময়ূর-ভঞ্জ পর্ব্বতমালা" বলে। ইহাদের কতক অংশকে "শিম্‌লি পাল" পর্ব্বত-শ্রেণী বলে। সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতের নাম "মেঘাশনি"; ইহার উচ্চতা ৩৮২৪ ফিট। এইরূপে সমস্ত রাজ্যটি পর্ব্বতমালা দ্বারা ৩ ভাগে বিভক্ত এবং অনেকগুলি পার্ব্বত্য নদী দ্বারা বিধৌতপাদ হইয়াছে। পর্ব্বতে নানা প্রকার প্রস্তর পাওয়া যায়। ধাতুর খনিও থাকিবার বিশেষ সম্ভাবনা। লৌহের খনি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহাতে সামান্য রকম কাজও চলিতেছে। লৌহসমাকুল পর্ব্বতই কত রহিয়াছে! বর্ত্তমান সুযোগ্য মহারাজ একজন সুবিজ্ঞ ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত আনিয়া খনি পরীক্ষার চেষ্টায় আছেন। পার্ব্বত্যভূমি বলিয়া অনেক ভূখণ্ডই প্রস্তর ও কঙ্করময় এজন্য জমি সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর,— প্রস্তরময় জমি আর মৃণ্ময় অর্থাৎ প্রস্তর-কঙ্করাদি-হীন কর্ষণোপযোগী সাদা জমি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মোট রাজ্যের পরিমাণ ৪২৪৩ বর্গ মাইল; ইহার শতকরা ৩১ মাইল আবাদী জমি, ৪২ মাইল বন-ভূমি, আর ২৭ মাইল পতিত জমি। বনভূমি পার্ব্বত্য অংশেই খুব গভীর কিন্তু মোট রাজ্য মধ্যে সম্পূর্ণ বনশূন্য স্থান বোধ হয় নাই। বনই এ রাজ্যের অলঙ্কার এবং প্রধান আয়ের উপায়। এই বনের কতকাংশ রক্ষিত বা reserved; তাহার বৃক্ষাদি বিশেষ অনুমতি ভিন্ন কাটিবার আদেশ নাই। সে সমস্ত বনে কত কত বর্ষের শীতবাতভোগী বৃদ্ধ শালগণ রাজত্ব করিতে-

ছেন ; কাহার সাধ্য তাঁহাদিগের নিকট অগ্রসর হয়! যে সমস্ত স্থান রক্ষিত নহে, সে সব বন কাটিয়া আবাদ করা হইতেছে। তাহাদের মধ্যে শাল, আমলকী, বয়ড়া, হরিতকী ইত্যাদি অসংখ্য বৃক্ষের নবীন অঙ্কুরগুলি বড়ই নয়ন রঞ্জন করে।

পথ— ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের বর্ত্তমান রাজধানী "বারিপদা" বালেশ্বর হইতে ৩৬ মাইল উত্তরপশ্চিম। কলিকাতা হইতে বালেশ্বর পর্য্যন্ত জাহাজে সমুদ্র পথে বা খালপথে আসিতে হয়। বালেশ্বর হইতে বারিপদা পর্য্যন্ত বেশ সুপ্রশস্ত বাঁধান পাকা রাস্তা আছে। বালেশ্বর হইতে প্রায় ২ মাইল আসিলে "বুড়াবলঙ" নামক পার্ব্বত্য নদী পার হইতে হয়। ঐ ঘাটকে "ফুলারি ঘাট" বলে। তার পর নদীর অপর পারে আর ১ মাইল পর্য্যন্ত (অনুমান) ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের জমি; ইহাকে "মোগলবন্দি" বলে; এই 'মোগলবন্দি'র পরই ময়ূরভঞ্জ-রাজ্যসীমা আরম্ভ। ফুলারি ঘাটের অপর পার হইতেই এক দিকে মেদিনীপুর-রাস্তা গিয়াছে। অন্যদিকে ময়ূরভঞ্জ রাস্তা। এখান হইতে প্রায় সমস্ত পথই বনের মধ্য দিয়া। দুদিকে বন, মধ্য দিয়া অসরল উচ্চনীচ পার্ব্বত্য-প্রদেশোপযোগী প্রশস্ত পথ। যানের কথা অবশ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিবেন; উত্তর—গোযানই সাধারণতঃ একমাত্র অবলম্বন। অশ্বযান বালেশ্বরের ন্যায় জেলা স্থানেও অপ্রাপ্য অথবা দুষ্প্রাপ্য। বোধ হয় তথাকার লোকেরা অশ্বযানের আবশ্যকতা অনুভব করে না। নরযানও সেইরূপ! কলিকাতায় উড়িষ্যাবাসিবাহিত নরযানের প্রাচুর্য্য দেখিয়া মনে করিবেন না যে উড়িষ্যাতেও তাই ;—তাহা নহে, যত বাহক সব কলিকাতায়—দেশে কেবল শাল গাছ! অতএব গোযানই অবলম্বন। সাধারণতঃ মঃ ৩৲ তিন মুদ্রাতেই একখানি যান পাওয়া যায়, গরজ অনুসারে কমবেশী হইতে পারে। অত্রাগমনেচ্ছুকে ঐরূপ একখানি গোযানের হস্তে স্বীয় দেহখানি বিশ্বস্তভাবে সমর্পণ করিলে ২ দিনে (সাধারণতঃ) বারিপদায় পৌঁছিতে পারেন। বন মধ্যে বিপদ আপদ ঘটা অসম্ভব কিছুই নহে, কারণ ব্যাঘ্র ভল্লুকের অসদ্ভাব নাই, তবে শুনা যায় যে, আলোকসমন্বিত গাড়ীতে কোন বিপদ ঘটে না ; হিংস্র জন্তুগণ বোধ হয় গোযানের অদ্ভুত আকৃতি এবং

ততোধিক অদ্ভুত অশ্রুতপূর্ব্ব ক্রন্দনধ্বনিতে চমকিত হইয়া তাহাকে একটা বিকট জন্তু মনে করে এবং আক্রমণ অপেক্ষা পলায়নই শ্রেয়ঃ মনে করে।

"বারিপদা" এই রাজ্যের রাজধানী। নামটা বোধ হয় পাঠকগণের অনেকের কাছে বেসুর লাগিতেছে। "বারিপদ" হইলেই যেন বেশ সুন্দর সুশ্রাব্য হইত। ইংরাজিতে Baripada দেখিয়া প্রথমে বারিপদই মনে করিয়াছিলাম এবং এই নামটা হওয়ার একটা কারণও মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম। এই স্থানটার প্রায় চারিদিক দিয়াই পার্ব্বত্য নদী প্রবাহিতা, ইহার পাদদেশ বিধৌত করিয়া বুড়াবলঙ প্রবাহিত, পূর্ব্ব দিক দিয়া সরাইস স্বীয় ক্ষুদ্র বক্র দেহখানি লইয়া জঙ্গলের সঙ্গে মিশিয়া চলিয়াছে। পশ্চিমউত্তর দিক দিয়া 'চিপট্' কখন ক্ষীণ কখন তীব্র বেগে ছুটিয়াছে, এই সমস্ত দেখিয়া মনে করিলাম যে 'বারি পদে যস্য' এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে বেশ প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে মিলাইয়া বুঝি নামটার জন্ম হইয়াছে। কিন্তু শেষে জানিলাম যে ঐরূপ অন্যান্য আন্দাজি ব্যুৎপত্তির ন্যায় আমারটিও মিথ্যা। স্থানটার নাম বারিপদা। 'পদা' অর্থে পতিত জমি (এ দেশজ ভাষায়) এই পতিত জমিতে বসতবাস হইয়াছে এবং ঐ নামটা দেওয়া হইয়াছে, তবে 'বারি' কথাটা কি জন্য ইহার সঙ্গে লাগিল সেটা ভাল বুঝা গেল না, হয়ত নদীবাহুল্যের জন্যই 'বারি' কথাটা যোগ হইয়াছে। 'পদা'-যুক্ত গ্রাম এ রাজ্যে অনেক আছে।

এ স্থানের স্বাস্থ্য খুব ভাল। পার্ব্বত্য স্থান বলিয়া শীত ও গ্রীষ্ম উভয়েরই আতিশর্য্য বেশী। গ্রীষ্ম নাকি বড়ই প্রচণ্ড হয় কিন্তু তাহাতে কোন অসুস্থতা বা কলেরা প্রভৃতি হয় না। এখানে ম্যালেরিয়া নাই, স্থান খুব উচ্চ এবং শুষ্ক। ব্যারাম আদি খুব কমই আছে। তবে অম্লের ভাব প্রথম প্রথম একটু হয়। মোটের উপর স্বাস্থ্য খুব ভাল এবং বায়ু পরিবর্ত্তনের উপযুক্ত।

প্রাচীন ইতিহাসঃ— ময়ূরভঞ্জ অতি প্রাচীন রাজ্য। হাণ্টার সাহেবের মতে এই রাজ্য ২০০০ বৎসরের পুরাতন। রাজবাটীর প্রাচীন কাগজপত্র দৃষ্টে জানা যায় যে বর্ত্তমান রাজবংশই ১৩০০ বৎসর কাল এখানে রাজত্ব করিতেছেন। এই রাজবংশের পূর্ব্বে যে রাজবংশ এখানে রাজত্ব

করিতেন তাঁহারা কতকাল রাজত্ব করিয়াছেন তাহা জানিবার উপায় নাই। তাঁহাদের সময় রাজধানী বারিপদায় ছিল না। বামণঘাটি নামক অংশে রাজধানী ছিল। তাঁহারা বোধ হয় অনার্য্য ছিলেন। এখনও করঞ্জিয়া নামক স্থানের কুটীরবাসী এক জাতীয় কৃষক তাহাদিগকে রাজবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। তাহাদিগের নাম "বাঘনেজিয়া করঞ্জিয়া" সম্মানের চিহ্নস্বরূপ তাহারা ব্যাঘ্রলাঙ্গুল স্বীয় পশ্চাদ্দেশে ব্যবহার করিয়া থাকে। এই সব আদিমবাসিগণের লাঙ্গুলপ্রিয়তা দৃষ্টে অনেকে ইহাদিগকে ডারউইণের ক্রমবিকাশ (Evolution)এর দৃষ্টান্ত স্থল বলিয়া মনে করেন এবং প্রাচীন কিষ্কিন্ধ্যা এই দেশকেই বলিয়া থাকেন। যাহা হউক বর্ত্তমান রাজবংশের স্থাপয়িতা জয়সিংহ নামধেয় একজন ক্ষত্রিয়। ইনি জয়পুর রাজবংশের একজন আত্মীয়। এই জয়সিংহ তীর্থযাত্রা করিয়া শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রে আগমন করেন, পরে এই রাজ্য মধ্য দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে রাজ্যের রাজাকে দুর্ব্বল ও প্রজাপালনে অক্ষম দেখিয়া নিজে রাজ্য অধিকার করেন। যে রাজার নিকট হইতে তিনি এই রাজ্য অধিকার করেন তাঁহার নাম ময়ূরধ্বজ। স্থানীয় প্রচলিত আমলি ৫ সনে খ্রীষ্টাব্দ ৫৯৮ সনে জয়সিংহ এই রাজ্য দখল করেন। এই আমলি সন এবং জয়সিংহের রাজ্য দখল কাল দেখিয়া এইরূপ অনুমান হয় যে এই আমলি সনটা জয়সিংহের সময় হইতেই প্রচলিত হইয়াছে। আমলি ৫ সনে জয়সিংহ রাজ্য শাসন আরম্ভ করেন; এই সময়ের পূর্ব্বের ৫ বৎসর রাজ্য দখল আদি করিতেই ব্যয় হইবার সম্ভাবনা। এই জন্য অনুমান হয় যে জয়সিংহের 'আমল' হইতেই এই 'আমলি' সনের প্রচলন হইয়াছে এবং জয়সিংহ যে বৎসর এই রাজ্যে প্রথম আগমন করেন ঠিক সেই বৎসর হইতেই এই সন গণনা হইয়া আসিতেছে। আর নূতন রাজার 'আমলের' সঙ্গে 'আমলি' কথাটারও বেশ সম্বন্ধ আছে। যাহা হউক জয়সিংহ নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়া ২০ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া পরলোকগত হন। এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের হস্তে রাজ্যভার পতিত হয়। জয়সিংহ ময়ূরধ্বজের রাজ্য দখল করিলেও তাহাকে সম্পূর্ণ অধীন করিতে পারেন নাই বলিয়া বোধ হয়। কারণ তাঁহার পর তাঁহার পুত্রকেও এই রাজার সঙ্গে লড়াই করিতে হইয়াছিল। পিতার অসম্পূর্ণ কার্য্য পুত্র সম্পূর্ণ করিলেন, তিনি ময়ূরধ্বজের তেজঃ সম্পূর্ণ খর্ব্ব করিয়া তাহাকে অধীন করিয়া ফেলিলেন, ময়ূরধ্বজ যুদ্ধে হত হইলেন। নব রাজা তাঁহার ধ্বজা স্বায়ত্ত করিয়া লইলেন। ময়ূরধ্বজের বিক্রম 'ভঞ্জন' করিয়াছিলেন জন্য এই সময় হইতে রাজ্যের "ময়ূরভঞ্জ" এই নূতন নামকরণ হইল এবং রাজাদিগের 'ভঞ্জ' এই বহুমানসূচক উপাধি হইল। জয়সিংহপুত্র "আদিভঞ্জ দেও" (দেব) নামে প্রসিদ্ধ। এই সময় হইতেই এই রাজগণের উপাধি 'ভঞ্জদেও' চলিয়া আসিতেছে। স্থাপয়িতা হইতে বর্ত্তমান মহারাজ পর্য্যন্ত মোট ৪৪ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে রাণীও দুই জন ছিলেন। সকল রাজার নাম, রাজত্বকাল এবং প্রধান ঘটনাবলী পাঠকবর্গের তৃপ্তিপ্রদ হইবে না এবং প্রবন্ধ-কলেবরও বর্দ্ধিত করিবে এই বিবেচনায় উল্লেখ করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম। আদিভঞ্জ রাজধানী পাঁচপীরে স্থানান্তরিত করেন এবং স্বীয় নামানুযায়ী রাজধানীর নাম আদিপুর রাখেন। পরবর্ত্তী রাজগণের সময় বারিপদায় রাজধানী হইয়াছে। এই রাজগণ পূর্ব্বে স্বাধীন ভাবেই রাজ্যশাসনাদি করিতেন, পরে ইংরাজ রাজগণের আমলে ইঁহারা গবর্ণমেণ্টের করদরাজা রূপে রাজত্ব করিতেছেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজ যদুনাথ ভঞ্জ দেওর রাজত্বকালে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত যে সন্ধি হয় সে সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে ইঁহারা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে বার্ষিক ১০০১৲ এক হাজার এক টাকা কর দিয়া আসিতেছেন। রাজ্যের শাসনাদি ইঁহারা নিজেই করিয়া থাকেন। এই রাজবংশের চিহ্ন বা ধ্বজা ময়ূরের মূর্ত্তি। ময়ূরধ্বজের রাজ্যধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই ইঁহারা এই ধ্বজা ব্যবহার করিতেছেন।

রাজ্য ও রাজার অবস্থা:— রাজ্যের অবস্থা বর্ত্তমানে খুব ভাল। বর্ত্তমান মহারাজের পিতা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভঞ্জ দেওর সময় হইতেই রাজ্যের অবস্থার উন্নতি হইতে আরম্ভ হয়। তিনি ভাল ভাল রাস্তা প্রভৃতি প্রস্তুত এবং অন্যান্য উপায়ে রাজ্যের প্রজাকুলের সুবিধা ও সুখবৃদ্ধি করিতে যত্নশীল ছিলেন। তাঁহার পরলোকগমন কালে বর্ত্তমান মহারাজ নাবালক ছিলেন। তখন ইঁহার বয়স ১০।১১ বৎসর ছিল। এই সময় ১৮৮২ খ্রীঃ-

অব্দে ইনি এই বিপুল রাজ্যের অধীশ্বর হন। তিনি তখন বালকমাত্র, এ জন্য গবর্ণমেণ্ট রাজ্য ওয়ার্ডের অধীনে রাখিয়া একজন সাহেব ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। ইঁহার নাম ওয়াইলি। এই ম্যানেজার রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। ভাল রাস্তাঘাট প্রস্তুত, স্থানে স্থানে পুষ্করিণী খনন, রাজ্যের শাসন ও রক্ষণের সুবন্দোবস্ত ইত্যাদি করিয়া তিনি রাজ্যের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। প্রজাকুল এখনও তাঁহাকে 'প্রজার মা, বাপ,' বলিয়া থাকে। ইঁহার নামে এখানে ওয়াইলিগঞ্জ নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম বসিয়াছে। সুযোগ্য দেওয়ান বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষাল মহাশয়ও রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। মহারাজ সাবালক হইয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করার পর নানা কারণে ওয়াইলি সাহেব ম্যানেজারি পরিত্যাগ করেন। বর্ত্তমান মহারাজও প্রজাকুলের উন্নতিসাধনে যথেষ্ট উৎসুক, ইঁহার বয়স এক্ষণে ২৭ বৎসর। এস্থলে ইঁহার গুণাবলীর বিষয় একটু না বলিলে বড় অন্যায় হয়, কারণ দেশীয় রাজকুল মধ্যে ইঁহার মত নির্ম্মলস্বভাব বড় কমই দেখিতে পাওয়া যায়। দেশীয় রাজকুলের মধ্যে যে সব দোষ প্রধান তাহা ইঁহাতে একেবারেই নাই। পান-দোষ, ইন্দ্রিয়-দোষ, বিলাসিতা ইঁহাকে এ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই। সাদাসিদা পোষাক পরিচ্ছদেই ইনি সন্তুষ্ট। রাজা বলিয়া একটা গর্ব্ব অহঙ্কার ইঁহার একেবারেই নাই। আর ইঁহার মত ধৈর্য্যশীল, সহিষ্ণু ব্যক্তি আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সামান্য চাকরটিকে পর্য্যন্ত ইনি উচ্চ কথা বলিতে পারেন না, হয় ত তাহার জন্য অনেক সময় তিনি ব্যক্তিগত অসুবিধাও অনেক ভোগ করেন। সরল লাবণ্যময়ী সৌম্যমূর্ত্তিতে ইনি সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকেন, যিনি একবার তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন বা তাঁহাকে দেখিয়াছেন তিনিই তাহা বলিবেন। তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিলে কখন এরূপ বোধ হয় না যে এত বড় একটা রাজ্যের স্বাধীন অধীশ্বরের সঙ্গে কথা বলিতেছি; এমনই তাঁহার সারল্য, বিনয়! মহাভারত বলিয়াছেন যে "রাজাকে মৃদু ও তীক্ষ্ণ দুই গুণসম্পন্নই হইতে হইবে," কালিদাসও বলিয়াছেন রাজা "ভীমকান্ত গুণসম্পন্ন হইবেন" কিন্তু বর্ত্তমান মহারাজ যেন কেবল কোমলকান্ত গুণসমষ্টিতেই নির্ম্মিত হইয়াছেন। ভীম বা তীক্ষ্ণ গুণ তাঁহাতে নাই।

আমাদের যেন বোধ হয় যে মহারাজ এইরূপ অত্যধিক কোমলস্বভাব হওয়াতে শাসন-কার্য্যের একটু ক্ষতি হইতেছে। কাহারও প্রাণে বেদনা লাগিবে এ ভয় যেন তাঁহার মনে সর্ব্বদা লাগিয়া আছে, তাই তিনি দোষীকেও যেন উপযুক্ত শাসন করিতে ইতস্ততঃ করেন। যে সমস্ত প্রজা লইয়া তাঁহার রাজ্য, তাহারা পাশবিক বলের উপাসক, প্রেম-জয়ের (conquest by love) মাহাত্ম্য তাহারা বুঝে না। যাহা হউক তাহাদের বড় সুকৃতি ফলে তাহারা এমন সুশীল উদারহৃদয় রাজা পাইয়াছে। ইঁহার নাম 'শ্রীরামচন্দ্র'। যে মহাপুরুষের নামে ইঁহার নামকরণ হইয়াছে কার্য্যে ইনি সে নামের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। মহারাজ রাজ্য-শাসন-কার্য্য-অবসর-কাল মহাভারত আদি ধর্ম্মগ্রন্থ-শ্রবণে, মৃগয়াদ্বারা হিংস্রজন্তু-নিধনে, বিশুদ্ধ গীত বাদ্যের আলোচনায়, মল্লগণের মল্লযুদ্ধ-দর্শনে, সুশিক্ষিত উচ্চকর্ম্মচারিবর্গের সহিত সদালাপে,—ইত্যাদি রূপে কর্ত্তন করেন। ঈশ্বর সম্প্রতি একটি কন্যা সন্তান দ্বারা ইঁহার পারিবারিক সুখপ্রস্রবণ খুলিয়া দিয়াছেন। রাজরাণীকে এখানে 'পাট'শান্ত' বলে। 'শান্ত' উপাধিটি রাজবাড়ীর রাণীগণ—সকলের উপরই প্রযোজ্য। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে 'টিকায়েত' মধ্যমকে "ছোট রায়" এবং কনিষ্ঠকে "রাউত রায়" বলা হয়। রাজকুলের অন্যান্য বালকগণকে বা যুবাগণকে "লাল সাহেব" বলা হয়।

শুনা যায় যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজগণের বিবাহিতা রাণী ব্যতীত আরও ২।৩টি বা কাহারও ততোধিক পত্নী (?) থাকিতেন, এবং তাঁহাদের গর্ভজাত সন্তানেরা রাজকোষের অর্থেই প্রতিপালিত হইতেন। তাঁহাদিগের উপাধি 'বাবু'। এইরূপ 'বাবু' অনেকগুলি এখানে আছেন; রাজবাড়ী হইতে তাঁহারা রীতিমত মাসিক ভাতা পাইয়া থাকেন। বর্ত্তমান মহারাজ বেশ সুশিক্ষিত। ইনি কটক কলেজ হইতে এফ, এ, পাশ করিয়া পরে বি, এ, পড়েন এবং পরীক্ষাও দিয়াছিলেন কিন্তু দৈবের প্রতিকূলতায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই; ইংরাজিতে বেশ দখল আছে, এবং প্রজাকুলের শিক্ষাবিধান জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। নিজ বারিপদায় একটি এণ্ট্রান্স স্কুল ও একটি সংস্কৃত টোল আছে। বামনেশ্বরেও ইঁহার আনুকূল্যে একটি সংস্কৃত টোল এবং একটি আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় আছে। ইহা ব্যতীত রাজধানীতে

একটি বালিকা-বিদ্যালয়, একটি মক্তব, এবং একটি বাঙ্গলা স্কুল আছে। মফঃস্বলেও কয়েকটি মধ্যশ্রেণী স্কুল, এবং কতকগুলি উচ্চ ও নিম্ন প্রাইমারী স্কুল আছে। এই সমস্ত স্কুলের ছাত্রগণকে পুস্তকাদি দ্বারা সাহায্য করা হইয়া থাকে। পাশ হইলে বৃত্তির বন্দোবস্তও আছে।

স্থানীয় রাস্তা ঘাট অতি সুন্দর। বারিপদার বড় সড়কটি কলিকাতা হারিসন রোডের দ্বিগুণ পরিসর হইবে। অন্যান্য রাস্তাও বেশ প্রকাণ্ড এবং পাকা। এখানে পাকা বাড়ীর সংখ্যা খুব কম। খড়ের চালাঘর বেশী কিন্তু ছাউনি বড় খারাপ, বাঙ্গলা দেশের মত সুন্দর ছাউনি এখানে করিতে জানে না, এ জন্য ঘরগুলি তেমন সুখের হয় না। ভাল বাঁশ এখানে দুষ্প্রাপ্য। শাল প্রভৃতি বৃক্ষের ডাল দ্বারাই ঘরের ঠাট বেড়া প্রভৃতি হইয়া থাকে।

স্থানীয় অধিবাসিগণ প্রধানতঃ হিন্দু ও পার্ব্বত্য অসভ্য জাতি। অধিবাসী সব উড়িয়া। বাঙ্গালী অধিবাসী নাই, চাকুরে আছেন। মুসলমানের সংখ্যা খুব কম। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, করণ, খণ্ডায়েৎ ইত্যাদি প্রধান। দাস, কর ইত্যাদি উপাধিধারী ব্রাহ্মণ আছে। তদ্ব্যতীত কামার, কুমার, চাষী ইত্যাদি আছে। পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে সাঁওতাল, ভূমিজ, কোল, কুর্ম্মি ইত্যাদি নানা জাতি আছে। ইহারা সাধারণতঃ চাষ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে এবং জঙ্গল হইতে কাষ্ঠাদি আনিয়া সহরে বিক্রয় করে।

উৎপন্ন দ্রব্য মধ্যে ধান্য, মুগ, বিরিকলাই, অড়হর, ছোলা। শস্য মধ্যে সরিষা, তিল, জাড়া, তিসি, গুঁজিরা এই সব চাষ হয়। গম এবং কুলত্থ কলাই খুব কম। বন্য-উৎপন্ন কাষ্ঠ মধ্যে শাল প্রধান। ময়ূরভঞ্জের বনে অধিকাংশই শাল গাছ। তদ্ব্যতীত অবলুস, পিয়াশাল, শিশু, সিরিষ, গাম্ভার, আসান ইত্যাদি কাষ্ঠও আছে। ইহা ছাড়া হরিতকী, বহেড়া, ভ্যালা, আমলকী ইত্যাদি তো যথেষ্টই পাওয়া যায় এবং এ সমস্তের ব্যবসায়ও হইয়া থাকে।

বাণিজ্য দ্রব্যের মধ্যে তসরগুটি ও লাক্ষা প্রধান। এই রাজ্যের অন্তর্গত ওলমারা নামক স্থানে তসরের শিল্পের কাজ হইয়া থাকে। বাপ্তা

ও তসরের থান বেশ প্রস্তুত হয়। তসরের গুটির ব্যবসায় বেশ চলিয়া থাকে; চাঁইবাসা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে ব্যবসায়িগণ আসিয়া এই সব তসরগুটি ও লাক্ষা কিনিয়া লইয়া যায়। এখানে কুসুম গাছ নামক একরূপ বড় বড় গাছ আছে, সেই সব গাছেই লাক্ষা বেশ জন্মিয়া থাকে। প্রজাগণকে গাছ প্রতি একটা কর দিতে হয়। এ বৎসর লাক্ষার ব্যবসায় বড় কম হইয়াছে। অনেকে বলেন এবার কোন কারণে লাক্ষা কম জন্মিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে লাক্ষার বিক্রয়ের উপর রপ্তানি মাশুল ধার্য্য করায় প্রজাগণ গোপনে লাক্ষা বিক্রয় করিতেছে, বন বিভাগের কর্ত্তাগণ কয়েকটা স্থানে ঘাটি বসাইয়াছেন বটে কিন্তু প্রজাগণ অন্য বনপথে বাহিরে গিয়া বিক্রয় করিতেছে। এই লাক্ষা ও তসর ব্যতীত কুঁচিলা, রজন, বাবই ঘাস, শালগাতা, শৃঙ্গ, শিমুল-তুলা নানারূপ আয়ুর্ব্বেদীয় উদ্ভিদ ছাল ইত্যাদি এবং নানারূপ কন্দমূলের ব্যবসায়ও আছে। যাহারা এই সব ব্যবসায় করে তাহাদিগকে একটা নির্দ্দিষ্ট কর দিতে হয়। জ্বালানি কাষ্ঠের উপরও কর ধার্য্য আছে, সেই কর দিলে ইচ্ছামত বন হইতে জ্বালানি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে পারা যায়।

শাসন বিচার— ময়ূরভঞ্জ রাজ্য ৩টা মহকুমায় বিভক্ত। সদর, বামণঘাটি ও পাঁচপীর। এই সব মহকুমা আবার কতকগুলি পরগণায় বিভক্ত। এই সব পরগণা আবার ছোট ছোট পীরে বিভক্ত। পুলিস ষ্টেসন, আউট পোষ্ট ও ঘাটি স্থানে স্থানে আছে। প্রত্যেক মহকুমায় এক জন করিয়া মহকুমার হাকিম আছেন। ইঁহারা মুন্সেফ ও মাজিষ্ট্রেট দুই পদের কাজই করিয়া থাকেন। রাজস্ব বিষয়ে ইঁহারা দেওয়ানের অধীন ও বিচার বিষয়ে ষ্টেট জজের অধীন; রাজধানীতে দেওয়ান রাজস্ব বিভাগের কর্ত্তা। কলেক্টরের সব ক্ষমতা তাঁহার আছে। ইঁহার এক জন সহকারী আছেন তিনি জমির রাজস্ব বন্দোবস্ত আদি করেন। রাজ্যের কর সংগ্রহ করিবার জন্য প্রত্যেক পরগণায় ১ জন সরদার আছে। প্রত্যেক মৌজায় ১ জন প্রধান আছে। ইহারা সকলেই দেওয়ানের অধীন। প্রধানগণ প্রজার নিকট কর সংগ্রহ করিয়া তন্মধ্য হইতে তাহাদের কমিশন রাখিয়া অবশিষ্ট টাকা সরদারকে দেয়। সরদার স্বীয় পরগণার সমস্ত কর

একত্র করিয়া তাহা হইতে নিজ কমিশন রাখিয়া দেওয়ানের নিকট রাজকোষে জমা দেয়। এই সরদারগণকে এ জন্য জামিন দিতে হয়। বামণঘাটি নামক মহকুমার কর প্রধানেরাই রাজকোষে জমা দিয়া থাকে। জমি বন্দোবস্ত সাধারণতঃ ১০ বৎসরের জন্য হইয়া থাকে, তৎপর আবার নূতন বন্দোবস্ত করা হইয়া থাকে। ষ্টেট জজ বিচার বিভাগের প্রধান কর্ত্তা। দেওয়ানীতে ইনি ডিঃ জজের ও ফৌজদারীতে সেসন জজ ও জেলার মাজিষ্ট্রেটের সমান ক্ষমতাশালী। আপিল আদি সাধারণতঃ ইঁহার নিকটই হয়; বড় বড় আপিল, অথবা ইঁহার বিচারের বিরুদ্ধে আপিল জুডিসিয়াল কমিটিতে হইয়া থাকে। এই জুডিসিয়াল কমিটিতে স্বয়ং মহারাজ, তাঁহার খুল্লতাত ছোট রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভঞ্জদেও, এবং ষ্টেট জজ এই তিন জন একত্রে পরামর্শ করিয়া বিচার করেন। জুডিসিয়াল কমিটি ইংরাজ রাজের হাইকোর্টের সমান। যে সব মোকদ্দমা ষ্টেট জজের বিচারের বিরুদ্ধে কমিটিতে দাখিল হয়, সে সব বিচারের কালে ষ্টেট জজ কমিটিতে যান না; কেবল মহারাজ এবং ছোট রায় সাহেবই সে সব বিচার করিয়া থাকেন। সমগ্র ষ্টেটের আয় ১০ লক্ষ টাকার কম নহে। আয় ব্যয় ইত্যাদি বজেট ধার্য্য করিবার জন্য এবং শাসন সংক্রান্ত পরামর্শাদির জন্য ষ্টেট কাউন্সিল আছে।

ষ্টেট জজের সহকারী দুই জন জজ আছেন। রাজ্যের শাসনাদি প্রধানতঃ ইংরাজ আইন অনুসারেই হইয়া থাকে, তবে স্থানীয় কোন কোন বিষয়ের জন্য স্বতন্ত্র আইন আছে।

পুলিস বিভাগে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রধান কর্ত্তা। ইনি জেল এবং সহর পরিষ্কার রাখার (conservancy) বিভাগেরও কর্ত্তা। ইনি সাক্ষাৎ মহারাজের অধীন, ষ্টেট জজের অধীন নহেন।

বন বিভাগেরও এক জন স্বতন্ত্র কর্ত্তা আছেন। তাঁহার অধীনে রেঞ্জার, গার্ড ইত্যাদি আছে। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অধীনেও ইন্স্পেক্টর, দারোগা, কনেষ্টবল ইত্যাদি সব আছে। এ সব ইংরাজ অধিকারের অনুরূপেই গঠিত হইয়াছে। কোর্টফি ইংরাজ অধিকারের এক চতুর্থাংশ হিসাবে লওয়া হয়।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলি স্মরণীয় করিবার জন্য একটি সাধারণ জুবিলি লাইব্রেরী স্থাপিত হইতেছে এবং কোন অতিথি আসিয়া থাকিতে পারিবেন বলিয়া একটা ডাকবাঙ্গলাও স্থাপিত হইতেছে। রাজকীয় কার্য্যের জন্য বারিপদায় একটি মুদ্রাযন্ত্রও আছে। সহরে দেবমন্দিরও ৪।৫টি আছে। জগন্নাথ দেবের মন্দির দুইটি আছে। রথযাত্রার সময় খুব ধূম হয়। রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'কিঞ্চকেশ্বরীর' এক মন্দির রাজবাটীর মধ্যে আছে। কেহ কেহ কিচকেশ্বরীও বলেন কিন্তু এই দেবীর পৌরাণিক কোন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

রাজ প্রাসাদটির দৃশ্য সম্মুখ হইতে মন্দ নহে, যেন দুর্গ প্রাকারের মত। তবে বাড়ীর মধ্যে প্রায়ই প্রাচীন রীতি-অনুযায়ী গঠন। এখনকার কারিকরগণ বড় ভাল নহে এ জন্য বাড়ী সব সুদৃশ্য করিতে পারে না। বারিপদার উত্তরাংশে বেলগড়িয়া নামক স্থানে মহারাজের যে প্রাসাদ আছে সেটি অতি সুন্দর। একটি উচ্চ টিলার উপর স্থাপিত দ্বিতল গৃহ, নানারূপ মূল্যবান বস্তুজাতে সুসজ্জিত, সম্মুখে একটি বিস্তীর্ণ জলাশয়, পশ্চিমে, দক্ষিণে ও উত্তরপশ্চিমদিকে সুন্দর পর্ব্বতমালার দৃশ্য! এ স্থানটি বড় মনোরম! মহারাজ বিবাহের পূর্ব্বে এখানেই থাকিতেন। এখন, নিম্নতলে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কিডেল্ সাহেব বাস করিতেছেন। দ্বিতলে কেহ বাস করে না, কোন বড় সাহেব আদি আসিলে মহারাজ তথায় তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করেন; এবং মধ্যে মধ্যে সান্ধ্যসমিতি হইয়া থাকে।

স্থানীয় লোকের চরিত্র বড় ভাল বোধ হইল না। ইন্দ্রিয় দোষটা যেন এখানে সংক্রামক। স্থানীয় নিম্নশ্রেণীর তো কথাই নাই উচ্চশ্রেণীও এ দোষ হইতে মুক্ত নহে। ভূতপূর্ব্ব রাজগণও এ বিষয়ে নিষ্কলঙ্ক ছিলেন না কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে বর্ত্তমান মহারাজ সে কলঙ্ক অতি উত্তমরূপে ক্ষালিত করিয়া প্রজালোকের ও জনসাধারণের এবং ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের আদর্শস্বরূপ হইয়াছেন। ষ্টেটে সাহেব কর্ম্মচারিগণের মধ্যে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইয়ুরোপীয়ান। ইঞ্জিনিয়ার, প্রাইভেট সেক্রেটারি, ফরেষ্টার, প্রভৃতিরা ফিরিঙ্গি সাহেব।

বিচার বিভাগের উচ্চ উচ্চ পদে সুযোগ্য সুশিক্ষিত বাঙ্গালিগণ অধিষ্ঠিত আছেন।

রাজ্যের কার্য্যে পেন্‌সন আছে। ২০ বৎসর কাজ হইলে ১/৩ পেন্‌সন পাওয়া যায়। এই পেন্‌সন জন্য কর্ম্মচারীর বেতন হইতে শতকরা ২৷৷০ টাকা কাটিয়া লওয়া হয়। পেন্‌সন লইতে ইচ্ছুক অনিচ্ছুক সকলকেই ইহা দিতে হয় এবং পেন্‌সন কাল প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে চাকুরী ত্যাগ করিলে ঐ টাকাটার কিছুই পাওয়া যায় না।

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ একরূপ পাঠকবর্গকে দিলাম। স্থানীয় উৎসব, নাচ ইত্যাদির বিবরণ ভবিষ্যতে দিবার ইচ্ছা থাকিল।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

অনন্ত মিলন।

(গাঁথা)

বালক বালিকা দুটি, একই কাননে ফুটি
হাসিতাম, খেলিতাম সুখের সমীরে,
নাচিতাম স্নেহভরে কভু ধীরে ধীরে।
কিবা দিবা বিভাবরী, সহচর সহচরী
এক ঠাঁই থাকিতাম সদাই দুজনে,
কি খেলায় কি বিশ্রামে শয়নে ভোজনে।

কত খেলা খেলিতাম, কত হাসি হাসিতাম,
মনে মনে করিতাম কত কি কল্পনা
কে জানিত আজ সব হবেলো জল্পনা?

দিনে দিনে বর্ষ কত, এইরূপে হলো গত
ক্রমশঃ বাড়িল সই! শৈশব-প্রণয়
শুনিলাম দুই জনে হবে পরিণয়।

কারে বলে পরিণয়, বুঝিবার কাল নয়,
তবুও আনন্দে সই! নাচিত হৃদয়
প্রাণসখা সনে কিরে হবে পরিণয়?

কেমন যে ভালবাসা, কি প্রণয় কি নিরাশা,
কেমনে জানিব সই! শৈশবে তখন,
জানিতাম শুধু সখি! স্নেহের বন্ধন।

ক্রমে সখি! বুঝিলাম, মজিলাম, মরিলাম,
বুঝিলাম পরিণয় কি যে ভালবাসা,
দেখিলাম সুখস্বপ্ন কত সুখ-আশা!

নূতন নূতন ভাবে, দেখিলাম উভে উভে
ছেলে-খেলা ছেলে-বেলা গেলাম পাশরি
তখন আমরা সই কিশোর কিশোরী!

চলে গেল ছেলে-বেলা, সাথে লয়ে ছেলে-খেলা
লাজময়ী কিশোরী সে এলো ধীরে ধীরে,
ভাসিলাম কমলিনী প্রণয়ের নীরে!

বুঝিতে পারিনি তবে, অদৃষ্টে এমন হবে,
নলিনীর ভালবাসা কাঁদিবার তরে,
মন প্রাণ রবিপানে দেহ মধুকরে!

যেন বজ্রাঘাত সম, শুনিনু জনক মম
করেছেন কি কারণে অন্যেরে মনন,
অন্য পাত্রে করিবেন আমারে বরণ।

সজনিরে! সুখস্বপ্ন, সে দিনই হইল ভগ্ন
ডুবিল সুখের রবি আঁধার জীবন,
কে খণ্ডাবে বল সই! বিধির লিখন!

নিরাশ হৃদয় লয়ে, হতাশাশ্রু পড়ে বয়ে
বসি একাকিনী সই! ঘোর নিরাশায়
কাঁদিয়া হ'লেম শেষে উন্মাদিনী প্রায়।

ডাকিলাম দয়াময়; কোথা তুমি এ সময়,
একেতে প্রণয় আর অন্যে পরিণয়
কেমনে করিব প্রভো! কি হবে উপায়।

আমার এমন প্রাণ, একেরে করেছি দান,
তিনিই আমার পতি তিনি প্রাণেশ্বর,
অন্য সাথে কেন তবে নির্ব্বন্ধ আমার!

কেমনে কুলটামত অন্য-প্রেমে হব রত
প্রেম-বিতরণ কিগো নারীর ব্যবসা?
একে পরিণয় আর অন্যে ভালবাসা!

শুনেছি না তুমি নাথ, বিপদে ত্যজনা সাথ,
তুমি শুধু দয়াময় সতীর ভরসা
কলঙ্কিত করিবে কি তার ভালবাসা?

এইরূপে যত কাঁদি, অবশ হয়লো হৃদি,
এ বিপদে কে তরিবে কি হবে উপায়
এ সময় প্রাণসখা রয়েছ কোথায়!

"কেন সখি কেন কেন? আজি তোরে হেরি হেন,
বিকচ গোলাপে কেন পড়িল কালিমা?
কেন আজ মেঘে ঢাকা শারদ-চন্দ্রিমা?"

বলিতে বলিতে সখা, সমুখে দিলেন দেখা
বলিলেন "বল্ সখি! কি হ'য়েছে তোর?
কি দুখে আজিকে তুই হ'য়েছিস ভোর?"

শত বজ্রাঘাতে যেন, ভাঙ্গিল হৃদয় মন
বলিলাম প্রাণসখা কি বলিব আর?
নিবিল আশার দীপ জীবন আঁধার!

যাও ভুলে ভালবাসা, উন্মূলিত কর আশা
প্রাণসখা আর তুমি হবে না আমার,
আমারে ভুলিয়ে সখে! হও কৃতদার!

হব পরনারী আমি, কলঙ্কিনী অভাগিনী
তোমাকে ভাবিতে আর নাই অধিকার,
এ জনমে সুখ-আশা নিবেছে আমার!

কি বলিব প্রকাশিয়া, বলিতে বিদরে হিয়া
অন্য পাত্রে বরিবেন জনক আমায়!
বল সখে কি করিব কি হবে উপায়?

জননী তোমার তরে, ব'লেছেন বারে বারে,
তবু না ফিরিল মন পিতার আমার
কি হবে এখন তবে উপায় কি আর?

"চল সখি যাই চলি, সমাজ-বন্ধন দলি'
পশিগে কাননে কিম্বা যেথা সাধ হয়,
তুই মোর আমি তোর কারে তবে ভয়?

একবৃন্তে ফুল দুটি, নিভৃত কাননে ফুটি
হাসিব খেলিব সদা শুকাব সেথায়;
চল সখি চল যাই যেথা প্রাণ চায়!

কেন তবে এত ভয়, চল যদি ইচ্ছা হয়
শুভ দিন দেখি তবে পুরোহিত ডাকি
বাহ্যিক বিবাহ হোক আছে যাহা বাকি!

প্রাণে প্রাণে বিনিময়, মনে মনে পরিণয়
সকলিত হ'য়ে গেছে বিবাহ কি আর
তুই মোর, আমি তোর, মাঝে কে আবার!"

আদরে সান্ত্বনা করি, মুছায়ে নয়ন-বারি,
বলিলেন সখা পুন "কি মত তোমার
অথবা জিজ্ঞাসি কেন তুমিত আমার"।

"ক্ষম সখা অপরাধ, মিটিল না মনঃসাধ,
সাধিলেন বিধি বাদ নাইক উপায়,
উভের মিলন নয় তাঁর অভিপ্রায়!

যাঁহার করুণা-বলে, জনমি অবনীতলে
পেয়েছি হৃদয়সখা! তোমা হেন ধন
তাঁহার অবাধ্য হব একথা কেমন!

আমার সুখের তরে, বল গো কেমন ক'রে
উপেক্ষিব গুরু-আজ্ঞা পিতার বচন
কোন প্রাণে দিব তাঁরে মরম বেদন!

জনম দুখিনী নারী, সব সহিবারে পারি
সহিব এ মর্ম্মজ্বালা বাঁচি যত দিন,
শুনিব পিতার আজ্ঞা অনন্ত সে ঋণ!

ছাড়ি অভাগীর আশা, ভুলিয়ে সে ভালবাসা
বিবাহ করিয়ে কর সংসারে প্রবেশ
সংসারের সুখে মন করগে নিবেশ।"

"প্রিয়তমে হও সুখী, আমি তাহে নাহি দুখী
হেরিলে তোমার সুখ আমি হব সুখী
ভুলে যাও অভাগারে ভুল বিধুমুখি।

হৃদয়ের কণা স্থান, আমারে ক'রোনা দান,
পরনারী হবে তুমি আমি হব পর
ভুলিয়ে আমারে কর পবিত্র অন্তর।

শুদ্ধ মনে অবিরত, পতিপ্রেমে থেকো রত,
নহ কলঙ্কিনী সখি তুমি সতী নারী
করগে পতির সেবা আমারে পাশরি।

আমারে দেখিলে যদি, টলে ও কোমল হৃদি,
সন্ন্যাসী হইয়ে তাই পশিব কাননে,
পূজিব তোমারে স্থাপি হৃদয়-আসনে।

কাননে জীবন ভোর, করিব তপস্যা ঘোর,
করিব সদাই তোর সুখের কামনা।
ছিঁড়িব সংসারপাশ, ভুলিব আপনা!

দেবীভাবে সদা তোমা, পূজিব লো প্রিয়তমা,
ভক্তি প্রীতি ভালবাসা দিব উপহার,
তুমি অধিষ্ঠাত্রী দেবী হৃদয়ে আমার।

বিদায় জন্মের মত, পতিপ্রেমে থেকো রত
আর কি বলিব সই, ভুলো লো আমায়"—
এত বলি প্রিয়তম গেলেন কোথায়!

সে দিন হইতে আর, পাইনি সংবাদ তাঁর
এক দিন শুধু তাঁরে হেরেছি নয়নে
দিয়েছি যাতনা ঘোর তাঁহার মরমে।

তিনিত গেলেন চলি, সংসার-বন্ধন দলি,
আমি কত কাঁদিলাম, ভাবিলাম কত
কোন প্রাণে অন্য-প্রেমে হব আর রত?

কি ঘোর যাতনা সহি, কি তীব্র অনলে দহি
কাটায়েছি কত দিন বলিতে না পারি,
স্মরিলে এখনো প্রাণ উঠে লো শিহরি!

নয়নে নয়ন বারি, গোপনে রাখি নিবারি
অন্তরের দাবানল নিবারি মরমে,
এখন রয়েছি সই মরিয়ে মরমে!

বৃদ্ধ ধনবান কেহ, বিবাহ করেন দেহ
বিবাহের পরে তাঁরে দেখি নাই আর;
নূতন জীবনস্রোতে ভাসিনু আবার!

ধর্ম্মপত্নী আমি যাঁর, বিয়োগে অবশ্য তাঁর
ধর্ম্ম হ'লো ব্রহ্মচর্য্য। বিধবার বেশ,
ব্রত—পর-উপকার, ধ্যান—পরমেশ।

(তবু) সে সুখের ভালবাসা, সেই প্রণয়ের আশা
শৈশবসুখের কথা হইত স্মরণ
আবেগে অবশ হ'তো হৃদয় তখন।

সে নাম এখনো সই, স্মরিলে আকুল হই
ভাসে লক্ষ্য টুটে ব্রত কাঁদে প্রাণ মন
মরমে মরম ঢাকি করি তা, দমন!

ছাড়িয়াছি তাঁর আশা, ভুলি নাই ভালবাসা,
আছে প্রণয়ের মূল ত্যজেছি বাসনা
পার্থিব প্রণয়ে আর নাইলো কামনা।

ব্রহ্মচর্য্য মোর ব্রত, ধর্ম্ম কর্ম্মে আমি রত,
বিধবার ভালবাসা একথা কেমন!
তাই ভাবি সই আমি ফিরাই এ মন!

আমার বৈধব্য হেরি, কি জানি কি মনে করি,
টলিল পিতার মন, হইয়া আকুল
আবার বিবাহ দিতে হলেন ব্যাকুল,

খুঁজি দেশ দেশান্তর, পুন এত দিন পর
আনিয়া সে সহচরে তবে উদাসীন,
করিলেন স্থিরতর বিবাহের দিন।

যেই ভীম তুষানল, পুড়ায় এ মর্ম্মস্থল
সখারে হেরিয়ে পুন জ্বলিল আবার
টুটিল মুহূর্ত্ত তরে সে ব্রত আমার।

বহু বহু দিন পরে, শৈশবসখারে হেরে
কি যে হ'লো মনোভাব বলিব কেমনে?
শুষ্ক তটিনীতে হায় চন্দ্রালোক কেনে?

ব্রহ্মচর্য্য ব্রত মোর, আমার তপস্যা ঘোর
বিধবা আমি যে সই বিবাহ আমার!
বিধবার প্রেম-আশা কেনরে আবার!

বলিলাম "প্রাণসখা, কেন পুন দিলে দেখা
বিধবা হ'য়েছি যে গো বিবাহ কি আর
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত, ধর্ম্ম—পর-উপকার।

আবার সে পরলোকে, পাশরিয়ে দুখ শোকে
মিলিব উভয়ে যেথা নাহিক নিরাশা,
ছাড় সখা এজনমে মিলনের আশা।

সে অতি পবিত্র ঠাঁই, প্রণয়ে নিরাশা নাই,
মিলনে বিচ্ছেদ নাই প্রেমে এ যাতনা;
ভুল সখা এ জনমে প্রণয়-কামনা"।

উৎসাহ।

"ধন্য সখি তোর ব্রত, থাক তবে ধর্ম্মে রত,
ঘোষিব তোমার কীর্ত্তি কাননে ভূধরে,
গাবে এ পবিত্র গীতি অমর কিন্নরে"।

বলিতে বলিতে সখা, আর না পেলাম দেখা
কোথায় গেলেন চলি দেখি নাই আর,
আজি এ অন্তিমে ইচ্ছা দেখি একবার!

আজি সখি শেষদিন, হবে এ জীবন লীন,
মিশিবে এ দেহউর্ম্মি কালের সাগরে
বড় সাধ একবার দেখিব তাঁহারে।

এবে যদি একবার, সখি, দেখা পাই তাঁর
অপরাধ ক্ষমিবারে অনুরোধ করি,
হাসিতে হাসিতে আজি এ সংসার ছাড়ি।

অবশ হ'তেছে কায়, বুঝি সখি প্রাণ যায়
একিরে নূতন দেশ—এসেছি কোথায়,
ঐ দেখ কে ডাকিছে আয়, আয়, আয়!

ওই শোন ওই শোন, যেন পরিচিত কোন
দূরে মধুমাখা স্বর কি যেন কি গায়
দুখে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ শোকে উথলায়।

ওই কে আসিছে দূরে, গাহি মর্ম্মভেদী সুরে
উন্মত্তের বেশে ওই প্রমত্ত হৃদয়
দেখ দেখ দেখ সখি, সখা বুঝি হয়!

হায় হায় একি সখি, জাগ্রতে স্বপন দেখি,
আমার সখার আজ কেন হেন বেশ
কি হ'য়েছে, কে দি'য়েছে মর্ম্মভেদী ক্লেশ।

আমি সখি অভাগিনী, আমারি কারণে তিনি,
এত দুখে দুখী আজ পথের কাঙ্গাল,
নাই প্রায়শ্চিত্ত মোর নাই পরকাল।

এস সখা এস এস, একবার কাছে ব'স,
আজি শেষদিন সখা আ'জ শেষবার"—
—রুদ্ধকণ্ঠ বালা বাণী না সরিল আর!

উন্মত্ত উদ্দাম বেশী যুবা এক জন,
পাংশুবর্ণ প্রভাহীন আধিক্লিষ্ট দেহ ক্ষীণ
বদন নৈরাশ্যপূর্ণ নিস্তেজ নয়ন
কিশোরীর পাশে আসি বসিল তখন।

সখা-কোলে মাথা রাখি, আঁখিতে মিলায়ে আঁখি
কিশোরী সে দিঠিহারা সখা পানে চায়,
বদনে সরেনা বাণী, তবু যেন হায়!
বলি বলি বলি কথা, বলিতে না পায়!

অন্তরের কথা তার, প্রকাশ হ'লো না আর
মরমে মরম কথা মরিয়া রহিল,
ফাটিল হৃদয় তবু কথা না ফুটিল,
ভাষাহীন মর্ম্মব্যথা ব্যথী সে বুঝিল।

নয়নে উথলি বিন্দু, বুঝি সে শোকের সিন্ধু
জিনিয়া কিরণ ইন্দু সে অপাঙ্গে খেলিল,
মুহূর্ত্তে সে অশ্রুচয়, কোথায় হইল লয়
অধরে বিজলী জিনি ক্ষীণ হাসি ভাতিল
নির্ব্বাণ-উন্মুখী দীপ আহা বুঝি নিবিল!

"কোথা গেলি, কোথা গেলি, আমারে একেলা ফেলি,
পাগলিনী যাবি কোথা কেমনে বা পালাবি
সে অনন্ত প্রেমডোর, কেমনে বা ছিঁড়িবি!"

যুবক কাতর প্রাণে, গাহি মর্ম্মভেদী তানে
নিররিল আর তার না সরে বচন,
অন্তিমে "ইজিপ্ত" হংস সঙ্গীতে মগন।

যুবক অবশকায়, ফুরাইল হায় হায়,
কিশোরীর দেহ পরি লুটায়ে পড়িল,
সখা সখি দোঁহে মিলি সংসার ত্যজিল।

কালা পাহাড়।

(সমালোচনা।)

কালা পাহাড়ের নাম এদেশে আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারও অপরিচিত নহে। নামটি এক প্রকার প্রবাদ বাক্য হইয়া পড়িয়াছে বলিলেও চলে। যে হিন্দুসন্তান, দেব দ্বিজে ভক্তি করে না, ঠাকুর দেবতা মানে না, শালগ্রাম শিলার সহিত উপলখণ্ডের পার্থক্য দেখে না, যে পদে পদে বিগ্রহের অবমাননা করিতে পশ্চাৎপদ হয় না, গোঁড়া পৌত্তলিক হিন্দু তাহাকে কালা পাহাড় বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা কেহ কেহ পৌত্তলিকতার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া, আপনাকে 'কালা পাহাড়' নামে অভিহিত করিয়া গর্ব্ব অনুভবও করে। ইহা হইতেই বুঝা যায়, 'কালা পাহাড়' কিভাবে সাধারণ্যে পরিচিত! কালা পাহাড়ের গল্প নানা লোকের মুখে নানা ভাবে শুনা যায়, কিন্তু ইহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না, ঠিক জানা যায় না। তবে কালা পাহাড় সম্বন্ধে সাধারণ্যের বিশ্বাস ও প্রচলিত গল্প এই যে, সে একজন হিন্দু সন্তান, বিপাকে অদৃষ্টচক্রের ফেরে, যবনের নির্দ্দয় হস্তে, যবনীর উদ্দাম প্রেমে জাতিচ্যুত, ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া

ইশলামধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ মুসলমান-সেনাপতিরূপে হিন্দুর প্রাণে দারুণ আঘাত দিয়াছিল। সে এমনই হিন্দুদ্বেষী, এমনই দেবদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল যে, যেখানে যে হিন্দুবিগ্রহ তাহার চক্ষে পড়িয়াছে, তখনই সে, সে মূর্ত্তি, হিন্দুর হৃদয়ে শেল বিঁধিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছে! খাঁটি মুসলমান, হিন্দুর যে সর্ব্বনাশ করে নাই, করিতে পারে নাই, যবনধর্ম্মাবলম্বী, হিন্দুসন্তান কালাপাহাড় নির্ব্বেদ অন্তরে তাহা করিয়াছিল! হায় ঘরের শত্রু এমনই করে!

কালাপাহাড়ের এই প্রচলিত গল্প লইয়া শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'কালাপাহাড়' উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে এবং অন্যত্র 'ঐতিহাসিক' প্রস্তাব থাকা সত্বেও যে গ্রন্থকার এ উপন্যাসের পূর্ব্বে "ঐতিহাসিক" বিশেষণ প্রয়োগের লোভ সংবরণ করিয়াছেন সেটি তাঁহার সুবুদ্ধিরই পরিচয়। অন্যথায় বাঙ্গলার এই ঐতিহাসিক যুগে উপন্যাস লিখিয়া না জানি তাঁহাকে কত কৈফিয়তেই পড়িতে হইত!

গ্রন্থ সম্বন্ধে অন্য কথা বলিবার পূর্ব্বে একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে বর্ত্তমান উপন্যাস খানির বিষয়নির্ব্বাচনে গ্রন্থকার বিশেষ সৌভাগ্যশালী! কালাপাহাড়ের কাহিনী উপন্যাসের সুন্দর উপাদান! এমন উপাদান বাঙ্গলার অধিক উপন্যাসে আছে বলিয়া জানি না! কিন্তু——কেন এ "কিন্তু" সে কথা পরে বলিব। তৎপূর্ব্বে বলা আবশ্যক যে গ্রন্থকার প্রতিভাশালী, তাঁহার ভাষা স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ অসংযত সত্বেও প্রাঞ্জল ও মধুর! "তথা কথিত" অনেক উপন্যাসলেখক অপেক্ষা তাঁহার ক্ষমতা অনেক অধিক! এ উপন্যাস-পাঠে সমালোচকের বিড়ম্বনা ঘটে না, পাঠকের সময় বৃথায় যায় না, আর ক্রেতার,—যদি কেহ থাকেন, তবে অর্থের অপব্যয় হয় না।

গ্রন্থকার গ্রন্থের নাম দিয়াছেন কালাপাহাড়, সুতরাং কালাপাহাড়ই গ্রন্থের প্রধান নায়ক হইবার দাওয়া করিতে পারে। গ্রন্থকারেরও প্রথমে সেই বাঞ্ছাই ছিল মনে হয়, কিন্তু শেষে সে দাবী উপেক্ষিত হইয়াছে। কালাপাহাড়কে ছাটিয়া প্রকৃত নায়কত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রভাতচন্দ্রকে! কাজটা তেমন বিধিসঙ্গত হয় নাই! এটা যেন হইয়াছে, রামের

রাজ্যাভিষেক ব্যাপারে রামচন্দ্রের বনবাস, আর ভরতের রাজ্যলাভ! যুবরাজ দশরথ বৃদ্ধ বয়সে কেন এমন অসঙ্গত কাজ করিয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই! কিন্তু আমাদের নব্য গ্রন্থকার কি কারণে এ দোষে দোষী হইলেন, বলিতে পারি না। আর কালাপাহাড়ের স্ত্রী নজিরণই, ব্যাকরণ ও ব্যবহারশাস্ত্র অনুসারে নায়িকা পদবাচ্যা হইতে পারেন, কিন্তু গ্রন্থকার তাঁহার প্রতিও নিতান্তই অবহেলা করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রায় আমলই দেন নাই, এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে মহিলার প্রতি এমন অবজ্ঞা গ্রন্থকারের কর্ত্তব্য হয় নাই, তিনি এ কাজটিতে নিতান্তই দুঃসাহসিকের পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু এজন্য বর্ত্তমান সমালোচকের অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন আছে, বোধ হয় না; কেন না, আশা করি, তিনি নিঃসন্দেহে এজন্য যথাস্থান হইতে কিঞ্চিৎ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন! তবে নজিরণ সম্বন্ধে গ্রন্থকারের পক্ষে একটা কথা বলিবার আছে। নজিরণ মুসলমান নবাবের ভ্রাতুষ্পুত্রী. সুতরাং নিতান্তই পরদানশিন! বাঙ্গালার ঔপন্যাসিক কুলচূড়ামণি বঙ্কিমচন্দ্র, দুর্গেশনন্দিনীর উপনায়িকা নবাবপুত্রী আয়েষাকে সাধারণ সমক্ষে উপনীত করিয়া মুসলমান-সাধারণের পক্ষে ও কতিপয় সমালোচকের চক্ষে যে গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন, বুঝি গ্রন্থকার তাই তাঁহার নেপথ্যবর্ত্তিনী নায়িকা নজিরণকে অন্তরালে রাখিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিলেন! তা সে কথা যাক,—কথা হইতেছে কালাপাহাড়ের স্বধর্ম্মত্যাগের ব্যাপারে এবং নজিরণের অনুরাগ ও মিলনে যে এক অভিনব নাট্যরস প্রবাহিত করিয়া পাঠককে আর্দ্র ও মুগ্ধ করিতে পারিত, যে হৃদয়স্পর্শী কাহিনী নানা ভাবে বিকশিত হইয়া গ্রন্থের গৌরব শত গুণে বৃদ্ধি করিতে পারিত, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থকার ভ্রমেও সে দিক দিয়া যান নাই! কালাপাহাড়ও নজিরণের সমস্ত ব্যাপার নেপথ্যে অতিমাত্র সংক্ষেপে শেষ করিয়া উপন্যাস খানিকে চিত্তাকর্ষক করিবার অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার প্রভাত ও ঊষার "নভেলি-প্রেমের" আমদানি করিতে বাধ্য হইয়াছেন!

গ্রন্থকার নজিরণের ভাণ্ডারে বিবিধ রতন থাকিতে "তাহে অবহেলা" করিয়া কাঁচের সন্ধানে বিব্রত হইয়াছেন।

প্রভাত ও ঊষা ঘটিত প্রণয় ব্যাপারে স্থানে স্থানে নিতান্তই নভেলি-

আনা প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু সকল স্থানে নভেলি-আনা ষোল আনা পূর্ণ হয় নাই! খুঁত রহিয়া গিয়াছে, মুসলমান সৈনিকদ্বয় নিশীথে, অজ্ঞাতে ঊষাকে বন্দী প্রভাতের শিবিরে রাখিয়া গেল, তখন প্রভাত ভাবিতেছেন ঊষা, আর ঊষার মনে জাগিতেছে প্রভাত। ঠিক সেই সময়ে ঊষা আপনমনে বলিল, "প্রভাত ফেলিয়া যাইওনা" সে স্বর অবশ্য প্রভাতের শ্রবণে পশিয়াছিল, প্রভাতও ঊষা ঊষা বলিয়া ভগ্ন স্বরে ডাকিল, কিন্তু তবু কেহ কাহার স্বর চিনিতে পারিল না, প্রকৃত নভেলি প্রেম কি এই?—আরে, ছো! যদি নভেলের নায়কনায়িকা, সূর্য্যমুখীর মত বলিতে না পারিল—"আমি তোমার গায়ের বাতাস পাইলেই চিনিতে পারি"—তবে আর সে প্রেম কি,— নভেলি আনাই বাকি?

চক্রবাক মিথুন বিধির বিধানে একত্রে রাত্রি যাপন করিতে পায় না, কিন্তু নির্দ্দয় নিষাদ, তাহাদিগকে শীকারচ্ছলে ধরিয়া আনিয়া বিধাতার অভিসম্পাত ব্যর্থ করিয়া রাত্রিতে কিন্তু এক পিঞ্জরেই আবদ্ধ করে! চকাচকী আসন্ন মৃত্যু ভুলিয়া সেই মিলনের রাত্রিটির অপব্যবহার করে না।

চকা বলে চকী প্রিয়ে, এ বড় কৌতুক,
বিধি চেয়ে ব্যাধ ভাল বড় দুখে সুখ।

সৈনিক নিষাদ, প্রভাত ও ঊষাকে একই পিঞ্জরে রাখিল, কিন্তু গ্রন্থকার দুখে সুখ ঘটাইতে দিলেন না। এ হেন মিলনের রাত্রি মাঠে মারা গেল, এরই নাম, "বিধি চেয়ে ব্যাধ ভাল"—? আর সেই জন্যই বলিতেছিলাম গ্রন্থকারের নভেলিআনা অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে! তা এ সব কথা যাক্, এখন গ্রন্থের প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি আলোচনা করিয়া দেখা যাক্—প্রথমেই ঊষার কথা! গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রথমে ঊষাকে যেমনটি গড়িতেছিলেন, বরাবর তেমনটি রাখিতে পারেন নাই। শুনিতে পাই কতকগুলি অলঙ্কার আছে, যাহার গঠন খাঁটি সোণায় ভাল হয় না, খাদ মিশাইতে হয়, বোধ হয় গ্রন্থকারও ঊষাচরিত্রগঠনে সেই নীতি অনুসরণ করিয়াছেন! কিন্তু দুঃখের বিষয় খাদটি কিছু অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছে, গ্রন্থের ঊষায়, ঊষার যে পরিচয় টুকু দিয়াছেন, তাহা অল্প হইলেও মনোরম, পাঠকের বড় সহানুভূতি-আকর্ষক! প্রথম পরিচয়ে ঊষা যেন লজ্জাবতী লতা, স্পর্শমাত্র

মুদিয়া আসে! যেন শ্লথবৃন্ত কুন্দকলিকা। বাতাসের আগে ঝরিয়া পড়ে, সে হৃদয়খানি অনুরাগে ভরা, বিরহে জীর্ণজরা তবু তাহার পরিচয় একমাত্র সঙ্গিনী, সুখ দুঃখ ভাগিনী অনন্ত স্নেহশালিনী, প্রভাতকেও উষা দিতে পারে না, লজ্জায় বাধিয়া যায়, সখির নিকটও সে মুখ ফোটে ফোটে ফোটে না। সে সরম ঢাকা মরমছবি ফোটে ফোটে ফোটে না। উষাচরিত্রের এ অংশ বড়ই মধুর। কিন্তু গ্রন্থের বেলা বাড়িয়া গ্রন্থকারের কল্পনামার্ত্তণ্ড বিকশিত হইয়া উষার কমনীয়তা নষ্ট করিয়াছে। যে উষা ফুলের ঘায়, মূর্চ্ছা যায়, সে প্রণয় পাত্রের মৃতদেহ সন্ধানে শত্রুসঙ্কুল যবন সেনা-পূর্ণ রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে, এটি কি তেমন স্বাভাবিক? স্বীকার করি প্রেমে অসম্ভবকেও সম্ভব করে, কিন্তু পঙ্গু কবে গিরি লঙ্ঘন করিতে সক্ষম হইয়াছে? উষা গৃহস্থ হিন্দুর নিরীহ বালিকা, সে শান্তিপ্রিয়—বিবাদভীরু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কন্যা, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের উপর "নাটকত্বের" এতটা দৌরাত্ম্য যেন কিছু বেশী অত্যাচার! তার পর প্রভাত,—বলিতে আহ্লাদ হইতেছে, প্রভাতের চরিত্রটি গ্রন্থকার অনেকটা স্বাভাবিক করিয়া আঁকিয়াছেন! এক দিকে প্রেমের উচ্ছ্বাস, অন্য দিকে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ, এ উভয়ের ঘাত প্রতিঘাতে চরিত্র সহজেই বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রভাতের বিবাহে অসম্মত হইয়া "পরসেবা" "স্বদেশ উদ্ধার" প্রভৃতি কার্য্যেই জীবননিয়োগের প্রতিজ্ঞা করিতে না করিতে একটি অপরিচিতা বালিকার রূপে মুগ্ধ হইয়া, বালিকার ভালবাসা পাইবার জন্য একেবারে অধীর হইয়া পড়া কিছু বিচিত্র হইলেও নিতান্ত অসম্ভব নহে। বরং সংসারে সাধারণতঃ এইরূপই হইয়া থাকে, পঠদ্দশায় বাঙ্গালী যুবক প্রায় জনে জনে ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডী, ঘরে ঘরে ম্যালথসের শিষ্য, কিন্তু কোন প্রকারে একবার এক দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকার শুভ দৃষ্টিতে বদ্ধ হইলেই মুহূর্ত্তে রবি-কিরণ সম্পাতে হিমানীর ন্যায় সে অচল প্রতিজ্ঞা একেবারেই জল হইয়া যায়, সে বক্তৃতা, সে স্বদেশানুরাগ, সে আত্মত্যাগ সকলই সংসার-স্রোতে ভাসিয়া যায়! কিন্তু প্রভাতের প্রণয়স্রোতে কর্ত্তব্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায় নাই। প্রভাত যে জন্য মন স্থির করিয়াছিলেন, সে লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হন নাই. যাহাকে একবার নয়নে নয়নে দেখিবার জন্য প্রভাতের ব্যাকুল

মন "নদী যথা ধায় সিন্ধু পানে" দিবা রাত্রি ছুটিত, তাঁহাকে দেখিবার সুযোগ, কর্ত্তব্যের অন্তরায় বিবেচনা, উপেক্ষা করা বীর হৃদয়ের কাজই বটে! বাঞ্ছিতের সহিত একবার দেখা, যে দেখা হয় ত জীবনে আর ঘটিবে না. সে দেখার প্রলোভন প্রভাত কি প্রকারে সংবরণ করিলেন শুনুন! যে গৃহে তাঁহার প্রণয়প্রতিমা আরাধ্যা উষা বিরাজমানা, সেই গৃহে যাইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াও প্রভাত বলিলেন "আজ গৃহের সহিত আমাদের সম্বন্ধ না থাকাই ভাল আমরা এখন পৃথিবীর স্নেহ মমতার বহুদূরে দণ্ডায়মান! সমরস্থল আমাদের বিশ্রামমন্দির! আজ এই জগন্নাথ দেবের সম্মুখেই বিশ্রাম করবো"।

আমাদের সমালোচনায় পুঁথি ক্রমে বাড়িয়া চলিল, সুতরাং আমরা আর অধিকদূর অগ্রসর হইয়া পাঠক পাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইবার বাসনা রাখিনা এখন স্বয়ং "কালা পাহাড়" সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমরা এ সমালোচনা শেষ করিব।

হিন্দুদ্বেষী কালা পাহাড়ের কলঙ্ক কালিমা দূর করিবার জন্য গ্রন্থকার গ্রন্থের শেষ ভাগে যে কয়েকটি কথা তাহার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন; তাহা বড় মুখরোচক, বড় মিঠে! কালা পাহাড় যে ভাবপ্রণোদিত হইয়া দেবদ্রোহী হইয়াছিলেন তাহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ কঠিন, কিন্তু গ্রন্থকার শেষে যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত হইলে কালা পাহাড়ের কলঙ্ক কালিমা সত্যই অনেকটা মুছিয়া যায়। তাহার প্রতি হিন্দু সাধারণের যে বিজাতীয় ঘৃণা আছে, তাহারও হ্রাস হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে কালা পাহাড়ের প্রতি একটি গভীর সহানুভূতি আসিয়া পড়ে! চিরন্তন প্রচলিত বিশ্বাসকে সহজে বিনা আড়ম্বরে দূর করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অন্য রূপ ধারণা জন্মান সকলে পারেন না। যিনি স্বাভাবিকতা রক্ষা করিয়া তাহা পারেন তিনি যে ক্ষমতাশালী সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই, কালা পাহাড় কনিষ্ঠভ্রাতা প্রভাতকে সম্বোধন করিয়া গ্রন্থের প্রায় শেষ ভাগে বলিতেছেন "আজি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করছি আমি যবন রাজের দাস বটে কিন্তু যবন রাজের সর্ব্বনাশ সাধনেই আমার জীবন সংকল্পিত," * * * * * * * *

"ভাই যে দিন মুসলমানেরা বল পূর্ব্বক আমার ধর্ম্ম ভ্রষ্ট করলে, সেই দিন

হতে প্রতিজ্ঞা করলেম, মুসলমান রাজ্যের মূলচ্ছেদ করবো" কিন্তু ধনহীন বলহীন পথের ভিখারী আমি, সুতরাং কৌশলে কার্য্য সাধনের চেষ্টা করতে লাগলেম। ভেবে ছিলাম হিন্দুজাতি ধর্ম্মগত-প্রাণ, "দেবদ্বিজে ভক্তিমান, তাদের সেই ধর্ম্মে আঘাত করলে দেশব্যাপী বিদ্রোহ উপস্থিত হবে। আর সেই জন্যই দেব মূর্ত্তি নাশের জন্য, দেবমন্দির ধ্বংসের জন্য আমার অসি নিষ্কোষিত হইয়াছিল! কিন্তু ভাই হিন্দুর আর জাতীয় জীবন নাই, কেউ সে দিকে আর লক্ষ্য করলে না! আমি কেবল এই পৃথিবীতে ক্রমে "দেব-দ্রোহী কালা পাহাড়" এই কলঙ্ক কালিমা লেপন করে চল্‌লেম"।

কথাগুলি যেমন স্বাভাবিক তেমনই মনোহর। কেবল এই কথার ভিতর দিয়া কালা পাহাড়ের হৃদয় দেখিলে বাস্তবিকই মুগ্ধ হইতে হয়। মনে হয় এমন স্বদেশপ্রেমিক কালা পাহাড়কে কে আর তার স্বজাতিদ্রোহী, দেবদ্রোহী বলিতে সাহস করিবে, এই উক্তিতে কালা পাহাড়ের হৃদয়ের সহিত আমরা গ্রন্থকারের হৃদয়ও দেখিতে পাই। আর সাহিত্যগুরু বঙ্কিম চন্দ্রের সেই কমলাকান্ত শর্ম্মার সেই আক্ষেপোক্তি মনে পড়ে। "কাব্যের ছলনা করি,কাঁদি"—কিন্তু বড় দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে গ্রন্থকার কালা পাহাড়ের উল্লিখিত উক্তির সহিত তাহার কার্য্যের ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব উক্তির সঙ্গতি রাখেন নাই; পূর্ব্বের উক্তি গুলিও কিন্তু অস্বাভাবিক নহে বরং সেগুলি কালা পাহাড়ের দেবদ্রোহী হইবার সত্য ও গূঢ় কারণ বলিয়া ভ্রম হয়।

গ্রন্থের অশীতি পৃষ্ঠায় কালা পাহাড় তাহার গুরুদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "শুনুন— সেই নজিরণই ধর্ম্ম কর্‌লে, অজ্ঞান অবস্থায় নজিরণই আমার মুখে জল সিঞ্চন করে ছিল, মুসলমানের খাদ্য আমার মুখমধ্যে প্রদান করে ছিল, চেতনা সঞ্চারের পর যখন তাহা জান্‌তে পারলেম তখনই জানলেম এ পৃথিবীতে ধর্ম্ম নাই। সুকৃতির পুরস্কার নাই। সুখ দুঃখের নিয়ন্তা নাই, দেবদেবী কিছুই নাই, শাস্ত্র মিথ্যা, দেবদেবী যদি কিছু থাকে তাহলে তারা রাক্ষসপ্রকৃতি, মানুষের ঘোর শত্রু, নতুবা আজীবন দেবতাপদে দৃঢ় ভক্তি রেখে ধর্ম্মশিক্ষা শাস্ত্রশিক্ষা করলেম তার কি এই পুরস্কার. * * * * * * * * * * * "আমি নজিরণকে বিবাহ করলেম, শাস্ত্র ত্যাগ করে শস্ত্র গ্রহণ করলেম।

কাল্পনিক দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ধ্বংস জন্য আমার অসি মন্ত্রপূত হল"।
অন্যত্র ৮৫ পৃষ্ঠায়—
"না গুরুদেব দেবতার মায়া নয়, দেবতা মিথ্যা, আমি শপথ করে বলতে পারি দেবতা কবির কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নয়।" গ্রন্থ মধ্যে কালা পাহাড়ের এরূপ ভক্তির অসদ্ভাব নাই, ইহাতেই মনে হয় গ্রন্থকারও প্রথমে প্রচলিত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই কালা পাহাড়কে আঁকিতেছিলেন, সহসা গ্রন্থের শেষে আসিয়া তাঁহার উদ্বেলিত স্বদেশানুরাগের আবর্ত্তে পড়িয়া সেই চিত্রের গতি ভিন্ন পথে গিয়াছে।

গ্রন্থের এক শত চব্বিশ পৃষ্ঠায় কালা পাহাড় লম্ফ দিয়া জগন্নাথ দেবের সিংহাসনোপরি উত্থিত হইয়া "যদি তুমি দেবতা, যদি তুমি চক্রধর, তবে ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম রক্ষা কর না কেন?" অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে এই কয়টি কথা উচ্চারণ করিয়া জগন্নাথ দেবকে অসি দ্বারা বিদ্ধ করিলেন, এই কথা এবং কার্য্যে কি মনে হয়? বিগ্রহের প্রতি দারুণ আক্রোশ বশে কিংবা স্বদেশ উদ্ধারের গুপ্ত উদ্দেশে কালা পাহাড় দেবদ্রোহী হইয়াছিলেন, কোনটি প্রকৃত মনে হয়? "আশৈশব ধর্ম্মে মতি রেখে যে দেবতাগণের সেবা করিয়াছিলাম সেই নিষ্ঠুর দেবতাগণের বিধান ক্রমে আমি মুসলমান!" (১৫২ পৃষ্ঠা) এই বিশ্বাসই কি এই ঘোর প্রতিহিংসার প্রবর্ত্তক নহে? প্রেমে বা ভক্তির প্রদানে হতাশ হইয়া সাধারণ ভগ্নহৃদয় ব্যক্তি যে পথে যায়, কালা পাহাড়ের গতি সে দিকেই গিয়াছিল, ইহাই কি স্বভাবসঙ্গত নহে?

মুসলমান রাজ্যের প্রধান সেনাপতি যদি অন্তরের সহিত মুসলমান রাজ্যের ধ্বংসপ্রার্থী ছিলেন, তবে কি তিনি অন্য রূপ উপায় গ্রহণ করিতে পারিতেন না? "কালা পাহাড়" শেষ করিয়া আমাদের মনে এই কয়েকটি কথাই পরে উদয় হইতেছে।

এ উপন্যাসে আরও অনেক ছোটখাট দোষগুণ আছে, কিন্তু সে গুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, তবে একটি কথা বলা আবশ্যক যে গ্রন্থকার রহস্য-রক্ষায় তেমন নিপুণতা দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু এই রহস্য রক্ষাই উপন্যাসের একটি প্রধান কৌশল (art)। গ্রন্থকার পাঠকের উদ্রিক্ত আগ্রহ অনেক সময়ে অতি অসময়ে নিবারণ করিয়া দিয়া রসভঙ্গ করিয়া ফেলি-

য়াছেন, যাহা হউক বিবিধ দোষ সত্ত্বেও কালা পাহাড় একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস, দ্বিতীয় সংস্করণে এখানিকে উৎকৃষ্টতর দেখিতে চাই বলিয়াই এবং সাবধান হইয়া লিখিলে ভবিষ্যতে গ্রন্থকারের হাত হইতে সুন্দর সুন্দর উপন্যাস বাহির হইবে আশাতেই আমরা সমালোচ্য গ্রন্থের এতটা আলোচনা করিলাম, গ্রন্থকারকে প্রতিভাশালী, সুলেখক বলিয়া ধারণা না জন্মিলে আমরা অদ্যকার এই কঠোর সমালোচনায় ব্রতী হইতাম না।

শ্রীপ্রেমবল্লভ গুপ্ত।

চিকিৎসক ও কবিতা।

এখনকার এই সত্যানুসন্ধিৎসার এবং বৈজ্ঞানিক চর্চ্চার পূর্ণ পরিণতির দিনে যখন সকল রকম প্রশ্নই অবাধে উত্থাপিত এবং আলোচিত হইতেছে তখন যদি আমরাও কোন একটা অদ্ভুত রকম প্রসঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে বোধ হয় তত অপরাধী না হইতেও পারি। চিকিৎসক কবি হইতে পারে কিনা? এসম্বন্ধের আলোচনা নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

অনেক ডাক্তার কবির নাম ইংরাজী সাহিত্য উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে; তাঁহাদের কল্পনাচাতুর্য্য এবং কবিপ্রতিভা নিতান্ত অনাদরের সামগ্রী নহে। Goldsmith, Schiller, Keats, Crabbe প্রভৃতির নাম কেনা জানে? এদেশের বৈষ্ণব কবিদের মধ্যেও বোধ হয়, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও গোবিন্দদাস কবিরাজের নাম নিতান্ত অপরিচিত নহে। এই সকল দেখিয়া সহজেই মনে হয় যে, চিকিৎসকের পক্ষে কবি হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে। কিন্তু বিষয়টা আরও একটু বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। যে কয়জন কবির নামোল্লেখ করা গেল তন্মধ্যে কয়জন প্রকৃত চিকিৎসাকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন দেখা উচিত। কয়জন ঔষধপ্রস্তুতের এবং রোগপরিচর্য্যার সঙ্গে সঙ্গে বীণাপাণির উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য

কীট্‌স্ এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনি ১৮১৬, খ্রীষ্টাব্দে এক বার হাঁসপাতাল পরিদর্শনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তারপর আর কখনও চিকিৎসাকার্য্যে বড় একটা মনোনিবেশ করেন নাই। Goldsmith দুই একবার পসারের চেষ্টা করিয়াই চিকিৎসা ব্যবসায় এককালে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহার চিকিৎসার কথা লোকে কিছু দিন পরে এক প্রকার বিস্মৃত হইয়াছিল।

Crabbe এক কালে fox, Walter scott, Wardsworth, Cardinal Newman প্রভৃতির ন্যায় বিভিন্ন প্রকৃতির লোককে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনিও চিকিৎসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন নাই। Schiller সুযোগ পাইবামাত্রই সেনানিবাসের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আমাদের কৃষ্ণদাস, গোবিন্দদাসও ভগবদ্‌প্রেমে যেরূপ উন্মত্ত ছিলেন, তাঁহাদেরও যে চিকিৎসা ব্যবসায়ে বিশেষ আস্থা ছিল এমন মনে হয় না। চিকিৎসার সঙ্গে কবিত্বের সম্বন্ধ এইরূপে দেখিতে গেলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, চিকিৎসা ব্যবসায়ের সঙ্গে কবিতাদেবীর তেমন সদ্ভাব নাই।

Mathew Arnold বলেন যে, "সমস্ত মানবজীবন চিকিৎসকের পক্ষে যুগপৎ উদ্ভাসিত হয়, এ কথা যথার্থ বটে, কিন্তু চিকিৎসকের দৃষ্টি অতিশয় সূক্ষ্ম—কবির দৃষ্টির সঙ্গে সে দৃষ্টির অনেক প্রভেদ। কবি অসুন্দর বস্তু দেখিতে ভালবাসেন না—সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই কবিতার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু চিকিৎসকের পক্ষে তাহা খাটে না—সুন্দর অসুন্দর সমস্ত জীবনই তাঁহার কাছে নগ্ন ভাবে দেখা দেয়।" Shelley বলেন "কবিতা পবিত্র এবং প্রফুল্ল চিত্তের সর্ব্বাপেক্ষা সুখময় সময়ের বিবরণ মাত্র।" কিন্তু যিনি প্রকৃত চিকিৎসক, তিনি যখন রোগীর কষ্ট ও যন্ত্রণার উপশম করিতে পারেন, তখনই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সুখী ও সন্তুষ্ট হন। জন্মমৃত্যুর কঠোর সত্যের সম্মুখে বসিয়া কবিতা রচনার প্রবৃত্তি কাহারও মনে জাগিয়া উঠিতে পারে কি না জানি না, তবে জনৈক শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞ লেখক বলিয়াছেন "কোন চিকিৎসকের স্বভাবজাত কল্পনাচাতুর্য্য এবং কবির শক্তি থাকিলেও যন্ত্রণা এবং মৃত্যুর ভীষণ দৃশ্যের সংসর্গে তাহাদের বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া উঠে।"

কল্পিত চিত্রসৃষ্টি কবির পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু চিকিৎসকের বৈজ্ঞানিক ব্যবসায়ই তাহাকে কঠোর সত্যপ্রিয় করিয়া তুলে। রোগিমাত্রেই স্বর্গমর্ত্ত্যবিহারিণী লীলাময়ী কল্পনা-সমন্বিত সুকবি অপেক্ষা, প্রশান্তচিত্ত সূক্ষ্মদৃষ্টি চিকিৎসককে সমধিক সমাদর করে। অসুন্দর চিত্রকে একেবারে উপেক্ষা করা চিকিৎসকের পক্ষে অসম্ভব। স্বভাব লইয়াই তাঁহার কারবার—শিল্প লইয়া নহে! কবিতাসুন্দরী তাঁহার একান্ত অনুরক্ত ভক্তের প্রতিই

কৃপাবর্ষণ করিয়া থাকেন, কিন্তু ব্যবসায়ী চিকিৎসকের পক্ষে সে সুযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা বড় কম। কাজেই কোন চিকিৎসক কবি হইবার চেষ্টা করিতে গেলে প্রায়ই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মধ্য শ্রেণীর কবি হইয়া উঠেন, তাঁহার আশা কখনই ফলবতী হয় না। এদেশে এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী ডাক্তারকে কবিতাদেবীর বিশেষ প্রীতিভাজন হইতে দেখা যায় নাই। সুতরাং চিকিৎসকদের মধ্যে যদি কাহারও আপনাপন নির্দ্দিষ্ট বিষয় ছাড়া অন্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের Carlyleএর উপদেশ মত সে সব কথা সরল গদ্যে প্রচার করাই ভাল। এরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া অনেকেই সফলকাম হইয়াছেন। Sir Thomas Browne, Dr. John Brown, Professor Huxley প্রভৃতি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। খিদিরপুর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের নামও এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাবলী বঙ্গদর্শন, প্রচার প্রভৃতি বিস্তর উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকার ক্রোড়দেশ সুশোভিত করিয়াছে।

কিন্তু চিকিৎসকেরা কবিতা ভিন্ন অন্য প্রকার কাল্পনিক রচনায় হস্তক্ষেপ করেন না কেন, বুঝিতে পারি না। তাঁহাদের শিক্ষা স্বতঃই তাঁহাদিগকে সূক্ষ্মদৃষ্টি করিয়া তুলে। মানব-চরিত্রের ভালমন্দ মহত্ত্ব নীচত্ব, সমস্তই যুগপৎ তাঁহার নয়ন পথে উদ্ভাসিত হয়। মুখে পাউডার মাখা নটের মত,—আমরা আমাদের যথার্থ প্রকৃতি, সভ্যতার আবরণে ঢাকিয়া রাখি। কিন্তু রোগশয্যায় শয়ন করিয়া যখন আমাদের সমস্ত দেহ অসহ্য যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট ও প্রপীড়িত হইতে থাকে তখন বাহ্যিক আড়ম্বর কোথায় ভাসিয়া যায়। পাউডার মুছিয়া গিয়া সমস্ত স্বভাব তাহার নিজ মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। কাজেই চিকিৎসকের পক্ষে মানব-প্রকৃতি অধ্যয়ন অনেকটা সুসাধ্য হইয়া উঠে। তদ্ভিন্ন সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের মানবচরিতাভিজ্ঞ হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। রোগীর মানসিক প্রকৃতি সম্যক্‌রূপে অবগত না হইলে রোগের নির্ণয় ও চিকিৎসা করা সুকঠিন হইয়া উঠে। সুতরাং চরিত্রজ্ঞান-শিক্ষা, চিকিৎসকের পক্ষে ব্যবসায়গত। গল্পের উপাদানের জন্যও তাঁহাদের বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। রোগোৎপত্তির কারণ নির্ণয় করিবার সময়েই কত লোমহর্ষণ ঘটনা তাঁহাদের কর্ণগোচর হয়—তাহার ইয়ত্তা নাই।

James payne বলেন যে, তিনি যতগুলি উৎকৃষ্ট ঘটনা লিখিয়াছেন প্রায় সমস্ত গুলি চিকিৎসা ব্যবসায়ীর নিকট হইতে। কিন্তু অতি অল্প চিকিৎসককেই কল্পনাবহুল রচনায় হস্তক্ষেপ করিতে দেখা যায় এবং যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারও তেমন কৃতকার্য্য হন নাই। ডাক্তার লেখকদের গ্রন্থে চরিত্রের বিকাশও তেমন সুস্পষ্ট হয় না। আরও একটা

আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তাঁহাদের গ্রন্থে চিকিৎসকের চিত্র বড় বিরল; যৎসামান্য যাহা আছে তাহাও তত উজ্জ্বল নহে। George Elliot এর "Lydgate" অথবা Balzac এর "Horace Biauchon"এর সঙ্গে Smollett প্রভৃতি ডাক্তার লেখকের চিকিৎসকচিত্রের তুলনাই হয় না। কিন্তু তাহা বলিয়া কেহই যে কল্পিত চিত্রসৃষ্টিতে কৃতকার্য্য হন নাই এমন কথা আমরা বলিতেছি না। এদেশের একজন স্বনামখ্যাত ডাক্তার লেখক এ অপবাদ বিমোচন করিয়াছেন। আমরা সুবিখ্যাত পরলোকগত ঔপন্যাসিক বাবু তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কথাই বলিতেছি। দৃশ্যের পারিপাট্যে, চিত্রের স্বাভাবিকতায়, এবং ভাবের উদ্দীপনে আমরা "স্বর্ণলতাকে" কোন বাঙ্গালা উপন্যাসের নিম্ন আসন দিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু ৺ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ন্যায় উপন্যাসলেখক, ডাক্তারদের মধ্যে কয়জন আছেন?

যাহা হউক আমরা এ প্রবন্ধে কবিতা রচনার কথাই বলিতেছিলাম, আমাদের বোধ হয়, একজন চিকিৎসক "পসারে" থাকিয়া উচ্চদরের কবি হইতে পারেন না, এটা এক রকম স্থির। তিনি যদি শুধু আমোদের জন্য কবিতা লেখেন, তাহা হইলে সে সম্বন্ধে কোনও আপত্তি উঠিতে পারে না, কিন্তু তিনি যদি যথার্থই কবিতা লিখিয়া অমরত্ব লাভ করিতে চাহেন, তাহা হইলে আমাদের মতে তাঁহার কোন একটা বিষয় ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। একজন তৃতীয় শ্রেণীর কবির মধ্যে গণ্য হইবার আকাঙ্ক্ষা যে নিতান্তই তুচ্ছ তাহাতে সন্দেহ নাই।

তদ্ভিন্ন সত্যকথা বলিতে গেলে, কবি যখন এই ক্লেশকর জীবনযাত্রার দুঃখরাশি মধ্যে কবিতার উপাদান খুজিতে ব্যস্ত, তখন যে চিকিৎসক আপনার ক্ষুদ্র বিদ্যাবুদ্ধি প্রভাবে সাধ্যমতে রোগপীড়িত দুর্দ্দশাগ্রস্ত মানবের রোগ দূরীকরণে এবং কষ্ট নিবারণে নিযুক্ত, তিনি যে এক হিসাবে কবি অপেক্ষা উচ্চাসন পাইবার উপযুক্ত, এ কথা অপক্ষপাত ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং আমাদের মতে একজন ব্যবসায়ী চিকিৎসকের পক্ষে উচ্চ শ্রেণীর কবি হইবার জন্য নিষ্ফল চেষ্টা করা অপেক্ষা আপনার ব্যবসায়ে থাকিয়া এই দুঃখজর্জ্জরিত তাপক্লেশপ্রপীড়িত পৃথিবীতে শান্তি ও আরোগ্যের শীতলবারি সেবনের ব্যবস্থা করা যে অনেক বেশী গৌরবের কায সন্দেহ নাই!

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

কবিতাকুঞ্জ।

যাতনা।

একি ঘোর দায় বিষের জ্বালায়
জ্বলে প্রাণ তবু যায় না!

কত দিবা-নিশি এইরূপে বসি
সহিব মরম-বেদনা!
কিসের কারণ এ হৃদি-বেদন
ভুলেছি জগত না জানি?
কিসে আত্মহারা পাগলিনীপারা
এ হেন অথির পরাণি!
যে বীণার তানে তাহার পরাণে
উঠিত সুখের লহরি,
তোষিতে সে প্রাণ গাহিতাম গান
বাজায়ে মধুর বাঁশরী! রব
আজো সেই করে সেই বীণা ধরে
তেমনি করিয়া সাধিয়া
যদি দি ঝঙ্কার ছিঁড়ে যায় তার
বাজে না মধুরে মাতিয়া!
আজো সেই ভুলে যমুনার কূলে
বীণাটি করেতে লইয়া,
চাহি পথ পানে তাহারি ধেয়ানে
রয়েছি তেমনি বসিয়া।
যথা এক মনে অনাদি ধেয়ানে
বসিয়া সাধিকা যোগিনী,
হ'য়ে তদগত হৃদে সেই পদ
ধেয়ায় দিবস যামিনী!
আমিও তেমনি দিবস রজনী
একাকী বিরলে বসিয়া
আছি এক মনে তাহারি ধেয়ানে
কত ব্যথা হৃদে ধরিয়া।
তেমনি আকাশে শশধর হাসে
বিকাশি রূপের মাধুরী
কনক কিরণ করে বিকিরণ
ঢালিয়া জোছনা-লহরী,
যমুনার জল তেমনি চঞ্চল
তেমনি ধাইছে উজানে
তেমনি সুন্দর লতাপুষ্প থর
দোলায় মৃদুল পবনে!

তাহারি কারণে যমুনা-পুলিনে
আছি কত কাল বসিয়া,
কত হাসি কাঁদি কত বুক বাঁধি
আশার ছলনে মোহিয়া!
আমি পূজি কারে কোন দেবতারে
দেব কি দানব না জানি!
যদি দেব হয় কেন নিরদয়
এ হেন কঠিন পরাণি!
...ীর তান এ দুখের গান
পশে নাকি তার শ্রবণে?
কেন পাষাণ কঠিন পরাণ
নাহি বহে জল নয়নে।

শ্রীমতী রাইকিশোরী দেবী।

কি আর কহিব?

সখি, কি আর কহিব?—ভাষা যে আমার
নাহিক কাছে!
কাঁদিছে আকুল অকূল বাসনা
মর্ম্ম মাঝে—
বৃথাই যত্ন আত্মপ্রকাশে,
নয়নের নীরে শুধু হা হুতাশে
গলিয়া ঝরিয়া পড়িছে মরিয়া
ধূলির মাঝে!
কি আর কহিব? ভাষা যে আমার
নাহিক কাছে!
সখি, আমি তো ছিলাম ধরায় উদাসী,
বিদেশী, মূক,
তোমারি ও রূপ-কনক-কিরণে
ফুটিল মুখ!
তোমারি অধরে, তোমারি নয়নে,
গতিমন্থর ললিত চরণে—
আশায় ভাষায় সাজালে আমায়
প্রেমিক সাজে!

কি আর কহিব ? ভাষা যে আমার
নাহিক কাছে !

সখি, দ্যুলোক ভূলোক পুলকে ভরিল—
তোমারি রূপে,
উঠিল তারকা ফুটিল কুসুম
এ লোমকূপে;
কঠোর জগৎ বন্ধ টুটিয়া
সঙ্গীত ধারে আসিল ছুটিয়া,
স্বপ্ন আসিয়া রচিল শয়ান
নয়ান মাঝে !
কি আর কহিব ? ভাষা যে আমার
নাহিক কাছে !

সখি, আপনা ভুলিয়া আমি যে তোমায়
বেসেছি ভালো ;
সকল ধর্ম্ম, সকল কর্ম্ম
ও আঁখি কালো ;
ও নয়ন-পাতে লিখে গেছে ধাতা
আমারি আমূল জীবনের গাথা,
আভাসে-প্রকাশ দেবতা আমার
হোথায় রাজে !
কি আর কহিব ? ভাষা যে আমার
নাহিক কাছে !

সখি, আমার যা' ছিল সকলি তোমায়
করেছি দান—
সকলি তো তুমি নয়নে শুষিয়া
করেছ পান;
শুধু পড়ে আছে এক মুঠা ধূলি—
এ পাপ ধরার পাপ অণুগুলি,
তাহাও কি দেয় ? তা'ছাড়া সকলি
তোমারি মাঝে !
কি আর কহিব ? ভাষা যে আমার
নাহিক কাছে।

১৩০৫ সালের সূচীপত্র।

বিষয়।	লেখক।	পৃষ্ঠা।
অনন্ত মিলন ...	... ...	২৭৮
অপরাধ স্বীকার ...	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি, এ, ...	১২১
অহল্যা	সরলাবালা সরকার	৬২
আশা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২০১
ইবন বতুতের ভ্রমণ বৃত্তান্ত	রামপ্রাণ গুপ্ত	২১৫
কবিতাকুঞ্জ ...	... ...	১১৬, ১৫৭, ১৮৭, ২৯৯

শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, সরলাবালা সরকার, নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী, রাইকিশোরী দেবী, মনোমোহন সেন, শৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত, বিমলাচরণ মৈত্র।

কালা পাহাড় ...	প্রেমবল্লভ গুপ্ত ...	...	২৮৮
গত জন্ম	নিত্যকৃষ্ণ বসু এম, এ ...	...	১৭৪
গোবিন্দ ভাগবত ...	রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী ...	...	২৪৯
গোময়	শশিভূষণ বিশ্বাস ...	...	১৪২
চিকিৎসক ও কবিতা ...	শৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত ...	...	২৯৬
ছোট কথা	... ...	...	৩৯
জগৎশেঠ	নিখিলনাথ রায় বি, এল ...		১৪,৫২
দয়ানন্দ আশ্রম ...	শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ...	...	২৫৪
দেশীয় শিল্প	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি, এ	...	২০১
নব-বর্ষ	... ...	...	১
নীল	শশিভূষণ বিশ্বাস ...	...	১০৪
পরলোক	সরলাবালা সরকার ...	...	২১২
পুণ্যাহ	অক্ষয়কুমার মৈত্র বি, এল	...	২
প্রাচীন গ্রাম্যকবিতা ...	প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী বি এল	...	২৬৪

প্রাদেশিক সমিতি	...	যতীন্দ্রমোহন বাগছী এম, এ, বি, এল	৬৫
প্রাপ্ত-গ্রন্থ ...	...	অক্ষয়কুমার মৈত্র বি, এল ...	৭৮
বর্ষা ...	...	সুবোধচন্দ্র মজুমদার বি, এ ...	
বিশ্বরচনা ...	...	মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ...	৫২, ৯৮, ১৬৭, ২০৭
বৃন্দাবনদাসের ভজন নির্ণয়		রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী	১৪৫
বৈজ্ঞানিক অনুমান ...		জগদানন্দ রায়	১২৭
ভিখারী ...	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪১
ভূগর্ভ ...	...	শশধর রায় এম, এ, বি, এল ...	৬৯
ভোলা বাবু ঘুম যায় ...		গোবিন্দচন্দ্র দাস	২৪১
ময়ূর তখ্‌ত ...	...	রমাকান্ত ভট্টাচার্য্য বি, এল ...	১৮৩
ময়ূরভঞ্জের বিবরণ ...		যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ ...	২৬৫
মাতার আহ্বান ...		রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮১
মাসিক সাহিত্য ...		ভবানীগোবিন্দ চৌধুরী বি, এ প্রভৃতি	৩১, ৭৩, ১১৮, ১৫৯, ১৯৯
রমণীর অধিকার ...		হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি, এ ...	২১
রাজসাহী ...	...	কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ ...	১৩১
রাজা রামানন্দ ...		রাধেশচন্দ্র শেঠ বি, এল ৪৯, ১১২, ১৮০, ২৩১, ২৪২	
রাম সদয় ...	...	শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৯৩
শিব নিবাস ...	...	যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি এ	১৫১
সন্ন্যাসী ...	...	জলধর সেন ...	৮, ৯২, ১৬১
সুবাক্য ভাণ্ডার ...		শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ ...	১৯২, ২৪০
সে আমার জননী ...		রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩
সে দেশে ...	...	গোবিন্দচন্দ্র দাস	২০
স্বর্গীয় মোহিনীমোহন ...		শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ	১৪১
হেমের অনধিকার ...		শৈলেশচন্দ্র মজুমদার	২৫
হেষ্টিংসের শিক্ষানবিশী		অক্ষয়কুমার মৈত্র বি, এল ...	৮৩